হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) আলাইহির জীবন কাহিনী
ও সাধনার অবিস্মরনীয় লিপিচিত্র

পথের পাড়ের পরশ পাথর

মূল ঃ মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রঃ)
ভাষান্তর : শফিউল্লাহ কুরাঈশী

www.eelm.weebly.com

শেষ সূর্যের বিদায়!

দু'হাজার সাল।

আগামীকাল। আর আজ। শুক্রবার।

নিরানব্বুই এর শেষদিন। তিনি পাড়ি দিলেন। পরপারে।

হাহাকার পড়ে গেল গোটা মুসলিম বিশ্বে। শতাব্দীর শেষদিনে যেন শেষ আধ্যাত্মিক পুরুষটিও চলে গেলেন। এতিম উম্মতকে ছেড়ে। গভীর শোকের ছায়া নামলো সচেতন মুসলমানের মাঝে।

দুনিয়া জুড়ে।

বিশ্ববিশ্রুত মুসলিম মণীষা হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ হাসান আলী নদভী (রঃ)। ইনি ভারতের প্রখ্যাত নেতা। একজন খ্যাতিমান বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। সারা দুনিয়ায় সেরা সম্মানীদের একজন তিনি। যশস্বী লেখক। একজন প্রাজ্ঞ পুরুষ। উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্যে তাঁর অন্তরে ছিল সীমাহীন মমতা। সেটাই আপামর মুসলিম জনতার মনে গড়ে তুলেছিল সম্মানের এক অনন্য আসন।

হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ হাসান আলী নদভী (রঃ) গত পঞ্চাশ বছর ধরে গোটা বিশ্বের স্বনামধন্য তিনি ছিলেন মুজাহিদ আন্দোলনের জগদ্বিখ্যাত নেতা সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) এঁর পঞ্চম পুরুষ। ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেল ইংরেজ। দেশ ভাগ হলো। তখন মুসলমানদের সমূলে শেষ করার জন্যে শুরু হলো এক গভীর চক্রান্ত। সেটা ছিলো স্পেনের সেই মুসলিম নির্মূল আর নিধন যজ্ঞের মতোই। চারদিক থেকে আক্রান্ত হলো মুসলমান। শারিরীক আর মানসিকভাবে। নির্বিচার খুন হত্যার সাথে সাথে মনোবল আর আত্মবিশ্বাস ভেঙে দেয়ার কাজটিও তারা করছিল।

ওই দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন এই অকুতোভয়, দুঃসাহসী মহান নেতা। মাঝিহীন নৌকার হাল ধরলেন। শক্ত হাতে। প্রায় ভরাডুবি হাত থেকে উদ্ধার করলেন ভারতের মুসলমানকে। আল্লাহর অপার দয়ায়। এই দুর্দিনে মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করার অনেক আয়োজন হয়েছিল। অত্যন্ত দক্ষ হাতে

www.eelm.weebly.com

আর দূরদর্শিতার সাথে সেগুলো দমন করলেন তিনি। মুসলিম জনতা ফিরে পেল হারানো মনোবল। প্রতিরোধ আর প্রতিবাদে সোচ্চার হলো তারা। সৈয়দ (রঃ) এঁর নেতৃত্বে সুসংগঠিত, একতাবদ্ধ মুসলিম উদ্যমের তোড়ে আর তোপে তুলোর মতো উড়ে গেল সব কূট ষড়যন্ত্রের প্রাসাদ। ইসলামী আইন সুরক্ষায় বিশিষ্ট ভূমিকা নিল হযরত মাওলানার মুসলিম পার্সোনাল বোর্ড। গোটা দুনিয়া অবাক হলো। জানালো অভিনন্দন।

সুরক্ষা হলো ইসলামের। এভাবে অর্ধশতাব্দী ধরে একটার পর একটা ধর্মীয় আন্দোলনে তিনিই সকল প্রেরণার উৎস। নেপথ্য নায়ক। সফলতার মূল চাবিকাঠি। এই জামানার পাঁচ মহাদেশ জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা যে মহান মেহনত বা মৌন বিপ্লব চলছে, সেই তাবলীগ জামাতের পুরোধা প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) এঁর ছায়াসঙ্গী ছিলেন তিনি। হযরতজী (রঃ) এঁর আস্থাভাজন এই প্রিয়জনকে অন্য মুরুব্বীরা তাঁর 'ব্রেনটাস্ট' বলে ডাকতেন। বড় হযরতজী (রঃ) এঁর বিদায় বেলায় ইনি সবচেয়ে কাছে ওপাশে ছিলেন। তাঁকে বেঁচে থাকা সময়ে তাবলীগের একজন শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা বা বড় হিসেবে দেখা হতো। তাছাড়া এই শতাব্দীতে সারা বিশ্বজুড়ে মিথ্যার প্রাণকেন্দ্রগুলোতে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকার ইসলাম প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ইয়াহুদ, নাসারা, অংশীবাদী, পৌত্তলিক, নাস্তিকতাবাদীদের মরণছোবলে দিশাহারা দুনিয়ায় তাঁর কলম ও মুখ সমানভাবে দ্রোহী দ্রষ্টার ভূমিকা সরব পদচারণা রেখেছেন। তিনি ছিলেন প্রতিরোধ আর উচ্চকিত প্রতিবাদের প্রাজ্ঞপুরুষ। তার জ্বালাময়ী বিসুভিয়াস কণ্ঠস্বর ইয়োরোপ ও আমেরিকার জ্ঞান অভিমানী চিন্তাবিদদের চোখ খুলে দিয়েছে। তেমনি তাঁর অগ্নিঝরা কলম সত্য মিথ্যার ফারাক পরিষ্কার তুলে ধরেছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়েছে বিশ্ব।

আরব, আজম, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচি, উবাচী মুসলিম জাতিকে ঘুমঘোর থেকে জাগিয়ে তোলার জন্যে তাঁর কলম ও যবান সমানভাবে ব্যঙময় হয়ে উঠেছে। জড় ও বস্তুবাদী চিন্তা চেতনার বিষ নিঃশ্বাসে রুদ্ধশ্বাস পৃথিবী, বিশেষ করে ইয়োরোপ আর আমেরিকাকে ইসলামী চেতনায় ঋদ্ধ করার জন্যে তিনি পাশ্চাত্যের প্রধান বিদ্যাপীঠ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে গড়ে তুলেছিলেন ইসলামকি ইনস্টিটিউশন। আলাদাভাবে গড়া এই

www.eelm.weebly.com

প্রতিষ্ঠান গোটা ইংরেজ জাতির জ্ঞান জগতে এনেছিল এক নতুন চেতনা। নতুন বিপ্লব।

আর–

ওই প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধনী দিনে গোটা দুনিয়া উপস্থিত হতে দেখেছিল লম্বা জুব্বা, সুন্নাতি পোশাক পরা বৃটিশ শাহী তাখতের আগামী উত্তরাধিকার যুবরাজ চার্লসকে। মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে দাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, সুদানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রূপরেখা ও নতুন করে সিলেবাস তৈরিতে মরহুম (রঃ) এঁর অসাধারণ ভূমিকা মুসলিম বিশ্বকে অবাক করেছিল।

বেঁচে থাকতেই তিনি কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। খ্যাতি ও সম্মানের স্বর্ণশিখরে পৌঁছেও তাঁর জীবনযাপন ছিল সাদাসিধা। অনাড়ম্বর। পোশাক আশাক ও খাওয়া দাওয়া ছিল অতি সাধারণ। জানা গেছে সৈয়দ আহমদ শহীদ (রা) যে জন্মেছিলেন সেটা নাদভী (রঃ) পৈতৃক সূত্রে পান। সারাটা জীবন ওখানেই থাকেন। ওখানেই তাঁর শেষ যাত্রা হয় আধ্যাত্মিক জগতের ঝলমলে তারা সৈয়দ সাহেব এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন নিঃসন্দেহে। উপমহাদেশের সব ক'জন বজুর্গ ব্যক্তির প্রিয়জন, শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহাস্পদ ছিলেন। নায়েবে নবির আসনটিকে তিনি যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন এ কথা বলা যায় নিঃসংকোচে। তিনি লিখেছেন অনেক। আরবী, উর্দু ভাষায়। সেগুলো অনুবাদ হয়েছে ইংরেজি, ফার্সী, তুর্কী, হিন্দি, বাংলা, সুহাইলি, মালয়, ইন্দোনেশীয় ভাষায়। লেখনী তাঁর হৃদয়ের উত্তাপকে ছড়িয়ে দিয়েছে লাখো কোটি হৃদয়ে। এ শতকের সব অবক্ষয় আর আঁধার মোকাবিলার তাঁর সেসব লেখায় রয়েছে যাবতীয় হাতিয়ার। ইসলামী বিশ্বাস, ইসলামী সাহিত্য আর ইতিহাস বিষয়ে তাঁর লেখা বই পঞ্চাশটিরও বেশি। শয়তানী শক্তির নৃশংস, হীন ষড়যন্ত্রের শিকার এখনকার মুসলমানদের দুর্দশা সম্পর্কে তাঁর মনে রাখার মতো ক'টা বই ইংরেজি, ফরাসী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এসব লেখায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, সুবিস্তৃত প্রজ্ঞার পরিধি, অতলস্পর্শী চিন্তা ও চেতনা, সুগভীর মনন ও সুতীক্ষ্ণ মেধার বিচ্ছুরণ দেখতে পাওয়া যায়। তার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বেশ ক'টি পুরস্কার পান। যেমন 'ফয়সল' পুরস্কার। এছাড়া বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পুরস্কারে বিভূষিত হন।

www.eelm.weebly.com

স্বীকৃতির পাশাপাশি বেশ অর্থকড়ির মালিকও হন তিনি। সেগুলোর সবই দ্বীন প্রচার, প্রসার, মজলুম মুসলমানের কল্যাণে খরচ করেন।

দুনিয়াজড়ে ধর্মীয় সংগঠনগুলোর অত্যন্ত দায়িত্বশীল পদ অলঙ্কর করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি নাদওয়াতুল ওলামা লাখনৌ এর অধ্যক্ষ, ইসলামী গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থার সভাপতি ছিলেন। বিশ্ব মুসলিম সংস্থা রাবিতা-ই-আলম আল ইসলামী, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা পরিষদ, সিরিয়ার শিল্প সাহিত্য ও পত্র সাহিত্য পরিষদের সদস্য ছিলেন।

মানুষ মরণশীল।
সবাই চলে যায়।
মন যেতে দিতে নাহি চায়।
তবু যেতে দিতে হয়।
তিনি। চলে গেছেন।
আমাদের কী বলে গেলেন?
কী করা? কী কাজ? আমাদের?
এখন?

"সেই সূর্যের চারপাশে গাঢ় কালো
অশুণতি মেঘের আনাগোণা;
যেন তারা কোটি আঁধার আত্মা
খুঁজে ফেরে আলোর কণা।"

–আল্লামা রুমী (রঃ)

www.eelm.weebly.com

মুখবন্ধ

পঞ্চাশ বছর আগে।

আমি তখন দারুল উলুম দেওবন্ধের ছাত্র। একদিন নাম শুনলাম তাঁর। তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ আখতার ইলিয়াস (রঃ), জানতে পারলাম তিনি বর্বর মেওয়াতীদের কালিমা ও নামাজ শেখাচ্ছেন। এরা নামেই মাত্র মুসলমান। তিনি তাদের ছেলেপুলেদের প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার জন্যে মাদ্রাসা দিয়েছেন।

পরে আমি তাঁর সাথে দিল্লীতে বেশ ক'বার দেখা করেছি। কিন্তু সে সময় আমি মাওলানা সাহেব আর তাঁর কাজ সম্পর্কে জানতে তেমন আগ্রহী ছিলাম না। বার বার দেখার পরেও আমি তাঁর অতুলনীয় মনন ও চারিত্রিক গুণাবলী, তাঁর দৃপ্ত ধর্মীয় প্রাখর্য আর অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্মমুখর নীরব সংগ্রাম সম্বন্ধে জানতে পারিনি।

দশ বছর পর।

এখন আমি মাওলানা (রঃ) এঁর মহত্ত্ব ও তাবলীগ নামের আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝতে পারি। ঠিক এ সময়েই আবুল আলা মওদুদী আর আমি মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) এঁর সাথে দেখা করার উদ্দেশে দিল্লীর বস্তি নিজামুদ্দিনে যাই। এই প্রথমবারের মতো তাঁর কাজ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান পাই। তাঁর কর্মকাণ্ডে প্রাণকেন্দ্র মেওয়াতের অভাবনীয় ধর্মীয় জাগরণ দেখে। মওদুদী তার প্রকাশিত 'তারজুমানুল কোরআন' নামের পত্রিকায় তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ সম্পর্কে খুব উঁচু ধরনের মতামত প্রকাশ করলো। (সে সময় জামাত ইসলামী নামের সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।) আমি সেই লেখা পড়ে গভীরভাবে প্রভাবিত হই।

আমার বন্ধু মাওলানা আবুল হাসান নদভী এই বই এর লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) এঁর ব্যাপারে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আর তাঁর সাধনা সম্পর্কে আরো জানার জন্যে কাছে গেলেন। মাঝে সাঝেই মাওলানা (রঃ) এঁর সাথে দেখা করতেন তিনি।

তখন আমি রেরেলীতে থাকি। নিয়মিতভাবে মাওলানা নদভীর সাথে যোগাযোগ রাখছি। তাঁর চিঠিতে জানতে পারি তিনি

www.eelm.weebly.com

মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) আর তাঁর তাবলীগ ও দাওয়াত সম্পর্কে বেশি আকর্ষণ অনুভব করছেন। আমি নিজামুদ্দিনে যাওয়া আসা শুরু করার আগে পর্যন্ত তিনি আমাকে বুঝিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষমেশ আমরা দু'জনে একসাথেই নিজামুদ্দিনে গেলাম।

মাওলানা (রঃ) এঁর খুব কাছে থেকে, তার সাথে সময় দিয়ে আর তাঁর বক্তব্য শুনে দুটো সিদ্ধান্তে এলাম। (১) মাওলানা (রঃ) এঁর ডাক কার্যকারিতার দিকে সুদূরপ্রসারী আর তাঁর অটল নীতিমালায় কোনো ফাঁক নেই; এটা আচমকা কোনো আবেগ থেকে আসেনি। কোরআন, হাদিস আর সাহাবাদের পবিত্র জীবনী গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনার ফল। তাবলীগ হচ্ছে ঈমানের প্রকৃতি, প্রদীপ্ত তেজস্বীতার উজ্জ্বল প্রকাশ। মাওলানা (রঃ) তাঁর সদাসতর্ক মনন ব্যবহার করে এই কাজ শুরু করেন। তাঁর মনে সুসমন্বিত এ কাজের সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত প্রভাব সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস ছিল। সব ধরনের মুসলমানের ধর্মীয় আধ্যাত্মিক বিপ্লব বা সংস্কারের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা এই কাজে নিহিত এটা তাঁর মনে প্রাণে গাঁথা ছিল। এই কাজে তিনি ছিলেন অক্লান্ত। অবিরাম, অবিশ্রাম পরিশ্রম করতেন লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে। জনতার মাঝে ইসলামী জীবন যাপন পদ্ধতি জাগিয়ে দেয়া আর পারলৌকিক সফলতার জন্যে আকুল করে তুলতে কাজটি ছিল অবিশ্বাস্য, দ্রুত ও বৈপ্লবিক ভাবে কার্যকর।

(২) মাওলানা (রঃ) এঁর ব্যক্তিত্ব।

যতই তাঁর সম্পর্কে জানলাম ততই অভিভূত হলাম আমি। আধ্যাত্মিক আলোয় সমুজ্জ্বল আর গভীর অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন আমার ক'জন বন্ধু বুঝতে পেরেছিলাম যে এ সময় মাওলানা (রঃ) এঁর অস্তিত্ব হলো আল্লাহতায়ালার ক্ষমতা আর প্রবল প্রতাপের অলৌকিক প্রকাশ। পূতঃ পবিত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার সুদূর প্রসারী সাক্ষ্য। মাওলানা (রঃ) ছিলেন ইসলামের অমরতা ও স্থায়িত্বের জাজ্বল্য প্রমাণ আর প্রতিনিধি। আমার বন্ধুদের এমন মনে হয়েছে তাঁর সম্পর্কে যেন তিনি সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুদের গতিবিধি, উদ্যম ও সমৃদ্ধি অপলকে দেখছেন আর চৌদ্দশো শতাব্দীর এতিম উম্মতকে তার ধারণা দিচ্ছেন।

www.eelm.weebly.com

মাওলানা (রঃ) এঁর সাথে থেকে আমি একথাও বুঝে নিলাম যে বই কিতাবে আল্লাহওয়ালা মানুষের যে জীবন চরিত রচনা করা হয় তাতে ওই সব মহান মানুষের বৈশিষ্ট্যময় ব্যক্তিগত চরিত্র, প্রকৃত নৈতিক অবস্থা আর উন্নত আত্মিক উৎকর্ষতার হুবহু চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর বিবরণ আসেনা। সম্ভবও নয়। এটা এতই সুক্ষ্ম এবং রহস্যময় যে তার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় কলম ও খাতায় আনা যায় না। এই ব্যাপারটা বুঝতেই মাওলানা (রঃ) এঁর সান্নিধ্যে মুগ্ধ, মোহিত, অভিভূত ও হতবাক আমি তাড়াতাড়ি তাঁর সব সময়ের কথাগুলো টুকে নেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ হলাম। তিনি তখন বেঁচে। আমি তাঁর অনুমতি নিলাম। তারপর ওগুলো মাসিক 'আল ফোরকানে' নিয়মিত ছাপা হলো। পরে এই সংকলিত বাণী বই আকারে ছাপা হয়েছিল।

আমি নিজেই মাওলানা সাহেবের জীবনী লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মনস্থির করতে পারিনি। কারণ মাওলানা (রঃ) কখনও এটা চাননি কঠোর বিরোধিতা করেছেন। এমনকি জীবনের শেষ সময়েও চাননি যে এতো বড় মহান কাজের মাঝে তাঁর জীবন চরিত নিয়ে বাড়াবাড়ি হোক। এমনকি তাঁর নাম উচ্চারণ করুক এটাও তিনি চাননি। তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ আর দ্বীনি কাজে আন্তরিক। মনের গতিবিধির ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ, সতর্ক দৃষ্টি ধর্মের আসল রূপটি আমাদের সামনে প্রকাশিত করে। ধর্মের মূল উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করে। তবু মাওলানা (রঃ) এঁর উদ্দেশ্য আমরা পুরোপুরি ধরতে পারছি না বলেই মনে হয়েছে।

অনেক সময় এই মেহনতকে বোঝার জন্যে যাঁরা দ্বীনের কাজে নিজেদের সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁদের প্রেরণার আলোচনা করা জরুরী হয়ে পড়ে। মাওলানা (রঃ) এঁর ভেতরে যে ধর্মীয় আগুন ও আকুলতা আর ঈমান সম্পর্কে তার বক্তব্য জানাও খুব দরকার ছিল। তাছাড়া তাবলীগ নামের এই জাগরণের মৌলিক নিয়ম কানুনগুলো তাঁর কাছ থেকে জেনে তা বাস্তবায়নের সময় কি প্রতিক্রিয়া হবে তাও জানার ব্যাপার ছিল। এসব অবস্থান ওপর আমার বারবার এ কথাই মনে হচ্ছিল মাওলানা (রঃ) ও তাঁর সুবিশাল কাজের ওপর ভিত্তি করে একটা জীবনী লেখা দরকার। সে সময় মাওলানা (রঃ) দূরারোগ্য অসুখে ভুগছিলেন। নিজামুদ্দিনে তখন মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী

www.eelm.weebly.com

রয়েছেন। আমার মনের কথা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন তাঁর চিন্তাধারাও একই খাতে বইছে। তিনি আরও জানালেন লেখার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। মাওলানা আখতার ইলিয়াস (রঃ) এঁর ইন্তেকাল হলো এই সময়। জীবনী লেখার ব্যাপারে পরামর্শ হলো। সবাই এক কথায় রাজী হলেন। এই মহান দায়িত্ব পড়লো মাওলানা নাদভীর ওপর।

তখন মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) এঁর সব সাথী আর আত্মীয়ের স্বজন নিজামুদ্দিনে এলেন। মাওলানা নদভী তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা শুরু করলেন। মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) এঁর মুখপাত্রকে কাছে পাওয়া গেল। তাবলীগের লক্ষ্য নীতি সম্পর্কে মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) নিজেই চিঠিতে বিস্তারিত লিখে জানিয়েছিলেন মাওলানা নাদভীকে। অন্য সাথীরাও তাদের কাছে লেখা মাওলানা (রঃ) এঁর চিঠি তাঁকে দিলেন। এছাড়া সবধরনের মূল্যবান তথ্য দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করলেন।

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়ার উদার সহযোগিতা এ কাজে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছিল তাকে।

পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে গেল।

মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) এঁর খুব বেশি সুহৃদ আর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনের কাছে পাঠালেন সেটা। সবার পরামর্শ ও সাহায্য চাইলেন। বিভিন্ন সফরে পাণ্ডুলিপিটি পড়া হতো। যেন কোন ও ভুল-চুক না থেকে যায়।

আমার মতে বইটির লেখক তাঁর চেষ্টায় বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয় সফলতা পেয়েছেন। পৃষ্ঠাগুলো পড়ে যাঁরা মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) এঁর দেখা পাননি তারা খানিকটা তাঁর সম্পর্কে জানতে পারবেন। পুরোপুরি নয়।

আমার সৌভাগ্য যে আমি তাঁর মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর পাশে ছিলাম। তিনি কঠিন অসুখে ভুগছিলেন। আমি একথা খোলাখুলি বলতে পারি যে, রোজ তাঁকে আগের দিনের চেয়ে মহীয়ান মনে হয়েছে। মৃত্যুর প্রায় চার মাস আগে খুব উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন একজন আল্লাহওয়ালা বলেছিলেন, "এখন তিনি (ইলিয়াস) প্রতি মুহূর্তে হাজার মাইল বেগে ছুটছেন।'

এ কথার আসল মর্ম আমি তখন বুঝতে পারিনি। তিনি যাচ্ছেন কোন সফরে বুঝতে পেরেছি পরে।

www.eelm.weebly.com

মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) মাঝে সাঝেই একথা বলতেন যে তাঁর তাবলীগ নামের এই জাগরণী আন্দোলন হলো ইসলামের সোনালী সময়ের হারানো মানিকের মতো। বাড়াবাড়ি না করে আমি মাওলানা (রঃ) সম্পর্কে একথা বলতে পারি যে তিনি ছিলেন সে যুগের মানিক ভাণ্ডারের একটা ঝলমলে মুক্তা।

বইয়ে আমরা অনেক খ্যাতিমান সাধকদের কথা পড়েছি। তাদের অলৌকিক আধ্যাত্মিক ক্ষমতার বর্ণনা বস্তুবাদী মন বিশ্বাস করতে চায়না। অথচ আমি নিজ চোখে মাওলানা (রঃ)এঁর মাঝে সেসব দেখে এখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। আর আমি এত বিহ্বল হয়েছি যে হাজার যুক্তি দিয়েও তা আপনাদের ঠিক মতো বোঝাতে পারবো না।

এই বইয়েও মাওলানা (রঃ) আর তাঁর পূর্বপুরুষ সম্পর্ক এমন বিবরণী পাবেন যা আপনার কাছে বর্তমান সময়ের অন্ধত্ব, অবিশ্বাস আর অগভীর চেতনার প্রেক্ষাপটে অবিশ্বাস্য মনে হবে। আসলে লেখক ওগুলো খুব ভালো করে যাচাই বাছাই করে লিখেছেন। শুধু নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া সত্য তথ্যই লিখেছেন। আর বেশির ভাগ ঘটনাই লেখক যখন নিজামুদ্দিনে ছিলেন বা তাঁর (রঃ)এঁর সাথে সময় দিচ্ছিলেন তখন ঘটেছে।

জীবনীটিতে মাওলানা (রঃ)এঁর ব্যক্তিগত বিত্তান্তের চেয়ে তার ডাক আর সাধনারই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি চেয়েছেন মাওলানা (রঃ) এঁর সাথে বিশ্বের পরিচয় করে দিতে। সাথে সাথে তাঁর কাজ, সাধনা, ব্রত আর অনুপম প্রচেষ্টার খুঁটি নাটি জানিয়ে দিতে।

মাওলানা মানজুর নোমানী

লাখনৌ
পঁচিশে ডিসেম্বর,
উনিশ শো আটাত্তর

www.eelm.weebly.com

সত্তুর বছর আগের কথা।

দিল্লীর উপকণ্ঠে খাজা নিজামুদ্দিন (রঃ) এঁর মাজার। কাছেই 'চাওষটি খাম্বা' নামের ঐতিহাসিক ভবন। এর লাল ফটকের ওপরের একটা ছোট ঘর। এখানে বাস করেন একজন আল্লাওয়ালা মানুষ।

নাম, মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসমাইল।

তাঁর পূর্বপুরুষের বসতভিটা ছিল মোযাফফর নগর জেলার ঝানঝানাতে। প্রথমা স্ত্রী মারা গেলেন। তিনি তখন কান্দালওয়াই এর সুবিখ্যাত মুফতি ইলাহি বখশ এর পরিবারে বিয়ে করলেন। কান্দালাতে যাওয়া আসা বেড়ে গেল। একসময় এখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন।

ধর্মানুরাগ আর জ্ঞান চর্চার জন্যে ঝানঝানা আর কান্দালার সিদ্দিকী শেখ পরিবার আশপাশ ও দূরদুরান্ত পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় উঁচু মর্যাদা আর সম্মান পেয়েছিলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসমাইল আর মুফতি ইলাহি বখশ ছয় পুরুষ একসাথে ছিলেন। বংশ গতিধারা ছিল নিচের মতো–

মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসমাইল, তাঁর ছেলে, গোলাম হোসেন, তাঁর ছেলে, হাকিম করিম বখশ; তাঁর ছেলে হাকিম গোলাম মাহিউদ্দিন; তাঁর ছেলে, মৌলভী মুহাম্মদ সাজ্জাদ তাঁর ছেলে, মৌলভী মুহাম্মাদ ফাইয়াজ; তাঁর ছেলে মৌলভী মুহাম্মাদ শরীফ; তাঁর ছেলে, মৌলভী মুহাম্মাদ আশরাফি; তাঁর ছেলে, শেখ জামাল মুহাম্মাদ শাহ্; তাঁর ছেলে, শেখ বাবর শাহ্; তাঁর ছেলে, শেখ বাহাউদ্দিন শাহ্; তাঁর ছেলে, মৌলভী মুহাম্মাদ শেখ; তাঁর ছেলে, শেখ মুহাম্মাদ ফাজিল, তাঁর ছেলে, সর্বজনাব কুতুব শাহ।

মুফতি ইলাহি বখশ ছিলেন শাহ আবদুল আজিজ (রঃ) এঁর একজন বিশিষ্ট ছাত্র। একদিকে প্রসিদ্ধ শিক্ষক, সুবিখ্যাত লেখক, প্রতিষ্ঠিত আইনজীবি ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ইউনানী চিকিৎসক। ঐতিহ্যবাহী বিজ্ঞান আর যুক্তিবিজ্ঞানেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। আরবী, ফার্সি আর উর্দু কবিতায়ও তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর ভাষার এই অপরিসীম দক্ষতা প্রমাণ পেয়েছে যখন "বানাত সু'আদ" এর ধারা বিবরণী প্রকাশ পেল।

তিনি "হযরত কাআব"-এর প্রতিটি ছাত্র আরবী, ফার্সি আর উর্দুতে অনুবাদ করেছেন। আরবী ও ফার্সি ভাষায় তিনি প্রায় ৪০টির মতো বই লিখেছেন। তার মাঝ থেকে নাম পেয়েছে "সিয়ামুল হাবীব" আর "মাথনাউই রুম কা তাকলিমা"।

www.eelm.weebly.com

মুফতি ইলাহি বখশ বাইয়াত হন শাহ আবদুল আজিজের হাতে। যদিও তিনি নিজেই আধ্যাত্মিক জগতে বিজ্ঞ ছিলেন। এটা ছিল তাঁর নিজেকে বিলীন করে উজ্জ্বল প্রদীপ্ত আত্মা অর্জন করার সাধনা। শাহ আবদুল আজিজ (রঃ)এঁর এন্তেকালের পরে তাঁরই তরুণ শিষ্য সাইয়েদ আহমাদ শহীদের হাতে বাইয়াত হন। তিনি মুফতি সাহেবের চেয়ে বয়সে আটত্রিশ বছরের ছোট। বড় মানুষেরা চিরকালই নত থাকেন।

মাথনাউই হলো বড় কবিতা। পরম্পরা অন্তমিল যার বৈশিষ্ট্য। রুমীর মাথনাউই প্রসিদ্ধ, জনপ্রিয় ও পরিচিত হয়েছে "মাথনাউই জালালউদ্দিন রুম" নামে। ফার্সি ভাষার জগদ্বিখ্যাত এক অনবদ্য সৃষ্টি হচ্ছে এই মাথানাউই। এই সাহিত্য কর্ম ফরাসী ভাষায় ও ইসলামী সাহিত্যের অমূল্য রতন হিসেবে পরিচিত হয়েছে। মুফতি ইলাহি বখশ এই মহান সাহিত্যটির তাকলিমা রচনা করেন।

মুফতি সাহেব ১৭৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিরাশি বছর বয়সে ১৮৩৬ সালে দুনিয়া ছেড়ে ওপারে চলে যান। তাঁর ছেলে ও নাতিরা সবাই মানুষ হিসেবে ছিলেন জ্ঞানী আর সম্মানিত। এঁদের দুটো বড় গুণ ছিল। তা হচ্ছে জ্ঞানান্বেষণ আর ধর্মে প্রবল ঝোঁক। জ্ঞানের পেছনে ছোটার জন্যে উপরি হিসেবে তাঁদের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড মেধা আর উঁচু ধরনের চরিত্র। ছিল স্বভাবজাত বুদ্ধিমত্তা, ঐশীপ্রেম। মৌলভী আবুল হাসানের "মাথনাউঈ', 'গুলজারে ইব্রাহিম' এর মতো কবিতাগুলো অসাধারণ আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে লালন করছে। এসব কবিতাগুলো তাঁর লেখা বাহর-ই-হাকীক্বাত বইয়ের অংশ। আজ পর্যন্ত এটা জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তাঁর ছেলে মৌলভী নূরবল হাসান আর চার নাতি মৌলভী জিয়াউল হাসান, মৌলভী আকবর, মৌলভী সুলায়মান, হাকিম মৌলভী ইব্রাহিম প্রমুখ খ্যাতনামা পূর্বপুরুষদের সুযোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে নিজেরাও বিখ্যাত হয়েছিলেন।

মুফতি সাহেবের ভাতিজা মাওলানা মোযাফফর হোসেন ছিলেন একজন আল্লাহওয়ালা মানুষ। তিনি শাহ ঈসহাক এর প্রিয়তম শিক্ষার্থী। তাছাড়া সাইয়েদ আহমাদ শহীদের সঙ্গ লাভ করেছিলেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে সন্দেহজনক কিছু তিনি কখনো ছুঁয়েও দেখেনি। তাঁর দান, দয়া আর ইবাদাতের ঘটনা আজো ওই এলাকার মানুষের মুখে মুখে ফেরে। কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হয়েছিলেন তিনি তাঁর সময়েই। মনে রাখার মতো সেসব ঘটনাগুলো ইসলামের স্বর্ণযুগের কথা স্মরণ করে দেয়। মাওলানা মোযাফফর হোসেনের মেয়ের ঘরের নাতনির সাথে মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসমাইলের বিয়ে হয়। অক্টোবরের ৩০ তারিখ, ১৮৬৮ সাল; ১৩ রজব, ১২৮৫ হিজরিতে বিয়ে সুসম্পন্ন হয়। এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে।

মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসমাইল ছিলেন ইলাহি বখশ্ এর সন্তানদের গৃহশিক্ষক। শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের সাথে সম্পর্ক ছিল। 'চাওষটি খাম্বা'র লাল তোরণের ওপরের ঘরে আমরা তাকে থাকতে দেখেছি। তারই কাছে একটা ছোট

www.eelm.weebly.com

মসজিদ। এর সামনের অংশ ব্যবহার হতো মির্জা ইলাহি বখশের দরবার হিসেবে। এই মসজিদটি 'বাঙলাওয়ালী মসজিদ' নামে পরিচিত।

আজ সেই মসজিদ জগতের মানুষের মিলন কেন্দ্র হয়েছে।

মাওলানা তাঁর দিনগুলো কাটাচ্ছিলেন একাকী। এমনকি মির্জা ইলাহি বখশেরও মাওলানা সাহেবের উঁচু আধ্যাত্মিক মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা ছিল না। তারপর একসময় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন যে কিভাবে মাওলানার দোয়া আল্লাহতায়ালার কাছে কবুল হয়।

মুসাফিরদের খিদমত করা, ইবাদাত, জিকির, কোরআনুল কারিম শেখানো, ঈমান বোঝানো আর পথ দেখানোই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ। সেই পথে যাওয়া আসা করে এমন পিপাসিত মুটে মজুরের মাথার বোঝা নিজ হাতে মাটিতে নামিয়ে রাখতেন। কুয়ো থেকে পানি তুলে পান করাতেন তাদের। তারপর তিনি দু'রাকাত নামাজ পড়তেন। শুকরিয়া জানাতেন আল্লাহর কাছে। এজন্যে যে তাঁকে মানুষের সেবার সুযোগ দিয়েছে। আর একথা মনে করতেন, "হে আল্লাহ, আমি তো এতো বড় সৌভাগ্যের যোগ্য নাই। তবু তুমি তাওফিক দিচ্ছো।"

এভাবে সেবা আর ইবাদাতের অখণ্ড সাধনা করে তিনি 'ইহসান' পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন।

একবার তিনি মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রঃ) কে সুলুক শেখানোর জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। উত্তরে গাঙ্গুহী (রঃ) বলেছিলেন, 'এটা আপনার দরকার নেই আপনি এর মধ্যেই সুলুকের শেষ লক্ষে পৌঁছেছেন।' ব্যাপারটা এমন যেন কোনো লোক কোরআন শরীফ পড়ার পর বলছে যে আরবী ভাষার প্রথম পাঠ (কায়দা) পড়া দরকার।

কোরআন শরীফ তিলাওয়াতে মাওলানা সাহেবের গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি ছাগল চরাতেন আর কোরআন তিলাওয়াত করতেন। এটা ছিল তাঁর পুরোন অভ্যেস।

পরিবারের সদস্যদের ওপর খেয়াল রাখতেন। রাতের বেলায় তিনি তাদের আমল দিতেন, তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মাওলানা ইয়াহিয়া মাঝরাত পর্যন্ত আরবী পড়তেন। তারপর ঘুমুতে যেতেন। তখন মাওলানা ইসমাইল জেগে উঠে ইবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত হতেন। রাত শেষে বড় ছেলে মাওলানা মুহাম্মাদকে ডেকে তুলতেন। তিনিও বন্দেগীতে মগ্ন হতেন।

কারো বিরুদ্ধে মাওলানা সাহেব কখনো হিংসা পোষণ করেননি। দুনিয়ার সাথে তাঁর সম্পর্ক প্রায় ছিলই না। সেজন্য তিনি সবার আপন হয়েছিলেন। যাঁরা কাছে আসতো সবাই তাঁর ধর্মানুরাগ, আন্তরিকতা আর স্বার্থহীন হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হতো। দিল্লীর বিবাদমান দলগুলোর নেতারা তাঁকে খুব সম্মান করতো। এরা একজন অপরকে পছন্দ করতো না, একে অন্যের পেছনে নামাজ পড়তো না। কিন্তু মাওলানা সাহেবের প্রতি ওদের সবারই ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আর আস্থা।

www.eelm.weebly.com

তিনি বেঁচে থাকতেই মেওয়াতের সাথে তাঁর সম্পর্ক হয়েছিলো। একদিন তিনি মসজিদ থেকে বেরুলেন। উদ্দেশ্য, কোনও এক মুসলমানকে মসজিদে এনে নামাজ পড়াবেন। ক'জন দিনমজুরের সাথে তাঁর দেখা হলো। ওরা কাজে যাচ্ছে। তিনি তাদের ডাকলেন। শুধালেন, 'আজ তোমরা কতো আয় করবে?'

রোজ তারা যেটা পেতো সেটাই বললো। তিনি বললেন, 'তোমরা যদি সেই মজুরী এখানেই পেয়ে যাও?'

'তাহলে তো কাজ খোঁজার দরকার নেই।' তারা উত্তর দিল।

তিনি দিনমজুরদের নিয়ে মসজিদে ঢুকলেন তাদের শেখালেন নামাজ কালিমা আর কোরআন। দিন শেষে দিয়ে দিলেন তাদের মজুরী। তারা খুশি। পরদিন। সেই পথে আবার তিনি দাঁড়িয়ে। দিনমজুরদের মজুরী দেবার কথা দিয়ে ঢোকালেন মসজিদে। নতুন উদ্যমে চললো নামাজ শেখা, সুরা কিরাতের মশক বা চর্চা আর কালিমা তাইয়্যিবা শুদ্ধ করে পড়ানো। দিন শেষে মিটিয়ে দিতেন মজুরী।

বিপুল উদ্দীপনা দেখা দিল। দিনমজুরদের মাঝে। গড়ে উঠলো নিয়মিত নামাজ পড়ার অভ্যেস। বাংলাওয়ালী মসজিদে প্রথম ছাত্র ছিল ওইসব দিনমজুর। এরপর প্রায় দশজন মেওয়াতি ছাত্র সব সময়ের জন্যে মাদ্রাসায় রয়ে গেল। এদের খাবার আসতো মির্জা ইলাহী বখশের বাসা থেকে।

১৯১৫ হিজরি, চৌঠা শাওয়াল।

১৮৯৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি।

মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসমাইল (রঃ) চলে গেলেন পরপারে। দিল্লীর বাহরাম এলাকার তিহারায় খাজুরওয়ালী মসজিদ। এখানেই তিনি মৃত্যুর সময় ছিলেন। শবযাত্রটির চিল বিস্ময়কর। খাটিয়ার দু'ধারে লম্বা বাঁশ বেঁধে দেয়া হয়েছিলো। সবাই যাতে খাটিয়া কাঁধে নিতে পারে। তিন মাইল পথ। কিন্তু লোকজন এতো বেশি ছিল যে বেশির ভাগ মানুষই দীর্ঘ বাঁশ কাঁধে নিতে পারেনি।

নানান দল আর চিন্তাধারার সব মুসলমান যাঁরা কখনো একসাথে হননি, তারা সবাই শবযাত্রাটির শরীক হলেন। মাওলানা সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া বলেন, 'আমার বড় ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ কোমল হৃদয়ের বিনয়ী মানুষ। আমরা ভয় পাচ্ছিলাম তিনি হয়তো কোনো দলের কাউকে শবযাত্রার দায়িত্ব নিতে বলবেন। সেক্ষেত্রে ওই দলের বিরোধীরা প্রার্থনার অংশ নিতে চাইবে না। একটা অস্বস্তি কর আর অযাচিত পরিবেশ তৈরি হবে। তাই আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। নিজেই শবযাত্রার নেতৃত্ব নিলাম। সবাই শান্তিমতো দোয়ায় শরীক হলেন।

অনেক লোক।

তাই বেশ ক'বার জানাজা পড়াতে হলো। দাফনে দেরি হয়ে গেল। এসময় শ্রদ্ধের এক বয়স্ক বুজুর্গ আর অন্য একজন যিনি সবার কাছে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে

www.eelm.weebly.com

পরিচিত ছিলেন, তিনি দেখতে পেলেন মাওলানা একথা বলছেন, 'আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে দাও। আমি লজ্জা পাচ্ছি। কারণ, আমার জন্যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা করছেন।'

মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসমাইল (রঃ) এঁর তিন ছেলে। প্রথমা স্ত্রী'র পক্ষে মাওলানা মুহাম্মাদ।

আর দ্বিতীয় ঘরে মাওলানা ইয়াহিয়া ও মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)।

সূর্যোদয়

১৮৮৫ সালের এক সোনালী সকাল।

এই দুনিয়া মুখ দেখলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আখতার ইলিয়াস (রঃ)।

কান্দালার ছোট এক কুটিরে। নানাবাড়িতে কাটলো তার শিশু সময়। একটু বড় হতেই চলে এলেন বাবার কাছে। নিজামুদ্দিনে।

এই দিনগুলোতে কান্দালা পরিবারে ছিল ধর্মের প্রকৃত ও উজ্জ্বল নমুনা। পরিবারের উচু ধর্মীয় মূল্যবোধ, রাতের আরাধনা, জিকির আর কোরআন তিলাওয়াতের চর্চাকে আমাদের আজকের দিনের মরা মনের মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য ও রহস্যময় মনে হবে।

মহিলারা নফল নামাজে কোরআন তিলাওয়াত করতেন। পুরুষ আত্মীয়দের পেছনে দাঁড়িয়ে তারাবির নামাজ ও অন্য সব নফল ইবাদাতে কোরআন শুনতেন। আর রমজান মাস কোরআন তিলাওয়াতের জন্য মধু মাস ছিল যেন। সব ঘরেই অনেকক্ষণ ধরে কোরআন তিলাওয়াত চলতো।

উর্দু অনুবাদ, ধারা বিবরণীসহ কোরআন পড়া, 'মাযাহিরে হক', 'মাশরিফুল আনোয়ার 'আর হিসনে হাসিন' এর চর্চা চলতো সারাদিন। সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) ও শাহ আবদুল হামিদ (রঃ) এঁর পরিবারের দ্বীনের জন্যে আত্মোৎসর্গের ঘটনা ছিল পারিবারিক আলোচনার বিষয়। এই দুই সুবিখ্যাত আল্লাহওয়ালার জীবনের সত্য ঘটনাগুলো সবার মুখে মুখে ছিল। রাজারাণী, জলপরী আর আকাশপরীর কাহিনী না শুনিয়ে বাচ্চাদের শোনাতেন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আর আনহাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মবলিদানের রোমহর্ষক সত্য ঘটনা।

মাওলানা সাহেবের নানী আমাতুস সালাম। পরিবারে তিনি 'আম্মিবি' নামে পরিচিত। মাওলানা (রঃ) বলেন, 'এক সময় আমি দেখলাম তাঁর নামাজে মাওলানা গাঙ্গুহী (রঃ)এঁর ছায়া। সেই একই ঐকান্তিকতা, ধ্যান আর নিবিষ্ট তন্ময়।'

জীবনের শেষ দিকে আম্মিবি কখনো খাবার নিজ থেকে খেতে চাইতেন না। যদি কেউ তার সামনে খাবার রেখে যেতো শুধু তখনি খেতেন। পরিবারটি ছিল বেশ বড়। নানান ঘরোয়া কাজ থাকতো। টুকিটাকি কাজের চাপে খাবার কথা ভুলে যেতেন তিনি।

www.eelm.weebly.com

সেদিন হয়তো না খেয়েই থাকলেন। একদিন কেউ তাকে বললো, 'আপনার বয়স হয়েছে আপনি দুর্বল। না খেয়ে কী করে থাকেন?'

'আল্লাহর স্মরণ করি। মাশাআল্লাহ, তাতেই প্রাণ ভরে যায়।'

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ)এঁর মা শাফিয়া বিবি খুব ভালো কোরআন শিখেছিলেন। পুত্র মুহাম্মাদ ইয়াহিয়ার দুধের সময় তিনি হেফজ করেছিলেন। সাধারণ হাফিজ তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারতো না। পুরো কালামে পাক রোজ তিলাওয়াত তাঁর নিয়মিত অভ্যেস ছিল। তার ওপর তিনি আরো দশ পারা তিলাওয়াত করতেন। তাঁর কোরআন তিলাওয়াত এতো ঝরঝরে ছিল যে সারা দিনের কাজের কোনো ক্ষতি হতো না। রোজার মাস ছাড়া অন্য সময় তাঁর রোজকার ইবাদাত এমন ছিল।

পাঁচ হাজার করে দরুণ শরীফ;
পাঁচ হাজার বার ইসমে জাত আল্লাহ;
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এক হাজার নয়শো বার;
ইয়া মুগনিউ এগারোশো বার;
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বারো শো বার;
হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল পাঁচশো বার;
সুবহানাল্লাহ দু'শো বার;
আস্তাগফার পাঁচশো বার;
ওয়া আফবিদু আমরি ইলাল্লাহ একশো বার;
রাব্বি আন্নি মাগলুবুন ফানতাসিরথ– একশো বার,
রাব্বি আন্নি মাস্সান্নিয়াদ দুররু ওয়া আন্তা আরহামার রাহিমিন– একশো বার;
লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমিন– একশো বার।
এতো সব আমাল তিনি পারিবারিক সব কাজের ফাঁকে করতেন।

শিশুসূর্য

সংসারের আর সবার মতো মাওলানা (রঃ) মক্তবে তাঁর শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি নেন। পারিবারিক ঐতিহ্য মতো তিনিও কোরআনুল কারিম মুখস্থ করেছিলেন। কোরআন পাকের চর্চা তাঁর পরিবারের সাধারণ বিষয় ছিল। তাই দেখা যেতো পারিবারিক মসজিদের দেড় কাতার মুসুল্লির মাঝে সবাই হাফিজ।

নানীজান আম্মিবির সবচেয়ে প্রিয়জন ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ)। তিনি তাঁকে প্রায়ই আদর করে বলতেন, 'আখতার, কী রহস্য বুঝি না। তোকে দেখলে, আমার সাহাবাদের কথা মনে পড়ে। তোর মাঝে আমি তাঁদের সৌরভ অনুভব করি। আমি যেন তোর সাথে তাঁদের ছায়া বা আকৃতিকে ঘোরাফেরা করতে দেখি।'

www.eelm.weebly.com

আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুদের জীবনে ধর্মীয় যে উষ্ণতা, আবেগ আর আন্তরিকতা ছিল, ছেলেবেলা থেকেই তা ইলিয়াস (রঃ)এঁর মাঝে প্রকাশ পেতে থাকে। তাঁর প্রচণ্ড দ্বীনি ব্যাকুলতা দেখে শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রঃ)এঁর একবার বললেন, 'আমি যখন মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াসকে দেখি তখন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুদের কথা মনে পড়ে যায়।'

দ্বীনের ব্যাপারে অন্তরের অন্তস্থলে সুতীব্র আবেগ শিশুকালেই তাঁর সত্তার ভেতর লুকিয়ে ছিলো। পরে সেটাই তাঁর ব্যক্তিত্বে অত্যন্ত পরিমিত আর সুসংগঠিতভাবে দানা বেঁধে ওঠে। একসময় তা বাঁধনহীন ঝর্ণার মতো পাথর ছিঁড়ে প্রকাশ পায়। তারপর সে ঝর্ণাধারা গোটা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে যায়।

তাঁর মনের গভীরদেশে দ্বীনি আবেগের স্ফুলিঙ্গ প্রচণ্ড আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলে ওঠে আলিম আর আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্শে। ছোটবেলায় তিনি যা করতেন তা সাধারণ আর দশজন ছেলেপুলেদের চেয়ে আলাদা ছিল। পুরোপুরি। রিয়াজুল ইসলাম কান্দুলভী তাঁর মক্তবের সহপাঠী ছিলেন। তিনি বলেন, 'মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) একদিন লাঠি হাতে এলেন। আর বললেন, "এসো রিয়াজুল ইসলাম, আমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করি যারা নামাজ পড়ে না"।'

আলোর পথে

হিজরী তেরশো চৌদ্দ শেষ দিক।

এ সময় মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) গাঙ্গোহ যান। উদ্দেশ্য ছিল হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রঃ)এঁর সাথে থাকা।

মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)এঁর তার পিতার সাথে কখনো নিজামুদ্দিনে ফের মাঝে সাজে নানাবাড়ি কান্দালায় থাকতেন। ব্যাক্তিগত ইবাদাতে তাঁর বাবা গভীরভাবে নিমগ্ন থাকার জন্যে ছোট ছেলের লেখাপড়ার দিকে খেয়াল দিতে পারেননি। তাছাড়া এই রুগ্ন ছেলেটির ওপর তাঁর ছিল অসীম স্নেহ মমতা। তাতে লেখাপড়ার ক্ষতিই হচ্ছিল বলতে হয়। সেজন্য বড় ভাই মাওলানা ইয়াহিয়া বাবার কাছে অনুমতি চাইলেন ছোট ভাইকে সাথে রেখে লেখাপড়া করাবেন। তিনি তখন গাঙ্গুহে চলে এলেন।

তাঁর (রঃ)এঁর শিশু শিক্ষা শুরু হলো বিশেষভাবে

এসময় মাওলানা গাঙ্গুহী (রঃ)এঁর নিরালা ইবাদাতে সময় কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী (রঃ) তাকে অনুরোধ করলেন হাদিসের দরস দিতে। তিনি রাজী হলেন। কারণ পাশে পেয়েছিলেন ছাত্র মাওলানা ইয়াহিয়াকে। অনেকটা যেন তাঁর খাতিরেই তিনি শুরু করলেন হাদিসের দরস্ দেয়া। শেষবারের মতো।

www.eelm.weebly.com

দরসের এ মজলিশের প্রধান পুরুষ ও লক্ষ ছিলেন মাওলানা ইয়াহিয়া। তাঁর বাইরের হাদিসের শিক্ষা তখন বন্ধ থাকতো। তাঁকে খানিকক্ষণ দেখতে না পেলে মাওলানা গাঙ্গুহী (রঃ) অস্থির হয়ে পড়তেন। তার ওপর হযরতের এমনি নজর পড়েছিলো যে মাওলানা ইয়াহিয়া তাঁর একান্ত সচিবের কাজও করতেন। গাঙ্গুহী (রঃ) বলতেন, 'মৌলভী ইয়াহিয়া হচ্ছে এই অন্ধের লাঠি।'

সে সময় গাঙ্গোহ ছিল সুফি সাধক আর জ্ঞানীদের ঠিকানা। তাঁদের দুর্লভ ও মূল্যবান সঙ্গ পাওয়া মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)এঁর জন্যে সহজ হয়ে গেল। ছেলেবেলাটা কেটে গেল এই সব মহান পুরুষদের সাথে। তাঁর বয়স তখন দশ কি বারো। হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রঃ)এঁর যখন ইন্তেকাল করলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। যুবক। প্রাণবন্ত, জ্যোতির্ময়। এভাবে তিনি গাঙ্গুহী (রঃ)এঁর সাহচর্য পেলেন নয় বছর।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। উপকারী বন্ধু। তাঁর মনে সারাক্ষণ এই আশা যেন তার ভাই এইসব জগদ্বিখ্যাত আধ্যাত্মিক ক্ষমতাময় বিশিষ্ট মহান মানুষগুলোর কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি জেনে আর শিখে নিতে পারে।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রঃ) বলতেন, 'যখন ওলামারা ওখানে আসতেন তখন আমার বড় ভাই পড়া শেখানো বন্ধ করে দিতেন। তাঁদের সাথে কথা বলতেন। শিখতেন। আর আমাকে শুনতে ও শিখতে সাহায্য করতেন।' ছাত্র ও বাচ্চাদের মাওলানা গাঙ্গুহী (রঃ) কখনো বাইয়াত করতেন না। শুধু লেখাপড়ার জীবন শেষ হলে তারা অনুমতি পেতেন। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রঃ) ব্যতিক্রমধর্মী, বাইয়াত করে নিলেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) আল্লাহর আশির বান্দা ছিলেন। মানুষের প্রতিও তাঁর অন্তর ছিল মমতা আর প্রেম পীযুষে ভরা। বিশেষ করে আল্লাহওয়ালাদের ওপর তাঁর ভক্তি, অনুরাগ আর শ্রদ্ধা ছিল সীমাহীন। তিনি মাওলানা গাঙ্গুহী (রঃ)এঁর প্রতিও দুর্বল হয়ে পড়লেন। তাঁকে ছাড়া তিনি শান্তি পেতেন না। রাতের গভীরে উঠে পড়তেন। গাঙ্গুহী (রঃ)এঁর কে একনজর দেখে ফিরে আসতেন। এতে তাঁর মন প্রশান্ত হয়ে যেতো।

মাওলানা গাঙ্গুহী (রঃ) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন।

একদিন মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) তাঁর ভাইকে বললেন, 'ভাই, গাঙ্গুহী (রঃ)এঁর যদি অনুমতি থাকে তাহলে আমি পড়ার সময় তাঁর পাশে বসবো।'

মাওলানা ইয়াহিয়া এ কথা গাঙ্গুহী (রঃ) কে জানালেন।

তিনি বললেন, 'এতে কোনো অসুবিধা নেই। আমার নির্জনতা আর মানসিক প্রশান্তি ইলিয়াসের উপস্থিতিতে নষ্ট হবে না।'

জিকির করার সময় মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) হৃদয়ে এক ধরনের ভোঁতা ব্যাথা বা ভারি বোঝার মতো অনুভব করতেন। মাওলানা গাঙ্গুহী (রঃ)কে একথা

www.eelm.weebly.com

জানালেন। তিনি চমকে উঠলেন। তাঁর বুকের ভেতর হৃদপিন্ড ধ্বক করে উঠলো। তিনি অপলকে ইলিয়াস (রঃ)কে দেখলেন। তারপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। বললেন, 'কাশেম নানতুবী একই অনুভবের কথা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রঃ)এঁর কাছে বলেছিলেন। তিনি একথার পর কাশেমকে নজরে রাখলেন। পরে বললেন, "আল্লাহতায়ালা তোমাকে দিয়ে বিশেষ কাজ নেবেন"।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া (রঃ)এঁর দ্বীন শেখানোর নিয়ম নীতি ছিল সবার মতো নয়। একটু আলাদা পদ্ধতির। সেটা ছিল সৃজনশীল আর মৌলিক। তিনি শুরুতেই পাঠ্য বই পড়াতেন না। আগে পড়াশোনার ওপর আগ্রহ গড়ে তুলতেন। মানসিকভাবে। পাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়ে ছাত্রকে ভয় পাইয়ে দিতেন না। সে যাতে হিমশিম না খেয়ে যায় এজন্যে খুব সহজ করে খাতায় লিখে দিতেন। আগাগোড়া সাহিত্যের ওপর তাঁর ছিল ভালো দখল। তাই ছাত্রদেরও সাহিত্যের ওপর শখ তৈরি করে দিতেন। তিনি পড়ার শুরুটা করতেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ)এঁর "সাহাল হাদিস" আর আমপারা দিয়ে।

তিনি ছাত্রদের দুই বা তিন অক্ষরের মিলিত শব্দ জুড়তে দিতেন। শব্দগুলো বসানোর কৌশল শেখাতেন। তিনি বলতেন, 'মুসলমানের ছেলেরা মনে প্রাণে মুখস্থ করবে এতো স্বাভাবিক। কিন্তু বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শব্দের অর্থ জানা। তাতে ভাবের গভীরে যাওয়ার সুবিধে হয়।' তিনি আরো বলতেন, 'কোরআন ও হাদিসের শব্দগুলো মৌলিক, আলোয় ভরা। তাতে রয়েছে বরকত।'

মাওলানা (রঃ)এঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মানসিক গুণাবলীতে সাজানো। একটা বই পুরোপুরি পড়ানো হলো কিনা সেদিকে তিনি খেয়াল রাখার দরকার মনে করতেন না। ছাত্রদের কাছে মূল বই ধরিয়ে দিতেন। নোট বা সাহায্যকারী বইয়ের দরকার মনে করতেন না। কোনো সাহায্য ছাড়াই ছাত্ররা তা পড়তো। কয়েক পাতা বার বার পড়ার পর এর মূল মমার্থ, বুঝতে পারতো। ছাত্র অসচেতনভাবেই পারদর্শী হয়ে উঠতো। এবার তারা অন্যকেও বোঝাতে পারছে। তার মানে পড়াশোনার মূল উদ্দেশ্য তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসছে। বোঝার, অনুধাবন ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলাই এমন পদ্ধতির লেখা পড়ার উদ্দেশ্য। এবার তিনি ছাত্রকে নিয়ে বসতেন। সময় নিয়ে বোঝাতেন। পড়াশোনায় ছাত্র নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা অর্জন করতো। তিনি তাদের আরো আত্মবিশ্বাসী আর উদ্যমী হয়ে উঠতে বলতেন। তাতে ছাত্ররা শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারতো। পারদর্শি আর আগ্রহী হয়ে উঠতো।

www.eelm.weebly.com

অসুখ

ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অসুস্থ। কখনোই তাঁর স্বাস্থ সম্পূর্ণ ভালো থাকেনি। গাঙ্গুহীতে থাকার সময় একবার ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেটা ছিল এক ধরনের রহস্যময় মাথা ব্যথা। মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে সিজদা দেয়াই কঠিন হয়ে পড়লো। মাথা এদিক ওদিক করতে পারছে না। এমনি করে টানা কয়েকমাস চললো।

মাওলানা গাঙ্গুহী (রঃ)এঁর ছেলে মাসুদ আহমাদ। তিনি তাঁর চিকিৎসক। তিনি রোগের খুব অদ্ভুত ব্যবস্থা নিতেন। কোন ধরনের রোগের জন্যে তিনি পানি খাওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিতেন। সেটা রোগীদের জন্যে ছিল অসহনীয়। কিন্তু মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)-এর ছিলেন ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি তাঁর চিকিৎসকের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন।

টানা সাত বছর তিনি পানি পান করলেন না।

এক ফোঁটাও।

এটা ছিল আল্লাহপ্রদত্ত তাঁর প্রবল ইচ্ছা শক্তি আর অটুট মনোবলের জ্বলন্ত পরিচয়। সুস্থ হলেন। তারপরও পাঁচ বছর তিনি পানি পান করেছেন খুব রেখে ঢেকে।

সারাজীবনই তিনি তাঁর লক্ষে এমনি অবিচল ছিলেন। অসুখের জন্যে তাঁর শিক্ষা জীবনে ছেদ পড়লো। আবার লেখা পড়ায় ফিরে আসার আশা ছিল না। কিন্তু প্রচণ্ড আগ্রহ তাঁকে ব্যতিব্যস্ত অস্থির করে তুললো। শুভানুধ্যায়ীরা অনুমতি দিলেন না। একদিন মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া বললেন, 'পড়া লেখা করে আর কি হবে?'

'তাহলে বেঁচে থাকা ও অর্থহীন', মাওলানা (রঃ) বললেন।

তাঁর মরণপণ ইচ্ছা দেখে সবাই রাজী হলো।

তিনি আবার পড়ালেখায় মন দিলেন।

অস্তাচলে স্পর্শমণি

হিজরি তেরশো বত্রিশ

ইসলামের আকাশে মেঘের ঘনঘটা। অশুভ সংকেতের বজ্রধ্বনি।

এ যুগের উজ্জ্বল তারা, মহান পুরুষ হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রঃ) মৃত্যু শয্যায়। পাশে বসে কুড়ি বছরের যুবক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রঃ) সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করে চলেছেন। একসময় তাঁর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। কেমন যেন শূন্যতা অনুভব করলেন মনের গহন কোণে। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে সবকিছু তাঁর কাছে। কোরান পড়া বন্ধ কর চট করে তাকালেন শায়খের

www.eelm.weebly.com

চেহারার দিকে। চমকে উঠলেন। বুঝলেন তিনি চলে গেছেন ওপারে। দুনিয়া দুলে উঠলো যেন তার চোখের পাশে। অনেকক্ষণ পর তাঁর দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো নিরব অশ্রুধারা।

মাওলানা গাঙ্গুহী (রঃ)এঁর মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হন। তিনি বলতেন, 'দুটো আঘাত আমাকে নিথর করে দিয়েছে। একটা হলো আমার বাবার মৃত্যু আর অন্যটা হলো আমার শায়খের বিচ্ছেদ।'

লেখাপড়া

তেরশো ছাব্বিশ হিজরি।

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রঃ) তখন হাদিসের দরস দিচ্ছেন। স্থান দিল্লীর দেওবন্দ মাদ্রাসা। সেখানে মাওলানা (রঃ) অংশ নিলেন।

তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। দ্বিতীয় দফায় তিনি হাদিসের দাওয়া করবেন আপন বড় ভাই হযরত মাওলানা ইয়াহিয়া (রঃ)এঁর কাছে। সময় মাত্র চারমাস লাগালো। মাওলানা জাকারিয়া (রঃ) এ ব্যাপারে একটা মজার ঘটনা শুনিয়েছেন।

সীমান্ত প্রদেশের একজন আলেম ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মৌলভী শের মুহাম্মাদ। তিনি মা'কুলাত বা বুদ্ধিবৃত্তিক শাস্ত্রের ওপর পড়াশোনা করেছিলেন মাওলানা মাজিদ আলীর কাছে। অনেকদিন ধরে। এবার দেশে ফিরে গেলেন। তাঁর বিয়ে ঠিক হলো। বিয়ের দিনে আচমকা এক ছাত্র তাঁর কাছে ইবনে মাজা শরীফ শিখবেন সেজন্যে আরজ করলেন। মৌলভী শের মুহাম্মাদ বেশ লজ্জা পেলেন। তিনি বললেন, 'ভাই, মা'কুলাত একটি চমকপ্রদ বিদ্যা। এটা শিখতে আমার লেখাপড়ার জীবন শেষ করেছি। হাদিস পড়া একেবারেই হয়নি।' তারপর খানিকক্ষণ কী চিন্তা করে বললেন, 'একজন খুব অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন আর কৌশলী শিক্ষককে আমি চিনি। মনে হচ্ছে খুব অল্প সময়েই আমার হাদিসের দাওরা হয়ে যাবে। সেখানে থেকে ফেরি তোমাকে আল্লাহ চাহেন তো ইবনে মাজা 'পড়বো।'

আর আশ্চর্য। মাওলানা শের মুহাম্মাদ নতুন বউকে চারমাসের মাঝে ফিরে আসার ওয়াদা করে বাড়ি বেরিয়ে পড়লেন।

তিনি এলেন গাঙ্গোগে।

দেখা করলেন হযরত মাওলানা ইয়াহিয়া (রঃ)এঁর সাথে। শুরু হলো পড়া। এসময় তাঁর পড়ার সাথী হলেন হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)।

রাতভর চলতো হাদিসের দরস।

দিনের বেলায় সবাই খানিকটা ঘুমুতেন। কিন্তু সীমন্ত মৌলভী ছিলেন আলাদা। তিনি দিনেও চর্চা করতেন।

www.eelm.weebly.com

নিমগ্ন সাধক

১৯০৮ সালে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) দেওবন্দে যান। মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রঃ)এঁর কাছে তিরমিজি ও সহি বোখারী পড়ার জন্যে। তাঁর মুরুব্বী মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রঃ) আর দুনিয়াতে না থাকায় মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রঃ) তাঁকে আধ্যাত্মিক পথ নির্দেশনার আর শিক্ষার জন্যে খলিল আহমাদ সাহারানপুরী (রঃ)এঁর কাছে পাঠালেন। তাঁর দেখা শোনায় তিনি সুলুকের নানা স্তর সম্পূর্ণ করেন।

মাওলানা গাঙ্গুহী (রঃ)এঁর মৃত্যুর পর মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) নিরব হয়ে যান। বেশির ভাগ সময় ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। মাওলানা জাকারিয়া (রঃ) বলেন, 'ওই সময় আমরা তাঁর কাছে ফার্সির প্রথম পাঠ পড়েছি। তখন তাঁর নিয়মিত একটা অভ্যেস ছিল। রোজ শাহ আবদুল কুদ্দুস (রঃ)এঁর সমাধির পেছনে মোটা পাটি বিছাতেন। বসতেন। এক পা অন্য পায়ের ওপর রেখে। তারপর পুরোপুরি চুপ হয়ে যেতেন। আমরা পড়া বলার জন্যে তাঁর কাছে আসতাম। বই খুলে তাঁর সামনে রাখতাম। আমাদের উঁচু স্বরে পড়তে হতো। ফার্সি কবিতা অনুবাদ করে শোনাতে হতো। ভুল হলেই তিনি ধরে ফেলতেন। আঙুলের ইশারায় বই বন্ধ করে দিতেন। তার মানে, যাও ফের পড়ে এসো। ভালো করে।

তিনি নফল ইবাদাত খুব বেশি করতেন। আর তন্ময় হয়ে করতেন। এ সময়টুকু সেজন্যেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত তিনি নফল ইবাদাতে ডুবে থাকতেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। অথচ বন্দেগীর রঙ আর ঢঙ ছিল প্রাজ্ঞ প্রৌঢ়ের মতো।

সুতীব্র আবেগ

তাঁর সত্ত্বা জুড়ে ছিল সুতীব্র আবেগ। আর প্রচন্ড উদ্যম। যেটা সব সফলতার চাবিকাঠি। শুধু ঋজু সংকল্প, ঐকান্তিক ইচ্ছা আর নিরন্তর প্রচেষ্টা তাকে সফলতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। যদিও তিনি স্বাস্থ্যহীন ছিলেন।

শেষ অসুখের সময় তাঁকে দেখতে এলেন হযরত মুফতী আজিজুর রহমান নাকশবন্দী দেওবন্দী'র বিশিষ্ট খলিফা ক্বারী ইসহাক সাহেব দেহলভী (রঃ)। তিনি বললেন, 'শরীর আমারও খুব খারাপ। চলাফেরা করা ঝুঁকিপূর্ণ। তবুও ভালবাসার আবেগে চলে এসেছি।'

'ঠিকই বলেছেন, ভালবাসা আর মনের গভীরের মমতাই প্রচণ্ড ক্ষমতা আর শক্তি রাখে। দুঃসাধ্য সাধন করে সে। একবার আমি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লাম। খুবই দুর্বল শরীর। দোতলা থেকে নামতে পারছি না। হঠাৎ শুনলাম মাওলানা সাহারানপুরী

www.eelm.weebly.com

(রঃ) দিল্লী এসেছেন। শুনে এতো আবেগ তাড়িত হলাম যে তখনি দিল্লী রওনা হলাম। পায়ে হেঁটে। প্রায় আচ্ছন্নের মতো। যাত্রাপথে একবারও শারিরীক দুর্বলতা টের পাইনি।

ভালাবাসার এমন শক্তি।'

আত্মনিবেদন, আবেগ, আর আল্লাহওয়ালাদের প্রতি প্রচণ্ড মায়া তাঁকে সারা জীবন অসাধ্য সাধন করিয়েছে। এটা ছিল সহজাত। এই গুণই তাঁকে পরে অলৌকিক সাফল্যের দুয়ারে পৌছে দিয়েছিল। তিনি মহাকালের সূচনা করেছিলেন।

যোগাযোগ

এ সময় তিনি হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী (রঃ)এঁর খলিফা ও অন্যান্য বুজুর্গদের সাথে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। বিশেষ করে মাওলানা আবদুর রহিম রায়পুরী (রঃ), শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা আবদুর রহিম রায়পুরী (রঃ), শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রঃ), হযরত মাওলানা আলী থানভী (রঃ) সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'এই সব বুজুর্গরা আমরা রক্তে, মজ্জায় মিলে মিশে গেছে। আমার আত্মার সাথে জড়িয়ে আছেন তাঁরা।'

আর ওনারা বলতেন, 'মাওলানা ইলিয়াস এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব।'

জিহাদের উদ্দীপনা

জিকির, শোগল, নফল ইবাদাতের সাথে সাথে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) এঁর অন্তরে জিহাদের বীজ লুকিয়ে ছিল। সারাজীবন তিনি এর থেকে আলাদা ছিলেন না। সেজন্যেই মাওলানা মাহমুদুল হাসানের কাছে জিহাদের বাইয়াত হয়েছিলেন।

বড়দের দৃষ্টিতে

জীবনের শুরুতেই তিনি তাঁর পরিবারের বড়দের কাছে সবদিক দিয়ে সম্মানিত ছিলেন। সে সময়ের আধ্যাত্মিক দুনিয়ার বড় বড় বুজুর্গদের কাছেও তিনি অকৃত্রিম সম্মান পেয়েছেন। মাওলানা ইয়াহিয়া ছিল তার পিতার মতো। তবু ছোট ভাইকে তিনি এমনভাবে দেখতেন যেমন ওসমান রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর সাথে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক ছিল। দৈহিক অসুস্থতা তাঁকে কায়িক শ্রম করতে দিত না। তিনি নিজেকে পড়ালেখা, জিকির আর অন্য সব ইবাদাতে পুরোপুরি

www.eelm.weebly.com

মশগুল রাখতেন। অন্যদিকে মাওলানা ইয়াহিয়া ছিলেন মেহনতী মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে রুজি রোজগার করতেন।

তাঁর একটা বইয়ের দোকান ছিল। সেটা তিনি ঠিকঠাক চালাতেন। এটা শুধু তাঁরই রোজগারের উপায় ছিল না, এর থেকেই তাঁর ভাই মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)ও চলতেন। একদিন দোকানের ম্যানেজার অভিযোগ করলেন, 'মাওলানা ইলিয়াসের তো ব্যবসা নিয়ে কোনো আগ্রহই দেখি না। এমন অলস মনোভাব তার ভবিষ্যত নষ্ট করবে। যদিও তিনি বসে বসেই লাভ পাচ্ছেন।'

এ কথা শুনে মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া খুব রেগে গেলেন। বললেন, 'হাদিসে পাকে এসেছে, তোমাদের ওপর আল্লাহর সাহায্য ও রুজি এসে থাকে দুর্বলদের কারণেই।' তারপর বললেন, 'আমার বিশ্বাস এই অসুস্থ ভাইটির জন্যেই আমার রুজি পাচ্ছি। সাবধান, এ ব্যাপারে তাকে কোনো কথা বলবে না। যা বলার তা আমাকেই বলবে।'

কোনো এক সময় মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ)কে দিব্যজ্ঞানী বিখ্যাত ধর্মীয় বুজুর্গরা আর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন নেতারা তাদের সে সময়ের ধর্মীয় কর্মকান্ডের নেতৃত্ব দিতে বলেছিলেন।

একবার সৌভাগ্যক্রমে একই সাথে কান্দালায় অবস্থান করছিলেন শাহ আবদুর রহিম রায়পুরী, মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী (রঃ) আর মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)। নামাজের সময় হলো। মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)কে বলা হলো ইমামতি করতে। পরিবারের বয়স্ক বুজুর্গ মৌলভী বদরুল হাসান ঠাট্টা করে বললেন, 'বগি এতো বড় ও ভারী আর ইঞ্জিন এতো ছোট!'

'গাড়ি চালানোর জন্যে এঞ্জিনের আকার নয় শক্তি আর গতির দরকার,' তাঁদের মাঝ থেকে একজন উত্তর দিলেন।

কর্মজীবন

শাওয়াল মাস।

হিজরি তেরোশো আটাশ।

এবার মাজাহিরুল উলুম মাদ্রাসার বেশ ক'জন শিক্ষকসহ অনেক লোক সাহারানপুর থেকে হজ্জে গেলেন। তাতে মাদ্রাসার জন্যে দরকার পড়লো নতুন শিক্ষক নেয়া। নিয়োগপ্রাপ্ত আরো ক'জনের মাঝে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ)ও ছিলেন। তাঁকে মাধ্যমিক স্তরের কিতাব পড়তে দেয়া হলো। হজ্জ শেসে পুরোন ওস্তাদরা ফিরে এলেন। তবুও মাওলানার চাকরি ঠিক থাকলো।

www.eelm.weebly.com

তাঁকে এমন কিছু বই পড়াতে হয়েছিলো যা তিনি নিজে আগে পড়েননি। কারণ মাওলানা ইয়াহিয়া ওই নিয়মেই পড়িয়েছিলেন। আগাগোড়া সবকিছু পড়াননি। তাছাড়া তিনি সে সময় অসুস্থ ছিলেন। এজন্যে মাধ্যমিক মানের আরো কিছু বই তাঁর পড়া হয়নি। এই শূন্যতা পূরণের জন্যে তিনি এ সময় অনেক সাধনা করেন। ক্লাসে যাবার আগেই তাঁর বক্তব্যগুলো তৈরি করে রাখতেন। যেমন 'কানযুল দ্বাকাঈক' বইটি পড়ানোর জন্যে সাহায্যকারী 'বাহরুর রাঈক', 'শামী' আর 'হেদায়া' নামের বইগুলো পড়ে নেন।

'নুরুল আনোয়ার' বইটি পড়ানোর জন্যে হিশামীর সহায়িকা আর উক্তিগুলো পর্যালোচনা ও আলোচনা করে নিতেন।

তখন মাওলানা (রঃ)এঁর জীবনের শেষ কটা বছর। এসময় এলেন বাস্তি জিলার কন্ধই এলাকার মাওলানা হিদায়াত আলী। তিনি হিদায়াতুল মুসলিমীন মাদ্রাসার মুহতামিম। দিল্লী এসেছেন হযরতজী (রঃ)এঁর খেদমতে। আমি (সৈয়দ হাসান আলী নাদভী) ও সেখানে রয়েছি। কথা বলতে বলতে এক সময় হিদায়াত আলী সাহেব বললেন, 'হযরত, মনে পড়ে আমি আপনার কাছে সাহারানপুর মাদ্রাসায় পড়েছি। আপনি আমাদের দরসে কুতবী পড়াতেন।'

হযরতজী হাসলেন।

মাওলানা হিদায়াত আলী অকপটে বললেন, 'তখন তো হযরত আপনি এতো গভীর তত্ত্ব আর এমন উঁচু ধরনের আলোচনা করেননি।'

হযরতজী ফের মুচকি হাসলেন।

পরে আমাকে এক সময় বললেন, 'ও বলছে আমি ওদের 'কুতবী' পড়িয়েছি। আসলে আমি নিজে কিন্তু 'কুতবী' পড়িনি। তবে মাদ্রাসায় পড়িয়েছি।'

বিয়ে

শুক্রবার।

ছয় জিলক্বদ, তেরশো তিরি হিজরি।

সতেরো অক্টোবর, উনিশ শো বারো সাল।

সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। বিয়ে হচ্ছে সূর্যপুরুষ হযরতজী মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ)এঁর। পাত্রী, তাঁরই আপন মামাতো বোন। মৌলভী রউফুল হাসান এঁর কন্যা। বিয়ে পড়াচ্ছেন তাঁর বড় ভাই মাওলানা মোহাম্মাদ। এই পবিত্র মজলিশে হাজির হয়েছেন তিন জগত বরেণ্য মহাপুরুষ। হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহিম রায়পুরি (রঃ), হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী (রঃ) ও হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)।

www.eelm.weebly.com

অপূর্ব মহামিলন।

মহাকালের সূচনা লগ্নে যেন আলোর সন্তানকে মানুষের প্রকাশ্য দুশমন মহাশক্তিধর শয়তানের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো ঘিরে রাখলেন তিনজন অলৌকিক আলোকিত পুরুষ।

নিরবে নিঃশব্দে শেষ হলো যুগান্তকারী আয়োজন।

এ অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)এঁর লেখা সুবিখ্যাত 'ফাওয়াদি উস সুবহাত' ধর্মীয় উপদেশমূলক রচনা পড়া হয়েছিল। এই অমর সাহিত্য সৃষ্টি অনেক বার ধারাবাহিকভাবে সে সময় ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হতে থাকে।

হজ্জ

তিন বছর পর

হিজরি তেরোশো তেত্রিশ।

এ বছর হজ্জে যাচ্ছেন দুই যুগশ্রেষ্ঠ পুরুষ। একজন হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহরানপুরী (রঃ), অন্যজন হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রঃ)। মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)এঁর জীবনে এ দু'জন সাধকের ভূমিকা ছিল অনন্য। তিনি দু'জনেরই আশিক ছিলেন। এরা দু'জন হিন্দুস্থানে নেই। তিনি যেন অন্ধকার দেখছেন। দু'চোখ। দুই বুর্জুর্গ চলেছেন মক্কা মদিনার পথে। তাঁর জন্যে ভারতে থাকা খুব কষ্টকর আর বেদনাময় হয়ে উঠলো। তাঁদের সাথে যদি যেতে পারতেন? ভাবতে গিয়ে টাকা পয়সার অসংগতির কথা মনে হলো। হতাশায় ছেয়ে গেল মন। তিনি সাহারানপুরে আর থাকতে পারলেন না। চলে এলেন কান্দালায়।

তাঁর বিষণ্ন চেহারা দেখে মনের ব্যাকুলতা টের পেলেন আপন বোন, মাওলানা ইকরামুল হাসানের আম্মা। তিনি বললেন, আমার 'গয়নাগুলো নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাও। কিন্তু মায়ের অনুমতির দরকার। তিনি সব শুনে, ছেলের অস্থিরতার কথা জেনে অনুমতি দিলেন। অসুস্থ ছেলে, দূরের যাত্রা আর অনেকদিনের বিচ্ছেদ তিনি মেনে নিলেন। এবার মেজো ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহিয়ার অনুমতি। তিনি সব শুনে রাজী হয়ে গেলেন।

এবার তিনি তাঁর শিক্ষক হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী (রঃ)এঁর কাছে চিঠি লিখলেন। সব অবস্থা জানালেন। অনুমতি চাইলেন।

তিনি লিখলেন, 'যাবার খরচের তিনটে পথ। (এক) বোনের গয়না নেয়া, (দুই) ধার নেয়া (তিন) কিছু আপনজনের দান।'

সাহারানপুরী (রঃ) শেষেরটি পছন্দ করলেন।

www.eelm.weebly.com

খাবার গোছগাছ করতে সময় নিল। ওদিকে প্রথম জাহাজ তাঁর শায়খ হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সারাহানপুরী (রঃ)কে নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

দ্বিতীয় জাহাজে রয়েছেন হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রঃ)। মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) তাঁর সাথী হলেন। হিজরি তেরোশো তেত্রিশ, শাওয়াল মাস। জাহাজ হজ্জের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

ছায়াসাথীর বিদায়

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া (রঃ) ছিলেন হযরতজী (রঃ)এঁর আপন বড় ভাই। তিনি একদিকে ছিলেন তাঁর বন্ধু আর অন্যদিকে পিতার মতো। দু'ধরনের আশ্রয় তিনি তাঁকে দিয়েছিলেন। বন্ধুত্ব আর পিতৃত্ব। আমৃত্যু ছায়ার মতো তাঁকে দু'হাত দিয়ে আগলে ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরতজী (রঃ)এঁর ছায়াসঙ্গী। একসাথে তিনি ছিলেন তাঁর গুরুজন, শিক্ষক আর ভাই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ জগতের বুকে কতো বিচিত্র ধরনের মানুষ পাঠান। মাওলানার মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া এক আশ্চর্য সৃষ্টি। এমন প্রাণখোলা, হাসি খুশি স্বভাবের মানুষ লাখে একজন পাওয়া যায় না। তিনি রাতের আঁধারের সেই বিষণ্ন বিরহ কাতর মানুষটি যিনি বিশ্ব মানবতার মুক্তি আর হিদায়তের জন্যে নিরবে কেঁদে চলেছেন। কখনো ফুঁপিয়ে, কখনো অঝোরে। কখনো নিঃশব্দে, কখনো বিলাপের সুরে। আবার সেই একই মানুষ দিনের বেলায় একেবারে প্রাণবন্ত, সজীব আর সতেজ। সবার মন মিষ্টি কথা আর মধুর হাসিতে ভরিয়ে দিচ্ছেন। একদিকে মৃত্যু, পরকাল ও মানব জাতির চিন্তায় অশ্রুতে ভেজা চোখ আর অন্যদিকে নিষ্কলুর হাসি তামাশায় সবাইকে মাতিয়ে তুলেছেন। তাঁর হৃদয়ের জ্বালা পোড়া, নিরব রাত্রির আর্ত বিলাপের খবর খুব কম লোকই জানাতেন।

তাঁর বেশবাস ছিলো খুব সাধারণ। চলাফেরায় বিনয়ের ছাপ। মাথা নিচু করে চলতেন। পথ রুজি রোজগারের জন্যে করতেন কঠোর পরিশ্রম। বইয়ের দোকান ছিল তাঁর। মাদ্রাসার পড়াতেন বিনা বেতনে। ব্যবসার সব কাজ নিজ হাতে করতেন। দেখা যেতো একদিকে ছাত্রদের পড়াচ্ছেন হয়তো কোনো কিতাব, অন্য হাতে তৈরি করছেন বইয়ের পার্সেল। তিনি ছিলেন স্বভাবজাত জ্ঞানী খুব উঁচু মার্গের ইলমের সাথে তাঁর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। আরবী সাহিত্য আর হাদিসের জ্ঞান ছিল তাঁর নখ দর্পণে।

মানবদরদী এমন মানুষটির সীমাহীন মমতা ঘিরে ছিল মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) কে আমৃত্যু।

তিনি হঠাৎ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।

www.eelm.weebly.com

জিলক্বদ মাস, তেরোশো চৌত্রিশ হিজরি তিনি ইন্তেকাল করেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ বিরহব্যথা বুকে বেজেছিল ইয়াহিয়া ছিলেন সবার প্রিয়জন। গোটা বন্ধুমহল এ বিচ্ছেদ বেদনায় ভেঙে পড়লো।

ভায়ের কথা বলতে গিয়ে এক বিমূর্ত আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন হযরতজী (রঃ)। পুরোন সেই দিনগুলোতে ডুবে যেতেন। ভুলে যেতেন চারপাশের বর্তমানকে। তারপর অতীত থেকে ফিরে এলে চোখে টলমলো অশ্রু নিয়ে শোনাতেন ভায়ের কথা। তাঁর অনেক ধরনের যোগ্যতার, বিপরীত চিন্তা চেতনার মানুষকে নিজের করার অসামান্য গুণ, সব ব্যাপারে পরিমিতি আর ভারসাম্য রক্ষা, অসাধারণ বোধ আর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার আলোচনা করতেন।

এক সময় থামতো আলোচনা। ভারী নিঃশ্বাসে ভরে যেত ঘর। গাঢ় নিবরতা নামতো চারপাশে। তারা প্রচণ্ড প্রভাবে সবাই বোবা হয়ে যেতেন যেন।

খানিকক্ষণের জন্যে।

অন্তবিহীন

বিরহে কাটে না যেন দিন

রাত।

শুক্রবার।

পঁচিশে রবিউস সানি,

হিজরি তেরোশো ছত্রিশ।

আরেকটা প্রচণ্ড আঘাতে মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) বিবশ, দিশেহারা আর বিমূঢ় হয়ে গেলেন। তাঁর আরেক প্রিয়জন বড় ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ সাহেব দুনিয়ায় থেকে চিরবিদায় নিলেন। তাঁর ভালবাসার জগতে প্রথম শূন্যতা এসেছিলো পিতা, পরে শিক্ষক হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী, আপন ভাই ইয়াহিয়া এঁদের বিয়োগে। সে শূন্যতা আরেকটু বড় হলো।

মাওলানা মুহাম্মাদ (রঃ) হচ্ছেন মাওলানা ঈসমাইল (রঃ)-এঁর প্রথমা স্ত্রীর একমাত্র ছেলে। তিনি ছিলেন ফিরিশতার মতো একটি মানুষ। বিনয়ী, পরম সহিষ্ণু মায়া মমতায় ভরা একটি মন। ঐশী প্রেমে আর ভীতিতে তিনি ছিলেন ভাস্বর।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'দয়ালু (রাহমানুর রাহিম)র বান্দা তারাই যারা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করে ছোট (ভদ্র ও নম্র) হয়ে।' এই কথার জীবন্ত উপমা ছিলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ (রঃ)। কথা বলতেন কম। ছিলেন না কারো সাতে পাঁচে। মেলামেশা ছিল কম। নির্জনতা প্রিয় ছিলেন। দুনিয়ার লোভ লালসা, সম্মান আর প্রচার

www.eelm.weebly.com

বিমুখ এই মানুষটি কিন্তু কর্তব্য কর্মে ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান। তিনি আল্লাহর ওপর নিখাদ ভরসা রাখতেন। তাকওয়া আর তাওয়াক্কুলের মূর্ত প্রতীক ছিল তাঁর জীবন।

মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসমাইল (রঃ)এঁর মৃত্যুর পর নিজামুদ্দিন বাংলাওয়ালী মসজিদের দায়িত্ব তাঁর ওপরই এসে পড়ে। এখানে একটা মাদ্রাসা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার। তাতে পড়াশোনা করতো মিওয়াতের শিশুরা। এই মাদ্রাসার আয়ের নির্দিষ্ট কোনো উৎস ছিল না। আল্লাহতালার ওপর ভরসা করা হয়েছিলো। তিনিই এর ব্যয় নির্বাহ করতেন। অলৌকিকভাবে।

মিওয়াত আর দিল্লী দু'জায়গাতেই তাঁর অনেক ভক্ত ও গুণগ্রাহী ছিল। তাঁর কথা, দিক নির্দেশনা ওই সব মানুষকে দেখিয়েছিলো সত্য, সহজ, সরল ও সঠিক পথের সন্ধান। তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ আর আধ্যাত্মিক আলোর ধারায় অনেক মানুষ বড় বড় পাপের পথ থেকে সরে এসেছিলো। পেয়েছিলো গন্তব্যের রাজপথ।

আত্মার আধ্যাত্মিক দ্যুতি ফুটে তাঁর চেহারায়। আলো ঝলমল নুরানী চেহারা দেখে অনেককে খোদাভীতি আর পরহেযগারীর শিক্ষা পেতো। তিনি মাঝে সাঝে ওয়াজ করতেন। কিন্তু সেটা ছিল আলোচনার ভঙ্গিতে। বক্তৃতার রঙ ঢঙ তাতে ছিল না। ইসলামের চরিত্র মাধুর্য, সংসারে উদাসীনা আর আল্লাহকে পাবার পথের সাধনা সম্পর্কে কোরান হাদিস থেকে অনুবাদ আর ব্যাখ্যা করে শোনাতেন।

তিনি একবার চোখের রোগে পড়লেন। চোখের নিচে হয়েছিলো ফোঁড়া। সেটা কাটতে হলো সাতবার। অস্ত্রোপচারের সময় পড়ে থাকতেন মর্মর মূর্তির মতো। ডাক্তাররা জ্ঞানহারা করতে চেয়েছিলেন ক্লোরোফর্ম দিয়ে। তিনি কঠিন ভাষায় মানা করে দিলেন। ফোঁড়া কাটা হলো। তিনি নিশ্চল। চিকিৎসকরা বিমূঢ় হতবাক। তাঁরা বললেন, 'আমাদের চিকিৎসা জীবনে এমন মানুষ দেখিনি।'

আল্লাহর ইবাদাত আর ধ্যানে কাটিয়েছেন তিনি জীবনের বেশি সময়। টানা ষোলো বছর তাঁর কোণে তাহাজ্জুদ কাজা হয়নি। মৃত্যুর দিন চলে এলো। তিনি এশার নামাজ জামাতে পড়লেন। সুন্নাত পড়ে বিতর ধরলেন। শেষ সিজদা। তখন তাঁর প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

তিনি ছিলেন এক দুর্লভ খোদাভক্ত মহান মানুষ। সারাক্ষণ আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। গোনাহ থেকে পবিত্র ছিলেন। মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী ছিলেন তাঁর হাদিসের শিক্ষক।

তিনি চলে গেলেন হাসতে হাসতে।

জগতের মানুষ আর আসমানের বাসিন্দারা কাঁদলো।

অঝোরে।

www.eelm.weebly.com

দু'ভাই আর দুই আধ্যাত্মিক আশ্রয় হারিয়ে মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করতে লাগলো হযরতজী (রঃ)এর দুনিয়া। তিনি আজ রিক্ত। অশ্রুসিক্ত।

এবার তাঁর কাঁধে দায়িত্ব চাপলো নিজামুদ্দিন বাংলাওয়ালী মসজিদের। সারা দুনিয়ার ভবিষ্যতের রুহানীয়াতের কেন্দ্রভূমি। তাঁকে এ দায়িত্ব দিলেন হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী (রঃ), শায়খুল হিন্দ, হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রঃ) ও শাহ আবদুর রহিম রায়পুরী (রঃ)।

হযরতজী (রঃ) বড় ভায়ের চিকিৎসার জন্যে আগে থেকেই দিল্লীতে এসেছিলেন। তিনি কাসাবপুরের নাওয়াবওয়ালী মসজিদে থাকতেন। এখানেই মাওলানা মুহাম্মাদ ইন্তিকাল করেন। জানাজা নিজামুদ্দিনে নিয়ে আসা হলো। মানুষের বন্যায় ভরে গেল নিজামুদ্দিন।

শেষকৃত্য হবার পর আত্মীয় স্বজন, শিষ্য, ভক্ত ও গুণগ্রাহীরা ঘিরে ধরলো হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) কে। তাঁরা বললেন, 'এবার বাংলাওয়ালী মসজিদের দায়িত্ব আপনি নিন। নইলে এখানাকার পরিবেশ ধরে রাখবে কে?'

তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে আমি পরামর্শ করবো ইনশাআল্লাহ।'

তারা বললেন, 'কার সাথে?'

তিনি বললেন, 'আমার বড়দের সাথে।'

তারা বললেন, 'আমার নিজেরা গিয়ে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আসবো।'

তিনি বললেন, 'ওভারে চাপের মুখে রেখে পরামর্শ হয় না।'

এবার তাঁরা মাদ্রাসা চালানোর জন্যে খরচাপাতির ব্যবস্থা করবে বললো। চাঁদা তুলে তার ব্যবস্থা হবে। হযরতজী (রঃ) এ ব্যাপারে নিজের যে কঠোর নীতি আর শতর্তা তাদের জানালেন।

পরে তিনি মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনার কাজ অল্প সময়ে সেরেই চলে এলেন সাহারানপুর। তাঁর শিক্ষক ও মুর্শিদ হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহনপুরী (রঃ)কে নিজামুদ্দিনের অবস্থার কথা জানালেন। এর মাঝে হযরতজী, তার পিতা ও ভাই এর ভক্ত, অনুরক্ত ও শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে অনুরোধ করে গেছেন অবিরাম। কারণ তারা চায় নিজামুদ্দিনে বাপ ও বেটার আত্মত্যাগের ফলে যে প্রশান্তিময় দ্বীনি পরিবেশের ঝর্ণাধারা বয়ে চলেছে তা যেন থেমে না যায়।

সাহারানপুরী (রঃ) গোটা ব্যাপারটা ক'দিন ভাবলেন। তারপর সিদ্ধান্ত দিলেন। বললেন, 'এটা পরীক্ষামূলক। বছর খানেকের জন্যে ছুটি নাও। ওখানে থাকো। যদি মন বসে যায় তাহলে ওখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যাবে।'

পরামর্শের পর সাহারানপুর মাদ্রাসার অধ্যক্ষের কাছে ছুটি চেয়ে একটা আবেদনপত্র লিখলেন হযরতজী (রঃ)।

www.eelm.weebly.com

সেটা ছিল হুবহু এমন–

"শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ সাহেব,

আসসলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

জনাব, খবর এই যে, আমার ভায়ের ইন্তিকাল হয়েছে। মাদ্রাসা নিজামুদ্দিনের দেখাশোনা ও ব্যবস্থাপনার স্থানটি এখন শূন্য। সেজন্যে ওখানে আমার কিছুদিন থাকা দরকার।

ওখানকার বাসিন্দা, অধমের অনুরাগী আর জ্ঞানপিয়াসু লোকেরা তাড়া দিচ্ছেন যেন আমি নিজে ওখানে থেকে এসব কাজগুলি করি।

আপনি জানেন, আমার বাবা ও ভাই দু'জনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ওখানের একগুঁয়ে, বোকা, মূর্খ আর আঁধার জগতের মানুষগুলোর মাঝে জ্ঞান ও শিক্ষার আলো ফুটেছে। তা নিভে যাক এটা আমার মন চায় না। ইচ্ছে জাগে ওখানে ক'টা দিন থেকে ওই একই মেহনত করে জাগরণটিকে জোরদার করি। দ্বীনি কাজে খানিকটা অংশ নিই।

তাই দয়া করে অধমকে বছর খানেকের জন্যে ছুটে মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

ওয়াসসালাম–

ইতি

বান্দা, মুহম্মাদ আখতার ইলিয়াস"

জীবন মৃত্যুর দোলাচলে

কুড়ি জুমাদিউল উলা।

তেরোশো ছত্রিশ হিজরি।

খুশি মনে তৈরি হচ্ছেন হযরতজী (রঃ) নিজামুদ্দিনে যাবার জন্যে। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো তিনি ভয়ানকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার দেখে বললেন, 'প্লুরিসি রোগ হয়েছে।'

সাথে সাথে তাঁকে কান্দালায় নিয়ে আসা হলো।

এখানে এসে অসুখ মারাত্মক আকার ধারণ করলো। কষ্টে ও যন্ত্রণায় এমন অবস্থা হলো যে বুঝি জীবন প্রদীপ নিভে যাবে।

এক বৃহস্পতিবার রাত।

রোগ ভয়াল আকার নিয়েছে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)এঁর দেহের সব শিরা বসে গেল। ঠাণ্ডা হয়ে গেল হাত পা। পরে পুরো শরীর। নাড়ির স্পন্দন থেমে গেল।

সবাই হাল ছেড়ে দিলেন।

অনেকে 'ইন্নালিল্লাহ' পড়ে ফেললেন। সব আশা মুখ থুবড়ে পড়লো।

www.eelm.weebly.com

রুদ্ধশ্বাস সময় চলছে।
জীবন আর মৃত্যুর দোলায় দুলছেন হযরতজী (রঃ)
তারপর হঠাৎই সবাইকে চমকে দিয়ে সুস্থতার চিহ্ন ফুটে উঠলো তাঁর দেহে।
ক'দিন পর একেবারেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। ফিরে পেলেন নতুন জীবন।
বিস্ময়কর।
দয়াময়ের ইচ্ছা
কারণ এখনো যে তাঁকে দিয়ে অনেক কাজ নেবেন।
মহান প্রভু।

আপন নীড়ে

নিজামুদ্দিন বাদাউনী (রঃ)।

তাঁর মহল্লা। মাজারের খানিকটা দূরেই ছোট একটি মসজিদ। প্রাচীন। মসজিদটির চারপাশে বিশাল ঘন বন। মাজারের পাথুরে দেয়াল কতো ইতিহাসের স্বাক্ষী। মূর্তি পূজারীর দেশ হিন্দুস্থানকে যাঁরা বেলায়েতের নূর দিয়ে আলোকিত করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম।

তিনি হযরত বাবা ফরিদউদ্দিন গাঞ্জেশকর (রঃ)এর ওই সব খলিফাদের মধ্যে ছিলেন যাঁরা নিজামিয়া সিলসিলা কায়েম করেছেন। তিনি গাউস, কুতুব, খোদাগত প্রাণ এসব ধাপক পেরিয়ে মাহবুবে ইলাহী'র স্তরে উঠেছিলেন তাঁর আসল নাম ছিল মুহাম্মাদ। বংশধারা গিয়ে ঠেকেছে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু পর্যন্ত।

বাদায়ুন যুক্ত প্রদেশের নাম করা স্থান। পতঙ্গীটোলা এই জিলার একটা গ্রাম। মাহবুবে ইলাহী এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা খাজা আলী (রঃ) আর নানা খাজায়ে আরব সাইয়িদ আবুল মাক্কা সপরিবারে বাদায়ুনে বসতি নেন। তাঁরা দু'জনেই বুজুর্গ আর আত্মীয় খাজায়ে আরবের কন্যা যুলাইখার সাথে খাজা আলীর ছেলে সাইয়িদ আহমদের বিয়ে হয়। খাজা আহমাদ একজন শ্রেষ্ঠ আলিম ও মুত্তাকী লোক ছিলেন। দিল্লীর সুলতান তাঁকে বাদায়ুনের কাজী করেছিলেন। বাদায়ুনে তাঁর মাজার আজও সবার জিয়ারতগাহ হয়ে রয়েছে।

হিজরি ছ'শো ছত্রিশ।
সফর মাসের সাতাশ তারিখ।
এক সোনার সকালে তিনি মুখ দেখলেন এই কর্কশ পৃথিবীর।
ঠিক তার সাতশো বছর পর।

আওলিয়ার মাজারের পাশেই ছোট মসজিদটিতে এলেন হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)। সবার অলক্ষ্যে খুশির হাসি ফুটলো মাজারের মানুষ নিজামুদ্দিন আওলিয়ার মুখে।

www.eelm.weebly.com

ছেলেবেলায় মাওলানার ইহতিশামুলক হাসান (রঃ) নিজামুদ্দিনে হযরতজী (রঃ)এঁর কাছে চলে এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'নিজামুদ্দিনের আশপাশ বিজন বনে ঘেরা। মাঝে সাঝে বাইরে চলে আসতাম। এ আশায় যে যদি কোন মানুষের দেখা পাই। পেতাম না। কখনো তেমন কারো সাথে দেখা হলে মনে হতো আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। মনটা খুশিতে ভরে উঠতো।

ছোট মসজিদটির পাশে একটা বাংলাঘর, একটা হুজরা, দরগাহের দক্ষিণ দিকে রয়েছে বস্তি। অল্প ক'জন মেওয়াতি আর অন্যান্য গরীব ছাত্র এই নিয়ে হচ্ছে নির্জন নিজামুদ্দিন।

মাদ্রাসাটির আয়ের নিয়মিত কোনো উৎস ছিল না। আল্লাহর ওপর ভরসাই ছিল মূল পুঁজি। ছাত্ররা যখন যা পেতো তাতেই খুশি হয়ে যেতো। আর ছিলো এর পরিচালকের অনমনীয় উদ্যম, অটল ঈমান আর সুদৃঢ় মনোবল। তাঁরই উদ্যোগে ধুঁকে ধুঁকে এগিয়ে চললো মাদ্রাসার উন্নতি। বেশ অভাব আর কষ্টের মাঝে দিন গড়িয়ে চললো। মাঝে সাঝে এসে যেতো অনাহারের পালা। অবশ্য এতে মাওলানা কখনো নিরাশ হতেন না। সে সময় তিনি ঘোষণা করে দিতেন, 'আজ কোনো খাবার নেই। এমন আরো হবে। যে না খেয়ে হাসিমুখে বিদ্যা শিখতে চায় ও থাকবে। অর অপছন্দ হলে অন্য কোথাও চলে যাও।'

কিন্তু কেউ চলে যেতো না।

তাদের জাহেরী বিদ্যার সাথে সাথে রুহানী শিক্ষা চলছিলো। তাতে তাদের আধ্যাত্মিক উত্তরণ ঘটছিলো।

ছাত্ররা কখনো চলে যেতো বনে। কুড়িয়ে আনতো বুনো ফল। তা খেয়েই দিন গুজরান করে দিতো। আবার জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে তাতে আগুন ধরিয়ে রুটি খেয়ে পড়াশোনায় মন দিতো ছাত্ররা।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) তাতে কোনো প্রভাবিত হতেন না। তাঁর ভ্রু বা কপাল কখনো কুঁচতে যেতো না। তিনি বরং সুসময়ের জন্যে ভয় পেতেন। কারণ তিনি জানতেন অভাব অনটনের পরীক্ষার পর আসে ধন, দৌলত, সম্পদ ও প্রাচুর্যের পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

নিজামুদ্দিন মাদ্রাসার পুরোন ছাত্র হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ এঁর সাথী হচ্ছেন হাজী আবদুর রহমান। তিনি ছিলেন তাঁর সারাক্ষণের সঙ্গী তাঁর জন্ম মিওয়াতের এক অমুসলিম খ্রিষ্টান পরিবারে। ছেলেবেলায় একবার তিনি একটা পবিত্র স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর সাথে দেখা হলো দোজাহানের বাদশাহ আকা-ই-নামদার তাজিদারে মাদিনা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজি আবদুর রহমানকে মুসলমান হতে বললেন। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তিনি বিমূঢ় হয়ে গেলেন। ভাবছেন, 'একী স্বপ্ন দেখলাম' তখন তাঁর সামনে একটা

www.eelm.weebly.com

জ্যোতির্ময় চেহারা ভেসে উঠলো। তিনি হচ্ছেন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ (রঃ)। তাড়াতাড়ি উঠে মুখে কোনো কিছু না দিয়েই ছুটে এলেন নিজামুদ্দিন। স্বপ্নের সব কথা খুলে বললেন। মুহাম্মাদ (রঃ) তাঁকে মুসলমান হতে বললেন। হাজী সাহেব বললেন, 'আমি সেই পুতঃপবিত্র জ্যোতির্ময় চেহারার মহামানবকে তাহলে কি ফের দেখতে পাবো?'

মুহাম্মাদ (রঃ) বললেন, 'যদি তুমি মুসলমান হও তাঁর সাথে বার বার দেখা হবে। তাঁর সাথে বেহেশতে চিরদিন থাকতে পারবে।'

হাজী আবদুর রহমান তখনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

তারপর থেকে মাদ্রাসা নিজামুদ্দিনেই তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ এঁর কাছে কুরআন ও দ্বীনি শিক্ষা পেয়েছেন। পরে হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ শাহরানপুরী (রঃ)এর কাছে মিষাত্ব গ্রহণ করেন। তিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ এঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন।

হযরতজী (রঃ) সব সময় তাঁর প্রশংসা করতেন। তাঁর দ্বীনি বিপ্লবের প্রাণপুরুষ মনে করতেন তাঁকে। মেধা, প্রজ্ঞা, গভীর মনন আর অফুরন্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঋদ্ধ পুরুষ ছিলেন। এই মানুষটি। এক বিরল প্রতিভাধর এই মানুটির মূল ঝোঁক ছিল বিধর্মীদের মাঝে তাবলীগ করা। এ ব্যাপারে তিনি খুবই যোগ্য ও পারদর্শী ছিলেন। প্রায় হাজার খানেক বিধর্মী মুসলমান হয়েছিলো তাঁর হাতে। তাদের জন্যে তিনি একটা মাদ্রাসা খুলেছিলেন জায়গাটির নাম জিৎগার। নতুন মুসলমান আর মাদ্রাসাটির সাথে তাঁর সম্পর্কে ছিল আপন ছেলের মতো। মেওয়াত এলাকার মুর্খ, অজ্ঞ আর পথহারা মানুষের মাঝে প্রচলিত ছিল বেশকিছু নিয়ম, অনুষ্ঠান আর অপচর্চা। সেগুলো ছিল পুরোপুরি শরীয়ত বিরোধী। এগুলোর উচ্ছেদ আর সংশোধনের জন্যে তাঁর ভূমিকা কিংবদন্তীর মতে হয়ে রয়েছে।

হিজরি চৌষট্টি, পবিত্র রবিউল সানি মাসে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

একবার হযরতজী (রঃ) নিজামুদ্দিনে নেই। বিশেষ কোনো কাজে বাইরে ছিলেন। বেশ কিছুদিনের জন্যে।

এ সময় হযরতজী (রঃ)এঁর সেই প্রাণের সাথী হাজি আবদুর রহমান আর কজনকে নিয়ে মাদ্রাসার জন্যে হুজরা তৈরি করে ফেললেন।

ফিরে এলেন হযরতজী (রঃ)।

তিনি এসব উদ্যোগ দেখে তেমন খুশি হলেন না। বরং খানিকটা রেগে গেলেন। অনেকদিন পর্যন্ত তিনি হাজি সাহেবের সাথে কথা বললেন না।

আসলে তাঁর বক্তব্য ছিল, 'কি হবে মাদ্রাসার বাইরের সৌন্দর্য আর চাকচিক্য দিয়ে। যদি ভেতরে প্রাণ না থাকে? মূল্য ব্যাপারটা হচ্ছে শিক্ষা, জ্ঞানার্জন, চারিত্রিক পরিবর্তন। মাদ্রাসার দালান পাকা হলো কিন্তু শিক্ষা আর দীক্ষা কাঁচা হয়ে গেল।'

www.eelm.weebly.com

একবার।

এক ব্যবসায়ী।

তিনি খুব বিপদগ্রস্থ। দু'বার এসে দোয়ার দরখাস্ত করলেন হযরতজী (রঃ)এঁর কাছে। সাথে হাদিয়া। বেশ কিছু টাকা। তিনি বললেন, 'দোয়া করবো কথা দিচ্ছি। কিন্তু এসবের কোনো দরকার নেই।'

ওদিকে হাজী আবদুর রহমান টাকাগুলো মদ্রাসা তৈরির কাজে লাগবে বলে নিয়ে নিলেন। শুনে হযরতজী (রঃ) অস্থির, অধীর হয়ে গেলেন। তাগিদ দিতে লাগলেন টাকা ফেরত দেয়ার জন্যে। শেষে টাকা ফেরত হলো। তিনি প্রশান্ত হলেন।

তিনি হাজী সাহেবকে বললেন, 'ভাই, দ্বীন পয়সা কড়ি দিয়ে হয় না। তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে সবচেয়ে বেশি সম্পদ আর বড় রাজত্ব দিতেন আল্লাহতায়লা।'

পরম প্রভুর ধ্যানে

এই দিনগুলোতে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রঃ) আল্লাহকে পাবার পথের নানা সাধনায় প্রচণ্ডভাবে নামলেন। অবিরাম আল্লাহতায়ার ধ্যানে নিমগ্ন থাকার সময় প্রবৃত্তির হাতজানি আসে। তার ওপর পা রেখে কষ্ট ও চেষ্টার মেহনত করে লক্ষ্যে পৌছানোর তপস্যায় একেবারে বিলীন হয়ে যেতে লাগালেন তিনি। এ সাধনাকে রিয়াজত ও মুজাহাদা বলে।

বিরামহীন বন্দেগী বা কঠোর উপসনায় লেগে থাকা ছিলো হযরতজী (রঃ)এঁর পূর্ব পুরুষদের স্বভাবজাত। এ সাধনা তাঁর রক্তধারায় মিলে মিশে আছে। এর বিস্ফোরণ ঘটলো নিজামুদ্দিনে এসে। এ সময় তিনি অজ্ঞাতবাস বা নির্জনতা খুঁজতেন।

হাজী আবদুর রহমান বলেন, 'সেজন্যে তিনি কখনো আরব সারার তোরণে, কখনো হুমায়ুনের মাজারের দক্ষিণে হযরত নিজুমদ্দিন আওলিয়া (রঃ)এঁর প্রাচীন ইবাদাতখানায়, কখনো আবদুর রহিম খাকে খানান এর মাকবরায়। আবার দেখা গেল হযরত মির্জা মাজহার জানে জানা (রঃ)এঁর পীর শেখ সাইয়িদ নুর মুহাম্মাদ বাদায়ুনীর মাজারে সময় কাটাচ্ছেন। গভীর ধ্যানে তন্ময়। পলের পর পল চলে যাচ্ছেন তিনি নিমগ্ন আশপাশের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।'

তাঁর দুপুরের খাবার ওখান পৌছে দেয়া হতো। রাতের খাবার বাড়িতে এসে খেতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করতেন। পড়া দেয়া নেয়া চলতো ওখানেই। ছাত্ররা চলে আসতো। মাঝে মধ্যে তিনি চাক্কারওয়ালী মসজিদে এসে যেতেন। ছাত্রদের পড়ানোর জন্যে। হাদিস দরস দেয়ার সময় চলে আসতো। তার আগে তিনি ভালভাবে ওজু করে নিতেন। দু'রাকাত নামাজ পড়তেন। গভীর ধ্যানে। দীর্ঘ সময় নিয়ে।

www.eelm.weebly.com

তিনি বলতেন, 'যে পবিত্র কাজে যাচ্ছি (হাদিস পড়ানো) তার হক এর চেয়ে অনেক বেশি। দু'রাকাত নামাজ হচ্ছে সবচেয়ে কম দাবী।'

হাদিস পড়ানোর সময় কেউ এলে তিনি তার দিকে মোটেও মনোযোগ দিতেন না। তখন তাঁর একমাত্র ধ্যান আর খেয়াল কেন্দ্রীভূত হতো হাদিসের দারসে। তাঁর চারপাশে ছিল খাদেম। কিন্তু খাবার এলো কি এলো না সেদিকে মোটেও নজর দিতেন না। খাবার খারাপ হলো না মন্দ হলো তাও তাঁর খেয়াল থাকতো না। এ ব্যাপারে কখনো কোনো মন্তব্য করতেও কেউ কোনোদিন শোনেন নি।

দিশারী

মাওলানা সৈয়দ রেজা হাসান সাহেব বলেন, ছাত্রদেরকে লেখাপড়া শেখানোর সময় অন্য মানুষে পরিণত হতেন হযরতজী (রঃ)। ছেলেদের লেখাপড়ার দিকে যত্ন নিতেন খুব সতর্কতার সাথে। এছাড়া ওদের সবধরনের সুযোগ সুবিধের দিকে খেয়াল রাখতেন। নিজেই পড়াতেন। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতেন। সাধারণ আর গুরুত্বপূর্ণ দু'ধরনের অধ্যায়ই খুব মন দিয়ে পড়াতেন। মাঝে মাঝে ছাত্রদের সংখ্যা আশিজন ছাড়িয়ে যেতো। খুব বড় সংখ্যা হয়ে গেলে কখনো ওপরের জামাতের ছাত্রদের দিয়ে পড়াতেন।'

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) ছিলেন সব কাজেই একনিষ্ঠ। লেখাপড়ার শেখানোর কাজেও তা দেখা দিল। কাজপ্রিয় মানুষটি তখন ছাত্র তৈরির কাজে পুরোপুরি ডুবে যেতেন। হাদিসের একটি জগদ্বিখ্যাত কিতাব 'মুসতাদরাকে হাকীম'। এ কিতাবটির দরস শেষ করতেন ফজরের নামাজের আগেই। দ্বীনি প্রতিটি কাজে তাঁর আগ্রহ কতো সীমাহীন ছিল এতেই বোঝা যায়। হযরতজী (রঃ)এঁর লেখা-পড়া শেখানোর নিয়ম ছিলো একান্ত নিজস্ব। সেটা ছাত্রদের পড়া শেখার কাজে খুবই কার্যকর ছিল। তারা তাড়াতাড়ি শুদ্ধভাবে পড়া শিখতো। ভাষার ওপর দখল পেতো গভীরভাবে আর নির্ভুল ব্যাকরণ জানা হয়ে যেতো। বই নির্বাচনের ব্যাপারে আলাদা মত আর ভাবনা ছিলো তাঁর। তিনি চাইতেন ছাত্ররা তাদের পাঠ এমনভাবে বুঝে নিক যেন শিক্ষকের মুখ খুলতে না হয়। সেজন্যেক দরসের আগে ছাত্রদের মুতাআলা বা সংশ্লিষ্ট বই আগেই দেখে নেয়া। তিনি মাদ্রাসার চলে আসা পাঠ্যসূচি বা নির্দিষ্ট বই পড়ার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখাতেন না। তিনি চাইতেন ছেলেরা এমনভাবে দীক্ষা নিক যেন নিজ থেকে ধর্মীয় গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়। দেখা যেতো তিনি তাদের এমন অনেক বই পড়তে দিয়েছেন যা মাদ্রাসায় পড়ানোর রেওয়াজ নেই। তাতে ছাত্ররা শিবার বিষয়বস্তু দ্রুত আত্মস্থ করে। বোঝানোর ক্ষমতা অর্জন করতো। এই লক্ষে তিনি নতুন সব পথ বের করতেন, যা পড়া শেখার জন্যে খুবই কার্যকর হতো।

www.eelm.weebly.com

মেওয়াত।

ভারতের উত্তর প্রদেশের একটা এলাকার নাম।

অনেকদিন আগে থেকে এখানে বাস করে আসছে মেও জাতি। পাঞ্জাব প্রদেশের আনবালা কমিশনারির গোরগানো, ইলোর ও ভরতপুরে আর যুক্ত প্রদেশের মথুরা জেলার খানিকটা মেওয়াতের মধ্যে ছিল।

মেজর পি. ডাব্লিউ পাওলেট, আলোয়ার এর সেটেলমেন্ট অফিসার, একজন ইংরেজ লেখক। তিনি মেওয়াতের সীমানা এভাবে ঠিক করেছেন, উত্তরে ভরতপুরের ডিগ থেকে 'রিয়াড়ি'- এর অক্ষরেখার খানিকটা ওপরে কিছুদূর পর্যন্ত চলে গেছে। ওদিকে পশ্চিমে রিওয়াড়ি'র নিচে দ্রাঘিমা রেখার ওই বিন্দু পর্যন্ত গেছে যা ইলোর থেকে ছ' মাইল দূরে আর 'রাবাচশমা' এর দক্ষিণে রয়েছে। একটা বাঁকা রেখার মাঝে এই হচ্ছে আদি মেওয়াত।'

ওই রেখা শেষে গোল হয়ে 'ডিগ' এলাকায় মিশেছে। তাতে রেখাটি প্রায় দক্ষিণ সীমানা তৈরি করেছে।

অবশ্য আজকের মেওয়াতের চেহারা আগের চেয়ে ঢের তফাৎ।

ইংরেজ ঐতিহাসিকরা লিখেছেন মেওরা আর্য নয়। এরা প্রাচীন ভারতের অনার্য। আর্য জাতির রক্তধারা বয়ে নেয়া রাজপুতদের চেয়ে এদের ইতিহাসে আরো পুরনো। মেওয়াতের 'খানজাদা' সম্প্রদায় অবশ্য রাজপুতনাদের মতো একই বংশের। ফরাসী ইতিহাস বই ঘাঁটলে দেখা যায় যেখানে মেওয়াতি শব্দ এসেছে সেখানেই 'খানজাদা' নামটি লেখা আছে। 'আইনি আকবরী' পড়ে আমরা জানতে পারি জাতাউ রাজপুতনারা পবিত্র ইসলামের ছায়াতলে এলে তারা পরিচিত পায় মেওয়াতি নামে।

ফিরোজ শাহী যুগ তখন শেষ হয়েছে সে সময় পয়লাবারের মতো মেওয়াতের নাম উচ্চারিত হয়। দিল্লীর মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে মেওরাতিরা খুবই, বিপদজনক হয়ে পড়ে। লম্বা আর ঘন বন যা দিল্লী পর্যন্ত চলে গিয়েছিলো সেখানে তারা প্রায়ই আক্রমণ চালাতো। চলতো লুঠপাট, ডাকাতি। সেজন্যে সাঁঝের পর থেকে রাজধানী ঢোকার দরোজা বন্ধ করে দেয়া হতো। এরপরেও তারা শহরে ঢুকে পড়তো। চালাতো লুঠতরাজ। গিয়াসুদ্দিন বলবন মেওয়াতিদের বিরুদ্ধের করলেন শক্তিশালি সেনাদল। আফগান সেনা দিয়ে নিরাপত্তা ঘাঁটি করা হলো দিল্লীতে। সাফ সুতরো করা হলো জঙ্গল। পতিত জমিতে চাষবাসের ব্যবস্থা হলো। তারপর থেকে মেওয়াত প্রায় একশো বছর পর্যন্ত হারিয়ে গেল বিস্মৃতির অতলে।

সুদীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে থাকার পর মেওয়াতি দুঃসাহসী দুর্বৃত্ত দল ফের আচমকা চঞ্চল হয়ে ওঠে। দিল্লীর জনমানুষের মাঝে ছড়ালো আতঙ্ক, অপমান আর ত্রাসের রাজত্ব। এই ভয়াবহ দস্যুদের দমনের জন্যে দিল্লী সম্রাট শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হলেন।

www.eelm.weebly.com

বাহাদুর নাহির আর তার কিছু বংশধরের নাম ইতিহাসের পাতায় এসেছে। এরা মেওয়াতে নিজেদের শাসন ও সরকার তৈরি করেছিল। ব্যাপারটা ছিলো অসীম সাহসিকতা আর অসাধারণ যোগ্যতা। শেষমেষ অবশ্য দিল্লী সরকার এক সেনা অভিযান চালায়। তারা তছনছ করে দেয় নাহিরের সুসংগঠিত দলটিকে। এরপর এটা একটা ছোট খাটো এলাকা নিয়ে জায়গীর হিসেবে টিকে থাকে।

আরেকজন বিখ্যাত দুঃসাহসী 'খানজাদা'র নাম আসে। তিনি হচ্ছেন লক্ষণ পাল। গোটা মেওয়াত আর আশপাশের এলাকা তিনি নিজের দখলের নিয়ে আসেন।

ফিরোজ শাহীর সময় তিনি মুসলমান হন।

'মেও' রা কবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলো? ঠিক কি ঘটেছিলো। কেন ওরা ঈমান আনলো? এ সম্পর্কে ইতিহাস কোনো সঠিক তথ্য দিতে পারেনি। রয়ে সয়ে কয়েক শো বছর ধরে এটা পুরো হয়েছিলো? নাকি কোন আচমকা অলৌকিক ঘটনায় ওরা সবাই একসাথে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল? গোটা ব্যাপারটা কালে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। এ সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক সূত্র আজ আর নেই। যা আছে তা হচ্ছে লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকা কিছু কথা।

মুসলিম ধর্মাবেত্তাদের প্রচারের কাজে অবহেলা আর উদাসীনতার কারণে মেওয়াতিদের ধর্ম কর্মের মান নেমে শূন্যে চলে আসে। নৈতিক চরিত্রে নেমে আসে চরম অবক্ষয়। তাদের জীবন যাপনের ধারা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসের পুরো উল্টো। মনে হতো তারা নিজ ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে। অমুসলিম ঐতিহাসিকরা লিখেছেন তারা প্রায় ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। আঠারো শো আটাত্তর সালে আলোয়ার গেজেটিয়ারে ছাপা মেজর পাওলেটের লেখা পড়লে বিষয়টা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

" মেওরা এখন সবাই মুসলমান। কিন্তু তা শুধু নামে হিন্দু জমিদাররা দেবতাদের পূজা করে। সেসব দেবতারা মুসলমানদেরও পূজা। হোলির আনন্দ এখানকার হিন্দু মুসলমান সবার সমান। আরো কিছু জনপ্রিয় পূজাপর্ব রয়েছে। যেমন জন্ম অষ্টমী, দশহরা, দেওয়ালি। এসবে মুসলমানরা সমানভাবে অংশ নেয়। তারা এটাকে মুহাররাম, ঈদ আর শবেবরাতের মতোই নিজেদের উৎসব মনে করতো। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করার সময় ডাকা হতো ব্রাহ্মণদের। তাদের দিয়ে সম্পন্ন হতো এ অনুষ্ঠান। মেওয়াতিদের মাঝে হিন্দু নাম রাখার চল ছিলো। অবশ্য 'রাম' নামটা তারা রাখতো না। অনেক সময় সিং পদবী তাদের নামের শেষে চলে আসতো। তবে তা 'খান' এর মতো জনপ্রিয় ছিল না। অহি আর গুজরাটিদের মতো তারা অমাবস্যার সময় ছুটি পালন করতো। কৃষ্ণপক্ষের সময় তারা কাজ কাম বন্ধ রাখতো। নতুন কূয়া খোঁড়ার সময় চত্বর তৈরি করতো হনুমানের নামে। তা ভেঙে গেলে মঠ, মন্দির আর উপাসনালয়ের ওপর হারিয়ে ফেলতো বিশ্বাস। আর ডাকাতি করার সময় ভুলে যেতো মন্দিরের ওপর ভক্তি শ্রদ্ধা। এ নিয়ে তাদের কিছু বললে তারা বলতো, ' তোমরা হলে দেও' আর আমরা হলাম 'মেও'।'

www.eelm.weebly.com

মেওরা ঈমান ও ইসলামের ব্যাপারে অবুঝ ছিলো। খুব কম লোকই তাদের মাঝে কালিমা জানতো। হাতে গোনা দু'একজন নামাজ পড়াতো। নামাজের নিয়ম আর সময় সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো জ্ঞান তাদের ছিলো না।

তবে ব্রিটিশের অধীনে থাকা গুরগাঁও এ মদ্রাসা ছিলো। ওখানের অবস্থা খানিকটা উন্নত ছিলো। আলোয়ারের দু' একটা জায়গার অবস্থা অবশ্য ভালো ছিলো। কিছু মসজিদ তৈরি হয়েছিল এখানে। দু'চারজন লোক কালিমা জানতো, নামাজ পড়তো আর ছিল মদ্রাসার সাথে যোগাযোগ।

এদের বিয়ে শাদী হতো উদ্ভট ধরনের।

বিয়ের প্রথম পর্বটা সারতো ব্রাহ্মণ। সে 'শুভদিন' ঠিক করে দিত। বাকিটুকু দায়িত্ব নিতেন কাজি সাহেব। পুরুষরা পরতো ধুতি আর কোমর পর্যন্ত ছোট পোশাক। পাজামা মোটেও পরতো না। সোনার অলংকার পরা ছিল তাদের আভিজাত্য। গোটা ব্যাপারটা ঘটতো না হিন্দুয়ানি না মুসলমানি ধাঁচের।'

অন্য জায়গায় মেজর পাওলেট বলেন, 'মেওরা স্বভাবের দিক দিয়ে আধা হিন্দু আধা মুসলিম ছিল। 'ওজারা' তহসিল এলাকার পঞ্চাশটি গাঁয়ের মধ্যে মসজিদ ছিল মাত্র আটটি। কিন্তু তাতেও লেগেছিল মন্দিরের ছোঁয়া।

পাঁচপীর, ভাইসা, চাহান্ড এইসব নামে পরিচিত ছিল মসজিদগুলো। মেওদের পড়শী হচ্ছে হিন্দু। ওদের মন্দিরের মতো এদেরও রয়েছে মন্দির আর কিছু এবাদাতখানা। তাতে তারা 'বলিদান' করে থাকে। চাহান্ডা বা খেরাদিও মহাদেবীর পায়ের তলায় উৎসর্গ করা হতো। সেখানে পশুবলির প্রথা ছিল। শবেবরাতের সময় সব মেও পল্লীতে সাঈদ সালার বা মাসুদ গাজীর পতাকা পূজো করা হতো।'

গৌরগাঁও এর গেজেটে একথা লেখা আছে যে, 'মেওরা আলসে আর আমনোযোগী ধরনের মুসলমান। তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলো পড়শি ধর্মের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। বিশেষ করে সেগুলোর মধ্যে যা বিনোদনমূলক বা আনন্দোৎসবের মতো। এসবে অংশ নেয়ায় তাদের উৎসাহের শেষ নেই। ইদানিং বেশ কিছু ধর্মীয় শিক্ষক এসেছেন মেওয়াতে তাদের প্রচেষ্টায় এরা নামাজ পড়ছে। রোজা রাখছে। মসজিদ তৈরি হচ্ছে গাঁয়ে। নামাজীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে দিনে দিনে। মেয়েরা হিন্দুদের ঘাগরা পরা ছেড়ে পাজামা কামিজ আর বোরকা পরা শুরু করেছে। তাদের মাঝে এই প্রথম ধর্মীয় জাগরণের সূচনা হলো।'

ভরতপুর গেজেটিয়ারে লেখা আছে–

'হিন্দু ও মুসলমান মিলে একটা নতুন ধর্ম মেনে চলতো মেওরা। তারা খাতনা ও নিকাহ করে। কবর দেয় মৃতদেহ। আবার 'বাহরাইচ' নামক জায়গায় সাঈদ সালার মাসুদ গাজীর সমাধি স্তম্ভে তীর্থযাত্রা করে। তার পতাকাতলে প্রতিজ্ঞা করাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তারা ভারতের অন্য রাজ্যে তীর্থযাত্রা করে। কিন্তু হজ্বের দাম দেয় না।

www.eelm.weebly.com

তারা হোলি আর দেওয়ালি পূজা করে। তাদের পিতার সম্পত্তিতে কন্যাদের কোনো অধিকার থাকে না। সন্তানের নাম রাখে হিন্দু ও মুসলমান মেলানো উদ্ভট ধরনের নাম। তারা পুরোপুরি মূর্খ। বর্তমান জগত থেকে বিচ্ছিন্ন অবুঝ। গেঁয়ো সরল।

মেওদের কাছে চারণ কবি ও গাইদের খুব দাম। প্রচুর টাকা খরচ করে তাদের আনা হয় চাষবাস আর গেঁয়ো সমাজ জীবনের চালচিত্র তুলে ধরে তাদের গানে। অনেক চতুর্দশপদী গান রয়েছে এদের।

আনন্দের দিনে তারা ওসব গায়। গান আর কবিতার ভাষা রুক্ষ ও কর্কশ। এরা নেশাখোর। অবাধ নেশা পানিতে তারা অভ্যস্থ। এদের বিশ্বাস খুব হালকার চিত্ত দুর্বল। নানা কুসংস্কারে ভরা তাদের মন। এটা অশুভ লক্ষণ, ওটা শুভ অর্থাৎ দৈব ঘটনা আর পূর্ব লক্ষণে তারা বিশ্বাসী। পোশাক আশাক পরে হিন্দুদের মতো। আগেকার দিনে এরা নতুন শিশুকে হত্যা পর্যন্ত করতো। এখন অবশ্য সেই নিষ্ঠুর প্রথা নেই। ডাকাতি, লুটতরাজ ছিলো এদের রুজি রোজগারের উপায়। ইদানিং খানিকটা উন্নত হয়েছে এদের চরিত্র। তারপরেও গরু বা গৃহপালিত পশুর দল দেখলেই হলো, দড়ি খুলে হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়।

অবক্ষয় আর অধঃপতনের দিকে গোটা মেও জাতি জলপাতের মতো নিচে নেমে যাচ্ছিল। দ্রুতগতিতে। কিন্তু তার পরেও এ জাতি স্বভাবে, চরিত্র অসচেতন ভাবে বেশ ভালো কিছু গুণও দেখা যায়। জাতিগতভাবে এরা বীর, দুঃসাহসিক ও দুর্ধর্ষ। কারো কাছে মাথা নত করার মানুষ এরা নয়। এদের জাতিসত্ত্বাবোধ আর মর্যাদাবোধ খুব তীব্র। দৃঢ় মনোবল, উঁচু আশা ভরা এদের মন। মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষিপ্রতা নষ্ট হচ্ছিল সঠিক পরিবেশ না পেয়ে। এরা ছিল সৃজনশীল আর গতিশীল। সরল, কষ্টসহিষ্ণু, শক্তিমত্ত, কর্মদক্ষ, দৃঢ় ও অনমনীয় চরিত্র বৈশিষ্ট ছিলো এ জাতির।

আসলে সব কটা গুণ মার খেয়ে গিয়েছিলো দীর্ঘ বেশ ক'শো বছর ধরে সভ্য দুনিয়া থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন আর ভুলে থাকা অবস্থার জন্যে। এতে দানা বেঁধে উঠেছিলো। অজ্ঞতা আর মূর্খতা। বাইরের প্রগতিশীল পৃথিবী আর ধর্মের সমুন্নত আদর্শ থেকে আলাদা হয়ে পড়লো এমনি হয়। যেমনটি হয়েছিলো চৌদ্দশো বছর আগের আরব দেশের। আসলে অসভ্য ও বর্বর পরিবেশের কারণে তাদের গুণ, যোগ্যতা আর প্রতিভার বিকাশ আলোকিত পথ হয়নি। হয়েছিলো অন্য পথে। ভিন্নখাতে। বীরত্ব আর সাহস ডাকাতি ও লুটতরাজে লিপ্ত করেছিল। স্বভাব সাহসিকতা আর দুর্ধর্ষ চরিত্র ব্যবহারের ঠিক জায়গা না পেয়ে গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাতের পথ বেছে নিয়েছিলো। জাতিসত্ত্বা ও আবেগ ছুটে চলেছিলো মনগড়া আত্মমর্যাদা আর আভিজাত্য রক্ষার কাজে। মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুতপন্নমতিত্ব ঠিক সুযোগের অভাবে খরচ হচ্ছিল নতুন নতুন অপরাধ, পাপ আর আইন অমান্যকারী পদ্ধতি উদ্ভাবনে। তার মানে সহজাত গুণ ও যোগ্যতার গতিপথ ভুল খাতে চলেছিলো বয়ে।

www.eelm.weebly.com

ঠিক চৌদ্দশো বছর আগে অন্ধকারের যুগের মতো। আরবরা এমনি বিপথে চলেছিলো।

তবে এতে মেও জাতির একটা উপকার হয়েছিল। সভ্য দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ওদের মেধা, উদ্যম ও চিন্তাশক্তির অপচয় বা খরচ হয়েছিলো। যেটা পরে দাওয়াতের কাজে, দ্বীন ইসলাম পুনরুজ্জীবনের কাজে লেগেছিলে।

বিচ্ছিন্নতা আর বিস্মৃতির কারণে তাদের হৃদয়ের যেমন ভালো জিনিষ ঢোকেনি তেমনি সভ্যতার নানান বিষাক্ত অবক্ষয়ও ওদের ভেতর ঢোকেনি। সেটা যেন এমন, একটা ফসলের মাঠ যেখানে কোনো বীজই ফেলা হয়নি। পতিত জমিতে শুধু ক শো বছরে কিছু আগাছা গজিয়ে উঠেছিল।

কোনো ফসলও সেখানে ফলেনি।

আর না কোন বিষবৃক্ষ।

আলোর দিন

মেও জাতি।

অজ্ঞ, মূর্খ আর অবোধ একদল মানুষ।

অনেকদিন থেকেই এ এলাকার লোকেরা ছিল শিক্ষা আর ধর্ম ছাড়া। বেপরোয়া, লাগামহীন। জীবন যাত্রার মানও নেহায়েত নিচু ধরনের। গেঁয়ো আর বর্বর জীবন যাপন। মনের দিক দিয়েও এরা সেজন্যে ছোট হয়ে পড়েছিলে। নিজের পাড়া ছেড়ে বাইরে কোথাও বেরুতো না তারা তেমন। হঠাৎই এদের মাঝে ঝোঁক পড়লো দিল্লী আসার। এই আলাদা একটা উদ্দীপনা দেখা দেয়ার কারণ ছিল সবার প্রিয় আর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল (রঃ) তিনি সমাজের এসব আবর্জনার মতো মানুষগুলোকে ভালবেসে ছিলেন। তাদের দুনিয়া আর আখিরাতের দীনতা তাঁর মনকে বেদনার্ত করে তুলেছিল। ওদের দুই দুনিয়ার মুক্তি কামনায় তিনি ছিলেন ব্যাকুল। মেওয়াতের দুঃখী, নিঃসঙ্গ মানুষ সিক্ত হয়েছিল। মাওলানা ইসমাঈল (রঃ)এঁর ভালোবাসার পীযূষ ধারায়। দু'এক হপ্তা দেখা না হলে তারাই ছুটে চলে আসতো দিল্লীর নিজামুদ্দিন। এখানে এসে তারা অনেকে দ্বীনি শিক্ষার জন্যে থেকে যেত। মাওলানা ইসমাইল (রঃ) নিজেও মেওরাত সফরে যেতেন।

গৌড়গাঁও জেলার ফিরোজপুর ছিল মাওলানার বিশেষ লক্ষ্যস্থল। তাঁর পা এখানেই বেশি পড়তো। তিনি এখানে এসে ধর্মহীন মূর্খ মুসলমানের দেখে বেদনায় অধীর হয়ে পড়তেন। ওখানকার বিভিন্ন মসজিদে আট দশদিন করে থাকতেন। এলাকার লোকজনের সাথে দেখা আর মেলামেশা করে তাদের দ্বীন বোঝাতেন। নামাজ রোজা না করলেও এই আঁধার জগতের মানুষেরা মাওলানা ডাকে সাড়া দিয়ে জুমার দিন

www.eelm.weebly.com

মসজিদে ঠিকই হাজির হতেন। মাওলানা ইসমাঈল (রঃ) এই সুযোগটির অপেক্ষায়ই থাকতেন। তিনি সেদিন তাদেরকে দ্বীনের কথা, আখিরাতের কথা বোঝাতেন। তাঁর বক্তব্য বা বয়ান হতো খুবই সহজ। আটপৌরে ভাষায়। দরদঢেঁায়া। কবর, হাশর, পুলসিরাতের কথা শুনে অভিভূত হয়ে যেত মেওয়াতের সহজ সরল অবুঝ মানুষ।

মাওলানা ইসমাঈল (রঃ) কখনো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুদের জীবন কাহিনী শোনাতেন। ওই সব মহামানবদের ত্যাগ, তিতিক্ষা আর ঐশী প্রেমের চরম নিদর্শনের কথা শুনে তারা কাঁদত। হু হু করে। আরো শুনতে চাইতো। তারা মাওলানা ইসমাঈল (রঃ)এঁর প্রতি সাংঘাতিক দুর্বল হয়ে পড়লো। সবাই তাঁর ভক্ত। সকলেই তাঁকে পছন্দ করেন। কিছু লোক তাঁর ভক্ত, শিষ্য ও ছাত্র হিসেবে নিজামুদ্দিনে চলে আসতেন। এখানে থাকতেন। ধর্ম শিখতেন।

এভাবে মেওয়াতের আঁধার আকাশ চিরে জাগলো ভোরের সূর্য।

অবশ্য এর আগেই ফিরোজপুরে খানিকটা দ্বীনি জাগরণ শুরু হয়। হাফিজ ক্বারী ইসমাঈল ফিরোজপুরী সাহেবের বরকতে। তিনি কিছু ধর্মীয় কাজ এখানে শুরু করেন। ক্বারী ইসমাইল (রঃ)এঁর কেরাত ছিলো সুমধুর। আর সেজন্যেই তাঁর উপস্থিতির খবর শুনলে লোকজন ছুটে আসতো দূর দুরান্ত থেকে। এছাড়া অনেকে তাঁকে দাওয়াত করেও নিতে যেতেন। সব সময়ই ব্যস্ত থাকতেন তিনি নানান জায়গায় সফরের জন্যে। দিল্লীতেও তাঁর ছিল অসংখ্য ভক্ত। এখানেও তাঁকে আসা যাওয়া করতে হতো। ক্বারী সাহেবের ছেলেপুলে সবাই শিক্ষিত। বড় ছেলের নাম মুন্সি আহমাদ খান। মেজো মুন্সী মীর আহমাদ। আর সবার ছোটটির নাম নূরবক্স।

ছেলে ছেলে নূর বক্স মুরিদ হন মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল (রঃ) এঁর কাছে। বাইয়াত হবার সাথে সাথেই শায়খের প্রেমে তাঁর অন্তর ভরে ওঠে। তাই তাঁর উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে, তাঁর প্রেমে মন দিয়ে দুনিয়া সব কাজ প্রায় ছেড়ে দেন। জীবনের যাবতীয় কর্মশক্তি দিয়ে গড়ে তোলেন একটা মাদ্রাসা। রাতদিন খাটুনি দেন ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষা আর দীক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে।

বাকী সময়টুকু মগ্ন হতেন ইবাদাতের গভীর সাধনায়।

দ্বীন শেখানোর জন্যে মাওলানা ইসমাঈল (রঃ) কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না। একেবারেই নিঃস্বার্থভাবে অক্লান্ত খেটে পাকা করে গড়ে তুললেন মসজিদটিকে।

পয়লা দিকে মাদ্রাসার কাজও চলতো সাধারণ একটা কাঁচা ঘরে। ক'দিন পরেই অসীম দয়াময়ের করুণায় নিজ খরচে পাকা করে ফেলেন এটাকে। আরো পরে মসজিদের সাথে একটা কামরা তৈরি করেন। ছাত্র পড়ানোর কাজ শেষ হলেই ওই কামরায় ঢুকতেন। দরোজা বন্ধ করে নির্জনতায় আল্লাহর ধ্যানে আর বন্দেগীতে লীন হতেন।

www.eelm.weebly.com

মুন্সিজির মাঝে ছিলো অতুলনীয় তাকওয়া বা খোদাভীতি। যার জন্যে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম পর্যন্ত তাঁকে শ্রদ্ধার নজরে দেখতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব আর গাম্ভীর্য অন্যদের মনে ভয় ধরিয়ে দিত।

মাঝে সাঝে কামরার বাইরে এলে তাঁকে দেখে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়তো লোকজন। বড় বড় ক্ষমতাবান ধনী জমিদাররা পর্যন্ত তাঁর ভয়ে কাঁপতো। সে যুগে হুক্কার চল ছিলো। মুন্সিজীকে দেখলে বড় বড় হোমরা চোমরারা হুক্কা ফেলে দাঁড়িয়ে যেত। একবার একজনের ওপর তিনি রাগ হয়েছিলেন। সে ভয়ে পেশাব করে দেয়। ছোটদের তিনি খুব স্নেহ করতেন। তাদের জন্যে পকেটে চকলেট, লজেন্স রাখতেন। রোজ ওদেরকে লাড্ডু দিতেন। বলতেন, 'কাল যদি আরো বেশি ছাত্র আনতে পারো তাহলে অনেক লাড্ডু পাবে।'

ক'দিন যেতে না যেতে এলাকার বেশির ভাগ ছেলে মদ্রাসায় ভর্তি হয়ে গেল। এমনকি সম্পূর্ণ দ্বীন হীন লোকদের ছেলেরা পর্যন্ত কোরান শরিফ, উর্দু, ফার্সী ইত্যাদি ধর্মীয় বই পড়া শিখতে লাগলো। এছাড়া তারা তখনকার প্রকাশিত পত্র পত্রিকা দিয়েও উপকার পাচ্ছিলো। সে সময় ছাপানো পত্রিকাগুলো এখনকার মতো ছিলো না। তাতে ঈমান, চরিত্র গঠন আর সমাজ সংস্কারমূলক বিষয়গুলো প্রকাশ হতো। এ যুগের প্রেম প্রীতির ঘটনা আর কাল্পনিক গল্প কাহিনী ছাপা হতো না।

মুন্সি বক্স সাহেবের এলাকায় দ্বীনের উন্নতি হচ্ছিল দ্রুতগতিতে। মুসুল্লি সংখ্যা রোজ বেড়ে চলেছিলো। এসব দেখে গাঁয়ের অন্যদিকে নতুন করে আরেকটা মসজিদ তৈরি করলেন। এবার 'ছোট' ও 'বড়' নামে বস্তির দু'দিকে দুটো মসজিদ আবাদ করার কাজ শুরু হলো। বড় মসজিদটি বস্তির উত্তর দিকে, ছোট মসজিদটি ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে। দুটো মসজিদই মুন্সিজির প্রচেষ্টার ফল। উনিশ শো চৌচল্লিশ সালে বড় মসজিদটির (যেটা মসজিদে নুর নামে পরিচিত) পুরোন ভিত্তি ঠিক রেখে পশ্চিম অংশ কিছুটা প্রশস্ত আর পুরোন অংশের পূর্বে দেয়ালে নতুন করে তিনটি দরজা তৈরি করা হয়। তাতে সব দিক দিয়ে সুবিধে হলো মুসুল্লিদের। বাইরের মেহমানদের ইজতিমা এসবের জন্যে থাকার ব্যবস্থা হলো। দিনে দিনে মুসল্লির সংখ্যা আরো বেড়ে চললো। কাজেই আরেকটা মসজিদ তৈরি করার দরকার হলো। এটা তৈরি হলো বস্তির পশ্চিমে দিকে। এই তিন নম্বর মসজিদটি তৈরির ব্যাপারে মুন্সি নুর সাহেবের বিশিষ্ট ছাত্র নম্বরদার মেহরাব খান সাহেবের বেশ অবদান রয়েছে। মুন্সি নূর বক্স সাহেবের প্রচেষ্টায় মেওয়াতের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে ফিরোজপুরে দ্বীন ও দ্বীনি শিক্ষার উন্নতি ধীরে ধীরে বেড়েই চললো। গ্রামে হাফেজ, ক্বারীর সংখ্যা বেড়ে গেল। কোনো কোনো গাঁয়ে মুন্সি, মাওলানার সংখ্যাও বাড়লো। ফিরোজপুরে পূর্ণ, কোরানের হাফেজ হয়ে গেলেন বেশ ক'জন। তার মধ্যে হাফেজ খোদা বক্স, হাফেজ ক্বারী আবদুর রহিম প্রমুখ।

www.eelm.weebly.com

দ্বীনি দায়িত্বশীল প্রাচীন মুরুব্বীরা বলেন, 'মেওয়াতে দ্বীনি শিক্ষা ছড়ানোর ব্যাপারে মুন্সিজির অবদান অপরিসীম।' এমনকি সেখানের শিক্ষিত শ্রেণীর বেশির ভাগ লোক দ্বীনদার হোক বা দুনিয়াদার তারা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে মুন্সি নুর বক্স সাহেবের ছাত্র। মেওয়াতে সবার আগে মুন্সিজিই মাদ্রাসা তৈরি করেন। ফিরোজপুরে তিনি শিক্ষা দানের বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না। মাদ্রাসার কামরাগুলো পর্যন্ত করেন নিজ খরচে। ছাত্রদেরকে কায়দা, আমপারা, কোরান শরিফ ইত্যাদি ধর্মীয় বই পুস্তক কিনে দিতেন নিজ খরচে। আল্লাহ পাক যেমন তাঁকে অতুলনীয় ঈমান ও আমালের দৌলতে ধন্য করেছিলেন তেমনি অগাধ অর্থ সম্পদ দান করেছিলেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ছাত্রদেরকে তিনি নিজ জিম্মায় রাখতেন। তাদের খরচ নিজে চালাতেন।

মুন্সিজি (রঃ) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ (রঃ) এঁর কাছে বাইয়াত হন। কখন কিভাবে কোথায় এঁরা দু'জন পরিচিত হলেন তা ঠিকমতো আমরা জানতে পারিনি। তবে ধারণা করা হয় মুন্সিজি দিল্লীতে শিক্ষার্জন করেছিলেন। যার জন্যে তাকে দিল্লীতে আসা যাওয়া করতে হতো। তিনি নিজামুদ্দিনে যান। সেখানেই তিনি মাওলানা মুহাম্মদ (রঃ) এঁর সাথে পরিচিত হন।

যাই হোক, একথা নিশ্চিত যে মুন্সিজীর জীবনে এই আমূল পরিবর্তন ও তাঁর অতি আশ্চর্যজনক আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ একমাত্র মাওলানা মুহাম্মাদ (রঃ)। তাঁর সুদৃষ্টি আর সুসম্পর্কের বরকতে এতোটা সম্ভব হয়েছিল।

শোনা যায় বাইআতের আগে মুন্সিজী অত্যন্ত আধুনিক ও বিলাসী জীবন যাপন করতেন। খুবই পরিপাটি হয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন। কানে, গলায় সোনার চেন আর হাতে রূপার বালা পরতেন।

মুন্সিজীর ছিলেন তিনভাই তারা সবাই শিক্ষিত। মুন্সিজী সবার ছোট। ছোট হিসেবে ভাইদের আর পরিবারের সবার ছিলেন চরম ও পরম প্রিয়। নয়ণমণি। সে সময় মেওয়াতিদের মাঝে ব্যাপক প্রচলন ছিল মদের। বিশেষ করে অভিজাত শ্রেণীর লোকদের জন্যে এটা ঐতিহ্য ও মর্যাদার চিহ্ন হিসেবে গণ্য হতো। কিন্তু মুন্সিজি আলালের ঘরের দুলাল হয়েও কখনো মদ স্পর্শ করেননি। মাওলানা মুহাম্মাদ (রঃ) এঁর সাথে সম্পর্ক হবার পর প্রায়ই মুন্সিজি তাঁকে ফিরোজপুর আসার জন্যে অনুরোধ করতেন। একদিন মুন্সিজির অনুরোধ কবুল হলো। মাওলানা ফিরোজপুর গেলেন। তারপর অনেকবারই এখানে আসেন। প্রতিবারে এক থেকে দেড় সপ্তাহ ওখানে থেকে ওয়াজ নসীহত আর বাইয়াত করতেন।

মাওলানা মুহাম্মদ (রাঃ) ও মুন্সিজির মেহনতে মেওয়াতীদের মাঝে দ্বীনি আগ্রহ আর উদ্দীপনা তৈরি হলো। সেখানকার বিভিন্ন বস্তিতে নতুন মসজিদ তৈরি হলো। বেড়ে চললো মুসল্লির সংখ্যা। বাড়লো হাফেজ ও মাওলানার সংখ্যা।

www.eelm.weebly.com

অনেকে সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার জন্যে মেওয়াতে পাঠাতে শুরু করলেন। বিশেষ করে ফিরোজপুরে নামাজ, কোরান শেখার প্রসার দিন দিন বেড়েই চললো। আল্লাহ পাকের মর্জি। এমন সময়ই মাওলানা মুহাম্মাদ (রঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। ঠিক তার কিছুদিন পর শায়খের বিদায় ব্যথা সহ্য করতে না পেরে মুন্সিজি মেওয়াতবাসীদের এতিম করে পাড়ি জমালেন পরপারে। ইন্না--- রাজিউন। আল্লাহতায়ালা ওনাদের দু'জনকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন।

এঁদের ইন্তেকালের পর আল্লাহ পাক নিজামুদ্দিনে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রঃ) আর মেওয়াতে মুন্সিজির সুযোগ্য পুত্র হাফেজ মুহাম্মদ ইসহাককে নির্বাচিত করলেন। হাফেজ ইসহাকের সাথে মুন্সিজির কিছু ছাত্র ও ভক্ত সঙ্গী হলেন। তাঁদের মধ্যে দ্বীনের ফিকির (চিন্তাভাবনা) ও জজবা (উদ্দীপনা) রাখতেন নম্বরদার মিয়াজী মেহরাব, মুন্সি তয়রাও খান, মুন্সি নুর আলী খান। এঁরা ছিলেন দ্বীনের জন্যে নিবেদিত প্রাণ।

আল্লাহতায়ালা রাব্বুল আলামিনের বিশেষ দয়া যে মুন্সিজি থাকার সময়ই এলাকাবাসি মুন্সি নাসরুল্লাহ সাহেব গ্রাম সরকার হয়ে ফিরোজপুরে আসেন। পরে তিনি ওখানেই থেকে গেলেন।

বংশগত উদ্দীপনায় মুন্সিজি নাসরুল্লাহ দ্বীনি মেহনতে অংশ নিতেন। এছাড়া রায়সিনা অধিবাসী চৌধুরী নাওয়াজ সাহেবও মুন্সিজির ছাত্র ছিলেন। ফিরোজপুরে তার ভগ্নিপতির বাড়ি হওয়ায় বেশিভাগ সময় তিনিও সেখানে থাকতেন।

মিয়াজি ঈসা ফিরোজপুরী সাহেব বলেন, 'ফিরোজপুরে দ্বীনি মেহনত কারীদের আমি ছোটবেলায় নিজ চোখে দেখেছি।' তাঁরা খাওয়া দাওয়া ওঠাবসা একই সাথে করতেন। তাদের মধ্যে অপূর্ব ভালবাসা বিরাজ করতো। কোনো অপরিচিত লোক দেখে বুঝেই পেতো না যে ওঁরা আলাদা এলাকার ভিন্ন গোত্রের লোক। মাওলানা মুহাম্মদ (রঃ) ও মুন্সি বক্স সাহেবের চেষ্টা ও দোয়ার বরকতে ফিরোজপুরের পুরুষ ও মহিলা নামাজে খুব মনযোগী হয়ে ওঠেন। মুন্সিজির ছাত্রদের এক জামাত বস্তি বস্তি ঘুরে পুরুষদেরকে মসজিদে আনতে আর মহিলাদের ঘরে নামাজের ব্যাপারে উৎসাহিত আর উদ্দীপ্ত করতে থাকেন।'

মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) নিজামুদ্দিনে এলেন।

তখন মেওয়াতীরা বিশেষ করে ফিরোজপুর বাসিরা এখানে ঘন ঘন আসা শুরু করলো। মাওলানা মুহাম্মদ (রঃ) এর অন্য মেওয়াতী ছাত্ররাও আসতে থাকে। অনেকদিন ধরে তারা হযরতজী (রঃ) কে মেওয়াত যাবার অনুরোধ করতেন। মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) এঁর এক বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল তিনি তাঁর আব্বা ও ভায়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তির বিশেষ খেয়াল রাখতেন। তাদের অবদান রক্ষা করতে চেষ্টা নিতেন। মেওয়াতীদের অবিরাম অনুরোধ একবার তিনি মেওয়াত যাওয়া ঠিক করলেন। প্রথম ফিরোজপুর যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সে সময় বেশির ভাগ মেওয়াতিদের কাছে

www.eelm.weebly.com

ফিরোজপুরের একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল। তাই ফিরোজপুরে যাবার ব্যাপারে কারো তরফ থেকে কোনো আপত্তি ছিল না।

হযরতজী (রাঃ) এঁর মেওয়াতে আসার খবর শুনে চারদিক থেকে লোকজন এসে ভরে গেল। এই প্রথম মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) মেওয়াতে এলেন। এক রাত সেখানে কাটালেন। বয়ান করলেন ক'টা অনুষ্ঠানে। এমনি করে হযরতজী (রঃ) এঁর এখানে আসা যাওয়ায় মেওয়াতিদের সাথে তাঁর সম্পর্ক বেড়ে গেল। প্রথমদিকে তিনি বেশি ভাগ থাকতেন নুহ এলাকায়। পরে অন্য সব গাঁয়ে গেলেন। এখানে এসে পথহারা উম্মতের অবস্থা দেখে তিনি খুবই চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। তীব্র বেদনা আর জ্বালপোড়ায় অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি। উম্মতের জন্যে দরদ আর দুঃখ ভরা মন নিয়ে তাদের সংশোধনের সবচেয়ে বড় উপায় হিসেবে তালীমকে প্রাধান্য দিলেন। তিনি কোরান শরীফ ও প্রাথমিক মাসলা মাসায়েল শিক্ষার এবং উর্দু বই পড়ার মক্তব খুলে দিলেন। তালীমের জন্যে তাঁকে সীমাহীন কষ্ট ক্লেশ সহ্য করতে হলো। চারদিক থেকে নিত্য নতুন বাধা সামনে এসে দাঁড়ালো। তিনি ছিলেন লক্ষে অবিচল আর ধৈর্যের পাহাড়। তাই বিন্দুমাত্র না ঘাবড়ে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন।

শিক্ষার কাজ অব্যাহত ছিল বটে কিন্তু শিক্ষার্থীদের জীবনে তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না।

মেওয়াতিদের মাঝে আগের সেই হিন্দুআনা চাল চলন আর বেশভূষা রয়েই গেল।

তবু তিনি নিরাশ হলেন না।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রঃ) একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, কুসংস্কার আর মূর্খতা দূর করার জন্যে আসল পথ হলো প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞান প্রচার আর চর্চার মাধ্যমে তাদের ঘুমন্ত চেতনাকে জাগিয়ে তোলা। সেজন্যে দরকার অবিরাম যোগাযোগ সাধারণ অজ্ঞ মানুষের সাথে। ধর্মের নিয়ম কানুন, নীতি, আচার অনুষ্ঠানের বাইরের ভেতরের প্রক্রিয়া তাদের সামনে তুলে ধরা। শেখানো, পরিচিত করা আর নিয়মিত চর্চা করে এগুলো তাদের সামনে তুলে ধরা। শেখানো, পরিচিত করা আর নিয়মিত চর্চা করে এগুলো তাদের আয়ত্বে আনা ও অভ্যেসে পরিণত করা। মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল (রঃ) ও মাওলানা মুহাম্মাদ (রঃ) এই পথটিই ধরে ছিলেন। একই পথ বেছে নিয়ে আগে এগিয়ে চললেন মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)। তিনি আর এক পা আগে বাড়লেন। মেওয়াতে মক্তব আর মাদ্রাসা তৈরি করলেন। যাতে ঈমানের প্রভাব বড় এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। পরিবর্তন হয় দ্রুত। তাড়াতাড়ি।

একজন প্রাজ্ঞ আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতাকে যদি তাঁর ভক্ত বা অনুরাগীরা কাছে ডাকেন সেটা কেমন হয় এটা মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) জানতেন। ভাগো খাবার, তোষামদ, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার আর ভক্তদের শ্রদ্ধা, সম্মান গ্রহণ এগুলোর ওপর হযরতজী (রঃ) খুবই বিরক্ত ছিলেন। দাওয়াতে যাবার আগে তিনি বুঝতে চেষ্টা করতেন কাজের কাজ কতটুকু হবে।

www.eelm.weebly.com

ইসলামের ওপর চলার জন্যে লোকজন কতটুকু আগ্রহী আর উদ্যমী হবে সেটা খেয়াল করতেন।

ওই সময় হযরতজী (রঃ) এঁর ধারণা ছিল মাদ্রাসা আর মক্তব প্রতিষ্ঠিত হলে দ্বীনি উন্নতি হবে। সেজন্যে কোথাও দাওয়াত নেবার আগে বলে নিতেন, 'বলো, ওখানে মক্তব মাদ্রাসা দেবে তো?'

কিন্তু মেওয়াতীদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ।

ছেলেপুলের মক্তবে দিয়ে দিলে রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যেত। কাজেই শর্ত শুনে অসহায় হয়ে পড়লো তারা। মাওলানা (রঃ) তাদের আল্লাহর অসীম দয়া, তাঁর সত্ত্বা আর ক্ষমতার কথা শোনাতেন। আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা রাখতে বলতেন। তখন মেওয়াতীরা অভিভূত শর্ত মেনে নিত।

শেষমেশ হযরতজী (রঃ) এঁর প্রচন্ড উদ্যম আর মেহনতে মাদ্রাসা তৈরি হলো মেওয়াতে।

তিনি মেওয়াতীদের বলতেন, 'তোমরা আমাকে ছাত্র জোগাড় করে দিও। আমি তোমাদের অর্থ যোগান দেব।'

এক সফরে তিনি দশটা মক্তব তৈরি করলেন।

মেওয়াতিরা কাঁপা কণ্ঠে তাঁকে বলতো, 'ছেলেপুলেরা চাষবাস, গরু ছাগল দেখাশুনা ছেড়ে দিলে খাবো কি?

তাদের বোঝাতে অনেক দেরি হতো মাওলানার। অনেক কথা খরচ করতে হতো। অবিরাম, সহ্য, ধৈর্য আর অধ্যবসায় দিয়ে তাদের উদ্দীপনা চাঙ্গা করতেন। এতো কিছু তিনি করতেন নিজের কাজ মনে করে। প্রচন্ড খাটুনি আর অর্থ কড়ি খরচ করতেন এর পেছনে। এই দায়িত্বটি ছিলো পুরো মুসলিম জাতির ওপর। কিন্তু সবাই উদাসীন। তাই তিনি একাই কাঁধে নিলেন দ্বীনের এই জোয়াল। তিনি একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে ধর্মীয় কাজগুলো ঠিকমতো আদায়ের জন্যে জানমাল অকাতরে খরচ করতে হবে।

একদিন।

এক লোক এলো। হাতে টাকার থলি। খরচ করার জন্যে নিতে বললেন। মাওলানা (রঃ) বললেন, 'আমরা যদি মহান প্রভু আল্লাহ তায়ালার দেয়া কাজকে নিজের কাজ না মনে করি তাহলে কী করে তার অনুগত দাস হিসেবে দাবী করবো?' খনিকক্ষণ চুপ থেকে গাঢ় বিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমরা নিষ্পাপ নবী আলাইহিস সালামদের ঠিক মতো বুঝতে পারিনি। তাঁদের দাম কি তাও আমরা জানি না।'

কিন্তু মক্তব প্রতিষ্ঠার উৎসাহে ভাটা পড়লো ছোট একটা ঘটনায়। একবার এক সফরের সময় তাঁর সামনে এনে হাজির করা হলো একজন যুবককে। সবাই তার প্রশংসা করছে। সে নাকি হযরতজী (রঃ) এঁর প্রতিষ্ঠিত এক মাদ্রাসা থেকে পড়াশোনা

www.eelm.weebly.com

করে বেরিয়েছে। তার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। পাথর হয়ে গেছেন যেন। নির্বাক। তারপরই তাঁর বুকের ভেতর হৃদপিন্ড তড়পাতে লাগলো। উত্তাল গতিতে। খানিক পর মাথা নিচু করলেন তিনি। বেশ খানিকক্ষণ লাগলো ব্যাপারটা হজম করতে।

তাঁর কলজেটা কে যেন চেপে ধরে রেখেছে। প্রবল আলোড়ন চলছে তাঁর অনুভূতির জগতে।

হতাশায় তিনি যেন কুঁকড়ে গেলেন।

যুবকের মুখে নেই দাড়ি!

কিছুদিন আর মেওয়াতে গেলেন না। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। ভাবছেন। ভাবছেন। আর ভাবছেন।

উম্মতের মুক্তির উপায় কি?

উম্মতের সংশোধনের উপায় কি?

অবশেষে মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) ওই আগের পথ তালিম কায়েম রেখে সংশোধনের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ওয়াজ, নসিহতের পথ ধরলেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) এঁর সান্নিধ্য প্রাপ্ত ওয়ায়েজীন, ওলামায়ে কেরামগণকে সংগ্রহ করে তাদের জন্যে ভাতা ঠিক করলেন। তাঁদেরকে মেওয়াতের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ওয়াজ নসিহত করার দায়িত্ব দিলেন। তাঁরা হযরতজীর ইচ্ছামতো বিভিন্ন বস্তিতে গিয়ে লোকজন জমায়েত করে ওয়াজ নসিহত করতে থাকেন। তাতে কিছু ফল দেখা দিলো। কিন্তু তা ছিলো সাময়িক। বস্তির অনেকে নামাজও ধরলো। ওয়ায়েজীনে কেরামের কাছে এলাকার উন্নতির খবর শুনে খুব খুশি হলেন হযরতজী (রঃ)। ভাবলেন এভাবেই হয়তো উম্মতের সংশোধন হবে।

ক'দিন যেসব বস্তিতে ওয়াজ হয়েছিলো। সেখানের অবস্থা দেখার জন্যে হযতরজী নিজেই বেরুলেন। ঘুরে দেখলেন। ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। কোথায় তাদের নামাজ কালাম? আগের মতোই তারা ধর্মহীন জীবন কাটাচ্ছে। মেওয়াতিদের এ অবস্থা হযরতজী (রঃ) কে দারুণ ব্যথিত করে তুললো। দিনের পর দিন তাঁর উম্মতের সংশোধনের ও পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা বেড়েই চললো।

হযরতজী যখন উম্মতের দরদ ও চিন্তায় প্রচণ্ড অস্থিরতায় দিন কাটাচ্ছেন তখন আগ্রার মালকান সম্প্রদায় থেকে শুদ্ধি আন্দোলন নামে এক ফিতনার সূত্রপাত ঘটে। শুদ্ধি আন্দোলনের চক্রে পড়ে অনেক মুসলমান মুরতাদ হতে শুরু করে। আসল ঘটনা হচ্ছে আগ্রার কাছে ওই মালকান সম্প্রদায় ছিলো মুসলিম বংশধর। কিন্তু তাদের সামাজিক রীতিনীতি, চাল চলন, বেশভূষা সবকিছু ছিলো হিন্দুদের মতো। রোজাতো দূরের কথা পবিত্র কালিমা তাইয়্যিবাও তারা বলতে পারতেন না। এমনকি ওদের নামগুলো পর্যন্ত হিন্দুয়ানি। ইসলামের কোনো কথাই তাদের কানে পৌঁছেনি।

www.eelm.weebly.com

এদেরকে পাশের হিন্দু ও তাদের নিজ বংশের কিছু লোক তখন এই বলে পথভ্রষ্ট করতে লাগলো যে, 'তোমরা আসলে হিন্দুদেরই বংশধর। তোমাদের পূর্ব পুরুষরা আমাদের মতোই পূজা পর্বে বিশ্বাসী ছিলো। আসলে ওদেরকে মুসলমান বাদশাহরা জোর করে মুসলমান করেছিলো। নইলে এখনো আমাদের ও তোমাদের মধ্যে তেমন বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই কেন? এই দেখো, তোমাদের নাম-ধাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান সবই আমাদের মতো। পার্থক্য শুধু তোমরা বছরে দু'বার ঈদ ও একবার মুহাররাম পালন করে থাকো। এসব ত্যাগ করো। সব ছেড়ে দাও। তাহলে আগের মতোই আমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাবো।'

হিন্দুদের এসব ধোঁকার কথা শুনে কিছু মুসলমান মালকান মুরতাদ হয়ে গেল। এই মর্মান্তিক দ্বীনি দুর্দশায় ওলামায়ে কেরাম, বুজুর্গানে দ্বীন দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে সবাই মিলে নানাভাবে চেষ্টা করে যথেষ্ট লোককে মুরতাদ হওয়া থেকে রক্ষা করলো। মেওয়াতিদের জীবন যাত্রার পরিস্থিতিও ছিলো কিছুটা এই মালকান সম্প্রদায়ের মতো। কাজেই মালকানদের মতো এদের ওপরেও যদি ওরা চেষ্টা চালায় তাহলে কোনো রকম সন্দেহ না করেই মেওয়াতিরা ধর্মহারা হয়ে যেতে পারে।

এই ভয়ে দুঃশ্চিন্তা করতে করতে হযরতজী (রঃ) নাওয়া খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দেন। সারাক্ষণ দ্বীনের কি হবে ভেবে অস্থির অধীর দিন কাটান। রাতের পর রাত কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন। এতো কিছুর পরেও এসলাহের কোন্ পথ তখনো বুঝতে পারেননি। আর এর আগে সব পথেই তিনি প্রচেষ্টা চালিয়ে তার ফলাফল প্রত্যক্ষ করে দেখেছিলেন। সত্যিকার ফল পাননি। দ্বীনি দুরাবস্থা আরো বাড়ছে দেখে তিনি উম্মতের চিন্তা ভাবনার আকুল পাথারে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন।

একদিন।

ওরা ফের এলো।

বললো, 'আপনি আবার চলুন। নইলে দ্বীনি পরিবেশ যতটুকু গড়েছিলো তা নষ্ট হয়ে যাবে।'

তিনি যেতে রাজী হলেন।

ওদিকে দিল্লী ও অন্য কিছু জায়গায় টাকা দিয়ে কিছু ধর্ম প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দুই আড়াই বছর পর তাদের কাজের হার দেখে মাওলানা নারাজ হলেন। তিনি অনুভব করলেন যে, যা চাইছেন তা এ পথে অর্জন সম্ভব হবে না। গোটা কর্মকান্ডটি প্রাণহীন হয়ে পড়ছে। কাজেই বেতনভুক্ত কর্মী রাখার ইচ্ছেকে পুরোপুরি বাদ দিলেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) মেওয়াতে প্রচণ্ড পরিশ্রম আর অর্থ খরচ করে প্রায় হাজারের ওপর মক্তব তৈরি করেছিলেন। তার শিক্ষকদের ভাতা বা অন্যান্য খরচ নিজ পকেট থেকে করেছেন। যে কাজ জাতির করার কথা তার দায়িত্ব একাই নিয়েছেন। কারণ তার কর্মনীতি ছিলো এটা। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,

www.eelm.weebly.com

তবে একলা চলো রে।' এই চেতনায় স্তব্ধ হয়ে জীবনের যাবতীয় শখ, আহলাদ, আকাঙ্ক্ষা আর মোহকে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি একাই এগিয়ে গেছেন। একবার তাঁর এক ভক্ত কিছু টাকা দিয়ে তাঁকে দিলেন। বললেন, 'এটা একেবারেই আপনার নিজের কাজের জন্যে।'

তিনি কান্না ভেজা স্বরে বললেন, 'দ্বীনের কাজ যদি নিজের কাজ না হয় তবে আমাদের পরিচয়ই তো শেষ হয়ে যায়।'

এরপর খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। বললেন, 'আফশোস, আমরা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল্যায়ন করলাম না।'

ভোর হচ্ছে

মেওয়াতের লোকেরা তাঁকে কটা দিনের জন্যে যেতে বললে তিনি বললেন, 'শুধু ফিরোজপুর নয়, আমি গোটা বিশ্বের উম্মতের চিন্তায় চিন্তিত। সেক্ষেত্রে কেবল তোমাদের বস্তিতেই এতোদিন কী করে থাকি? তাছাড়া তোমরা বেশ লেখাপড়াও শিখছো। অন্য এলাকার তুলনায় তোমাদের বস্তিতে যথেষ্ট দ্বীন ও দ্বীনি ইলম শেখার মাদ্রাসা রয়েছে। তোমাদের এলাকায় তোমরাই মেহনত করতে থাকো। পরামর্শ ইত্যাদির জন্যে আমি মাঝে মাঝে যাবো।'

মেওয়াতিরা বললো, 'হযরতজী, আমরা কিভাবে চেষ্টা করবো? আমাদের পরামর্শ দিন।'

হযরতজী (রঃ) বললেন, 'তোমরা দল বেঁধে মানুষের কাছে যাও। দাওয়াত দাও। তাদের মসজিদে আনো। এবার ওদের দ্বীনি কথা শোনাও।'

তারা বললো, 'হযরত আমরা এটা করবো, ইন্‌শাআল্লাহ। কবে করবো আপনি বলে দিন। সেদিন আপনি আসবেন। দেখবেন, আমরা ঠিক মতো করতে পারছি কি না।'

দিনক্ষণ ঠিক হলো।

ফিরোজপুরের সবাই খুশি মনে হযরতজীর দরবার থেকে চলে এলো। এলাকায় এসে সবাইকে শোনালো। আসার খবর।

হযরতজী আসবেন। তাদের অপেক্ষার দিনগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর মনে হলো। 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' করতে করতে সেই দিনটি এলো। ভোর হতে সবাই পড়ে রইলো রাজপথে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, হযরতজী সেই পথে না এসে সোজা 'নূহ' এলাকায় পৌঁছুলেন। হযরতকে না পেয়ে আসরের সময় সবাই পরামর্শ করলেন এখন কি করা যায়? কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনার পর কেউ বলেন, 'হযরতজী হয়তো অন্য কোনো পথে চলে গেছেন। নূহ হয়ে ফিরোজপুর আসতে পথ ভুলে কোথাও রয়ে গেছেন।'

www.eelm.weebly.com

সবাই পরামর্শে বসলো।

ফায়সালা হলো। দু'জন নূহে যাবে। হযরতজী (রঃ) এলে একজন এখানে চলে আসবে। আমরা পাল্কি, রথ ইত্যাদি নিয়ে অভ্যর্থনার জন্যে নূহের দিকে এগিয়ে যাবো। আর যদি না এসে থাকেন তাহলে তোমরা দু'জনে ফিরে এসে খবর দেবে।

দু'জন যখন নূহ পৌঁছুলো তখন হযরতজী জামে মসজিদে উপস্থিত। তারা ফিরোজপুরবাসিদের দিনভর অপেক্ষার কথা হজরতজী (রঃ) কে জানালো। হযরতজী (রঃ) বললেন, 'আমার লক্ষ্যই ছিলো ফিরোজপুরে যাওয়া। কিন্তু ভুলে এখানে এসে পড়েছি। এখনো আমি ওখানে যেতে তৈরি।'

তখন নুহের দু'জন অনেক অনুরোধ করে বললেন, 'হযরতজীকে আজ এখানে থাকতে দাও। কাল সকালে আমরা নিজেরাই ওনাকে ফিরোজপুরে পৌঁছে দেব।'

নূহবাসিদের অনুরোধ ওরা ফেলতে পারলো না। তারা ফিরে এলো। সবাইকে ঘটনা জানালো। পরদিন খুব ভোরে ফিরোজপুরের লোকেরা পালকি ও রথ নিয়ে হযরতজী (রঃ) কে নিয়ে আসতে গেল। হযরতজী নূহের বিশিষ্ট বুজুর্গানে দ্বীন সহ তাদের পালকি চড়ে ফিরোপুর এলেন।

এ ঘটনাটি ছিল ইংরেজি ১৯২৬ বা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে। হযরতজী (রঃ) ব্যাকুল হয়ে বার বার বলছিলেন, 'ভাই, জামাত বের করো, জামাত বের করো। দাওয়াতে বের হও।' কিন্তু জামাত বের হয়ে গেলে হযরতজী (রঃ) তা দেখে চলে যাবেন এই ভয়ে এলাকাবাসি গাশ্ত করতে ভয় করছিলো। হযরতজী (রঃ) কে সেদিন তাদের কাছে রাখার জন্যে দেরি করে জামাত বের করলো। মাগরিবের পরে। হযরতজী (রঃ) নিজেও বের হলেন। দাওয়াত দিয়ে কয়েকজন বেনামাজীকে তারা মসজিদে আনলেন। হযরতজী (রঃ) গোটা কর্মকান্ডে খুব খুশি হলেন। দাওয়াত দেয়ার পর এশার নামাজ হলো। নামাজ শেষে হযরতজী (রঃ) বয়ান করলেন। শেষে বিশেষ ব্যক্তিদের বসিয়ে বললেন, 'তোমাদের এই দাওয়াত আমার খুবই ভালো লেগেছে। অবশ্য আমি এতে কিছু টুকটাক ভুল দেখতে পেয়েছি। সেগুলো ঠিক করে দিচ্ছি। তোমরা এর পর থেকে আমার বলা নিয়ম মতো দাওয়াত দেবে।'

তারপর এই দাওয়াত কখনো চান্দিনী, কখনো গাছিগা এলাকায় হতো। এভাবে মেওয়াতের বেশ ক'টা গাঁয়ে একাজ চালু হলো।

হযরতজী (রঃ) বললেন, 'তোমাদের এই কাজ মানবজাতির বড় মঙ্গল ডেকে আনবে।'

শুরু হলো কাজ।

দাওয়াতের।

আলোর।

www.eelm.weebly.com

জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা এক হাজার বছরের গাঢ় জমাট আঁধার কেটে যাচ্ছে।

ফর্সা হচ্ছে।

পূবের আকাশ।

লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথ

হযরতজী (রঃ) এক চিঠিতে লিখছেন, 'দ্বীনের জন্যে উদ্দীপনা যে স্তরে পৌঁছুলে মাদ্রাসার কাজ এগিয়ে যেতে পারে তেমন ধরনের মানুষ এখনো আমাদের মাঝে বেশি নেই। কাজেই বেশ সময় নিয়ে জনতার মাঝে গিয়ে তাদের গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে বোঝাতে হবে। তখন তাদের মাথা যা দুনিয়াবী উন্নতি ও সফলতার বিভিন্ন ফন্দি ফিকিরে লিপ্ত তা খালি হবে। এভাবে বার বার যোগাযোগ করে, কথা বলে দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও চেতনা দিতে হবে। তারপর দ্বীনি পরিবেশে টেনে এনে এর জৌলুস, মাহাত্ম ও গুরুত্ব চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হবে। তখন তাদের মাঝে দ্বীনের ওপর চলার একটা সাধারণ যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। সমাজ জীবনে ইসলাম প্রীতি কিছুটা উন্নতি লাভ করবে। এবার ইনশাআল্লাহ অল্প মেহনতেই অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হবে।'

মাওলান মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) এঁর মনোবল ছিলো সুদৃঢ়, আর সাহসের পাহাড় ছিলেন তিনি। লক্ষে পৌঁছানোর জন্যে অবিরাম চেষ্টা চালানো, বাধার প্রাচীর দু'পায়ে দলে এগিয়ে যাওয়া ছিলো তাঁর অন্যতম গুণ।

এ ধরনের অসাধারণ গুণ তাঁকে দ্বীন দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠার কাজে এক ব্যতিক্রমী ভূমিকা নিতে সাহায্য করেছে। তিনি মর্যাদার স্বর্ণশিখরে উঠেছেন। আর এজন্যেই দ্বীনের আংশিক, প্রাথমিক আর সাময়িক উন্নতিতে নিশ্চিত হতেন না। আত্মতুষ্টি ছিলো না তাঁর মাঝে। সব সময় চূড়ান্ত লক্ষে পৌঁছানোর জন্যে অস্থির, অধীর, অশান্ত আর অতৃপ্ত থাকতেন।

সেজন্যে একটানা মেহনত করতেন। তাঁর বিশ্রাম ছিলো নামাজ। না খেয়ে না ঘুমিয়ে ক্রমাগত ছিয়াত্তর ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। দ্বীন জিন্দা হবার লক্ষে। কখনো কোথাও থির হয়ে বসেননি, স্বস্তির ফেলেননি। একমাত্র মৃত্যু যেন এই বিদ্যুৎগতি সম্পন্ন মানুষটিকে থামাতে পারতো।

মক্তব আর মাদ্রাসা খুলে, দ্বীনি ইলম শিখে জাতির সংশোধন যে সম্ভব নয় এটা বুঝতে পারলেন হযরতজী (রঃ) এ ক'দিনের সামান্য পরিশ্রমে। তিনি ঠাওর পেলেন, বাইরের পথভ্রষ্টতার গাঢ় আঁধার মাদ্রাসা মক্তবে ঢুকে পড়েছে। সত্যি বলতে কি,

www.eelm.weebly.com

মাদ্রাসায় পুরোপুরি দ্বীনি চেতনাও আসে না। তার ওপর বাইরের সর্বগ্রাসী বিষাক্ত হাওয়া ঘিরে ধরে তাদের। সামান্য ধর্মীয় শিক্ষা অনাচারের সাগরে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়।

আমাদের পরিচিত সমাজ এমনভাবে বছর, যুগ আর শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে। কেউ তার ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসা মক্তবে দেয়ার জন্যে তৈরি নয়। সর্বসাধারণের মনে একজন ধর্মীয় শিক্ষক সম্পর্কে ভালো কোনো ধারণা নেই। বরং উদ্ভট বাজে কিছু মন্দ ধারণা পোষণ করে। যা হাতে গোনা দু'একজন হয়তো করেছে। কাজেই জনতার মনে যেহেতু আলিমদের ওপর ভক্তি, শ্রদ্ধা নেই বরং সন্দেহ আছে তখন সে তার সন্তানকে তো মাদ্রাসায় পাঠাবেই না।

আরেকটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে এভাবে যে, যারা মাদ্রাসায় যায় তারা ছেলেমানুষ। অপ্রাপ্তবয়স্ক। এখনো ওদের ওপর আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধের বিধান প্রযোজ্য নয়। অন্যদিকে যারা বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক তাদের ওপর এই মুহূর্তে কতো শতো বিধান আসছে। কিন্তু তাদের সে সম্পর্কে জ্ঞান নেই মানা তো পরের কথা। তারা প্রতিদিন ভয়াবহ সব শাস্তি, আজাবের ভাগীদার হচ্ছে। অর্থাৎ যাদের দরকার তাদের জন্যে কোনো ব্যবস্থা নেই। আর যারা ভবিষ্যতে আমল করবে তাদের এখনি জানা হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে মাদ্রাসার ফলাফল। এছাড়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দ্বীনি ইল্‌ম শিখতে তার সময় দিতে হয় সারাক্ষণ। নিজের জীবন ও জীবিকার পথে এটা প্রধান বাধা। কাজেই হযরতজী (রঃ) সিদ্ধান্তে এলেন গোটা মানবজাতির পরিবর্তন মাদ্রাসা দিয়ে হতে পারে না।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) ছিলেন প্রচণ্ড আন্তরিক ও একনিষ্ঠ। এখলাস বা আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবার জন্যে পাগল পারা। সেজন্যে যে কোনো ঝগড়া-বিবাদ, ফিতনা-ফাসাদ, ঝুট-ঝামেলা তিনি খুব সহজে নিষ্পত্তি করে দিতেন। মক্তব, মাদ্রাসা করার সাথে সাথে এ কাজটিও তিনি করতেন। তাঁর মাঝে এমনি সুপ্ত শক্তি, আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, আত্মার প্রচণ্ড আকর্ষণীয় শক্তি, অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা ছিল যা খুব তাড়াতাড়ি দুটো বিবাদমান দলে যুগযুগের শূন্যতাকে সামান্য সময়ে পূর্ণ করে দিত। দু'দলের মাঝে কায়েম হতো সৌহার্দ, ভাতৃত্ব, সম্প্রীতি আর সমঝোতা।

মেওয়াতিরা বলতো, 'আশ্চর্য! বুঝি না এর ভেদ, মানুষটা তো ছোটখাটো হাড়গিলে, শুকনো কাঠি! কিন্তু যেখানেই যায় সেখানেই বয়ে যায় সুবাতাস। মুহূর্তে মিটে যায় মনের অমিল। একেবারে নাছোড়বান্দা কঠোর গোঁয়ার গোবিন্দটিও তার সামনে নত হয়ে যায়। মেনে নেয় শান্তির আহবান।'

মেওয়াতে যখন হযরতজী (রঃ) দ্বীনি পরিবেশ তৈরির জন্যে ব্যস্ত তখন ওখানে আরো ক'জন আলিম ওয়াজ নসীহত করছিলেন। তাতে চরিত্র ও বিশ্বাসের পরিবর্তনের ডাক দেয়া হতো। ইসলামী বিধি বিধান মেনে চলা, ভুল প্রথা বা বিদআত আর

www.eelm.weebly.com

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আর দ্বীন প্রচার তাদের কাজ ছিল। বেশ সুন্দর আন্দোলন গড়ে উঠলো।

এসবই দূর থেকে দেখছিলেন হযরতজী (রঃ)।

কিন্তু তাঁর মন এতে খুশি বা তৃপ্ত হয়নি। তিনি ভাবছিলেন দ্বীন ইসলামের অবস্থা এখন একপাল ছাগলের মতো। যারা বাঁধনহীন। বল্গাহারা। সুদক্ষ রাখালের অভাব। যারা আছে তারা দিশেহারা। বেপরোয়া ছাগল বাহিনী একদিক সামলালে অন্যদিকে খুলে যায়। একটা গুনাহ থেকে বাঁচার পর দশটা পাপ মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়ায়।

হযরতজী (রঃ) এই করুণ অবস্থার কারণ খুঁজে বের করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন উম্মতের এ হাল ফেরানোর উপায় চরিত্র বা আকীদা পরিবর্তনের দ্বারা হবে না। সেজন্যে দরকার পূর্ণাঙ্গ ঈমান। কবি বলেন, 'আল্লাহ তে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান?'

মুসলমান সোজা সরল রাস্তা থেকে সরে গেছে। তা হচ্ছে ঈমানের আলো। ঈমানী উদ্দীপনা। এটা বেশ ক'শো বছর ধরে মানুষের মন থেকে মুছে গেছে।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, হাতে গোনা দু'চারজন দ্বীনি সাধনায় উন্নতির চরম মার্গে পৌঁছে গেলেও পুরো উম্মতের মাঝে দ্বীন আসবে না। আল্লাহর দয়া সাধারণ ভাবে বর্ষণ হবে না। সাধারণ মানুষ, 'আপামর জনতা অর্থাৎ সবার মাঝে দ্বীনি জাগরণ যদি আসে তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত ব্যাপক ও সর্বস্তরে আসবে।

হযরতজী (রঃ) এঁর মনের কথা খুব সহজ সরলভাবে একজন মেওয়াতি বলেন, ইসলাম আসতে হবে সর্বসাধারণের মাঝে। নইলে দ্বীনের কোনোই উন্নতি হবে না।' কাজেই ঈমানী চেতনা ফিরিয়ে আনতে হলে ঈমানী কথা নিয়ে হাজির হতে হবে সাধারণ জন মানুষের কাছে।

যেতে হবে দুয়ারে দুয়ারে।

বারে বারে।

পূবের ওই আকাশে সূর্য উঠেছে

কি হবে উম্মতের?

কী করতে পারেন উম্মতের জন্যে?

উম্মতের হেদায়াত সর্বত্র সব জায়গায় আসার উপায় কি?

ভাবতে গিয়ে অকূল দরিয়ায় ভাসতে লাগলেন হযরতজী (রঃ)।

তবুও এ সময়টুকুতে তিনি মেওয়াতে যাচ্ছিলেন। লোকজন তাঁকে হাতে বাইয়াত হচ্ছিলেন। অনেক লোক তাঁর সিলসিলাতে চলে এলেন। সবার অনুরোধে তিনি একবার নিয়ে এলেন হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী (রঃ) কে। সাথে আরো ক'জন বজুর্গানে দ্বীন ও ওলামায়ে কেরাম।

www.eelm.weebly.com

মেওয়াতবাসী ফিরোজপুর এলাকায় জমা হতে লাগলেন হযরত সাহারানপুরী (রঃ) কে দেখার জন্য। লোকে লোকারণ্য। গোটা মেওয়াত যেন ভেঙে পড়ছে ফিরোজপুরে। এক বিশাল জনসমুদ্র সাহারানপুরী (রঃ) এর হাতে বাইয়াত হলেন।

শাওয়াল।

চৌত্রিশ হিজরি।

উনিশশো পঁচিশ সাল, এপ্রিল মাস।

এবার হজ্জে রওনা হলেন হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)। সাথে রয়েছেন উপমহাদেশের বিখ্যাত বুজুর্গ তাঁর শায়খ হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী (রঃ)।

যাবার পথে হায়দারাবাদে থামলো জামাত। এখানে সাহারানপুরী (রঃ) এঁর অনেক ভক্ত। তাঁরা সহজে ছাড়তে চাইলেন না এই মোবারক জামাতকে। অবশেষে তাঁরা পৌঁছুলেন পবিত্র ধামে। শেষ হলো হজ্ব। গভীর আন্তরিকতার সাথে।

মদিনায় দিন যায়।

সময় শেষ হয়ে এলো। হজ্ব থেকে ফিরে চলেছেন বন্ধু বান্ধব। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রঃ) এঁর ভেতর ফিরে আসার কোনো চিহ্ন নেই। এক আশ্চর্য অস্থিরতায় অধীর হয়ে রয়েছেন। এক অবর্ণনীয় ব্যাকুলতা তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। গভীর আচ্ছান্ন ভাব গোটা অবয়বে। তাঁকে বলা হলো দেশে ফেরার জন্যে। তিনি বললেন, এখন আমার যাওয়া হবে না।'

ক'দিন পর সাথীরা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী (রঃ) এঁর কাছে ব্যাপারটি জানালেন। যাতে তিনি তাঁকে ঘরে ফেরার জন্যে বলেন। তিনি সাথে সাথে বললেন, 'সে যতদিন এখানে থাকতে চায় থাকুক। সাথে তোমরাও থাকো। কিংবা তোমরা তাকে রেখে চলেও যেতে পারো।'

সাথীরা তাঁর সাথে মদিনায় থাকলেন।

'মদিনায় থাকার সময় আমাকে বলা হলো, "আমার দ্বীনের কাজ তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেব।" বলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ)।

তিনি বলেন, 'এ কথা শোনার পর আমি দুঃশ্চিন্তার ভারে নুয়ে পড়ছিলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না যে কী করে আমার মতো অসুস্থ, দুর্বল, অসহায় মানুষ দ্বীনের কাজ করবে? আমি ছটফট করছি। এক অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠছে দুরু দুরু করে। এক রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটে যাবার আগে আকাশে বাতাসে প্রকৃতিতে চাপা ফিসফিসানি। তখন আমি একজন প্রাজ্ঞ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে গেলাম। তিনি বললেন, "ভেবো না। বিচলিত হবার কিছু নেই একথা বলা হয়নি যে কাজটি তোমাকে করতে হবে। বরং বলা হয়েছে কাজটি তোমাকে দিয়ে করিয়ে নেয়া হবে। তিনি যেভাবে খুশি তার কাজ নেবেন।"

www.eelm.weebly.com

এই উত্তর শুনে তাঁর যেন ধ্যান ভেঙে হুঁশ হারালেন।

এ সময় তিনি দিনভর তাহজুদ হাতুলে পাক সাহেবের মসজিদে পবিত্র রওজা মুবারকে সময় কাটাতেন। তারপর মদিনা থেকে মক্কা এলেন হারামে শরীফ। পাঁচ মাস কাটালেন এখানে। পঁয়তাল্লিশ হিজরির হেমন্ত ঋতুতে তিনি দেশে এলেন দেশে।

হজ্জ থেকে ফিরে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ) উম্মতের জন্যে কাজের পৌঁছানোর জন্যে শুরু করলেন সফর। ইসলামের মূল কথা কালিমা নামাজ এর দিকে সাধারণ মানুষকে ডাকার জন্যে অন্যকেও অনুপ্রাণিত করলেন। এই কাজটি সবার অচেনা। এর আগে এমন ধরনের কথাও কেউ শোনেনি। কাজেই তারা বিস্মিত হলেন।

'নূহ' একটা এলাকার নাম।

সেখানে একটা সমাবেশের আয়োজন করা হলো। আশ্চর্য! বক্তব্য শেষে অনেক বেশি লোক সেখানে এলো। তিনি দাওয়াত আর তাবলীগের কাজের মর্যাদা ও গুরুত্ব পরিষ্কার করে বোঝালেন। সবাইকে যোগদান তোহমল করে হাজী করালেন। কিন্তু সবাই সময় নিলো। মাস খানেক পর তৈরি হলো একটা জামাত। জামাত পাঠানো হলো গুরগাঁয়ে। রওয়ানা হবার সময় তাদেরকে দিক নির্দেশনা দিলেন যে তোমরা এই দাওয়াতের আমালের অপরিসীম গুরুত্ব মানুষকে বোঝাও। তাদেরকে মসজিদের রাস্তায় বের করো।

জামাতটি আটত্রিশ দিন থাকবে গ্রামগুলোতে। তাঁরা পরামর্শ করলেন। সিদ্ধান্ত হলো জামাত জুম্মা পড়বে গুরগাঁও জেলার সোহানাতে। সেখানে এক সপ্তাহের কর্মসূচী তৈরি করা হবে। সোহানায় সেই জুম্মায় এলেন মাওলানা। এক সপ্তাহের কাজ বোঝালেন। পরের জুম্মা আরেকটা গ্রাম তাউরুতে পড়া হবে ঠিক হলো। তৃতীয় সফর ছিলো ফিরোজপুর তহশীলের নাগিনাতে। হযরতজী (রহ) প্রতি জুম্মায় শরীক হলেন জামাতের কাজে। গভীর আন্তরিকতার সাথে গ্রামের অনুভূতি সম্পন্ন লোকদের নবীর মেহনত বোঝালেন।

প্রথম ক'বছর মেওয়াতে এভাবেই কাজ চললো।

এ সময়ই প্রথম খুতবা বা বিশেষ দাওয়াতের আমল হলো। দ্বীনের দিক দিয়ে বড় আর দুনিয়ার সম্পদ, ক্ষমতা ও পদমর্যাদায় বড় এমন লোক, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তাদের দাওয়াতের কাজ বোঝানো হলো।

তাদেরকে বলা হলো, 'আপনারা ব্যস্ত। বয়স হয়েছে। অধিকাংশ পড়া হয়েছে। মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দ্বীন শেখার মতো অফুরন্ত সময় নেই। কাজেই আপনারা এই কাজে তার ফাঁক সময়টুকু জামাতবন্দী হয়ে একটু দূরে নির্জনে কিছু দ্বীনি মেহনত করুন। আর যেটুকু শেখেন তা নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কাছে গিয়ে তাকে শেখান।'

www.eelm.weebly.com

হিজরি তেরো শো একান্ন।

উনিশ শো বত্রিশ সাল।

মাহে রমজানের চাঁদ উঁকি দিল আকাশে। দিল্লী রেল স্টেশনে তারাবির নামাজ পড়ে করাচির ট্রেনে উঠে বসলেন মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)। সাথে আরো ক'জন। হজ্বের কাফেলা। মাওলানা ইহতিশামুল হাসানও আছেন এবারের সফরে। মক্কা শরীফ থেকে তিনি শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া (রঃ) কে চিঠি লিখলেন, যে, 'মাওলানা বেশির ভাগ সময় কাটাচ্ছেন হেরেম শরীফে। ঘন ঘন লোকজনের সাথে বসছেন। আলোচনা করছেন দাওয়াতের আমালের গুরুত্ব সম্পর্কে। আল্লাহর হুকুম আর নবীর তরিকায় মানুষের একমাত্র সফলতা এই কথাও বলছেন। এর আগে কোনো আধ্যাত্মিক সাধক তাঁর শিষ্য বা ভক্তদের ঘরবাড়ি, পেশা, চাষাবাদ ছাড়তে বলেননি। যদিও তা সাময়িক। সবাই অবাক হচ্ছে। এই অচেনা বিষয়টি বুঝতে অনেক সময়ের দরকার। আর হঠাৎ বের হওয়া বেশ ঝুঁকিপূর্ণ।'

কাজেই সাড়া এলো খুব কম।

হিজরি বায়ান্ন, মুহাররাম ছয়।

উনিশ শো তেত্রিশ খৃষ্টাব্দের সাতাশ এপ্রিল।

হযরতজী (রঃ) মক্কা থেকে মদিনা মানোয়ারা এলেন। দীর্ঘদিন এখানে রইলেন। জিয়ারত হলো। দুই জমাদিউল উলায় ফিরে এলেন হিন্দুস্থানে।

তাবলীগের কাজের ব্যাপারে এই সফরে তিনি অনেক বেশি আস্থা পেলেন। তাই ফিরে এসেই কাজের গতি ও চৌহদ্দি বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর ব্যাকুলতা, তাঁর সুতীব্র আবেগ, উম্মতের দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির জন্যে প্রচন্ড আকুলতা ছাপিয়ে লক্ষে পৌছানোর জন্যে দুর্দমনীয় করে তুললো তাঁকে। তিনি এমন মেহনত শুরু করলেন যেন মৃত্যুকে বরণ করে নেবেন। দিবারাত্রি একটানা, এক নাগাড়ে খেটে চললেন। উম্মতের হেদায়াতের লক্ষে। উন্মাদের মতো ছুটে চলেছেন মানুষের কাছে। যোগাযোগ করছেন। বোঝাচ্ছেন। সময় বের করে নিচ্ছেন।

একবার মেওয়াতে যাবেন। এক মাসের জন্যে। তৈরি করলেন একশো জন বা তার কিছু বেশি লোককে। বেশ কটা জামাত তৈরি করে গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। তিরিশ দিনের মেহনতে বিপুল সাড়া পাওয়া গেল। বিশাল সব সমাবেশ হয়ে যেত। আরেকটা জামাত তৈরি হলো এক মাসের কিছু কম সময়ের জন্যে। একশো দেড়শো সাথী সহ। এবারে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠলো মেওয়াতে।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রঃ) মেহনতে মাঠে নামলেন।

মরণপদ।

www.eelm.weebly.com

তারপর।

দিনের পর দিন।

জ্ঞানের খাটুনি। মাল অকাতরে খরচ। আর কান্নাকাটি করলেন তিনি।

এবার হযরতজী (রঃ) বুঝতে পারলেন গাঁয়ের গরীব চাষাভূষোদের নিদারুণ বাস্ত তা থেকে বের হয়ে দ্বীন শেখা খুব কষ্টকর। বাঁচার জন্যে, খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে দিনরাত তাদের খাটাতে হয়। তাদের আয় হচ্ছে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। কাজেই পরিচিত পরিবেশে থেকে রুজি রোজগারের টানাটানির মাঝে সামান্য সময় যদি তারা বেরও করে তবু আমাল ও দ্বীন শেখার সাধনায় পুরো মনোযোগ দিতে পারবে না। তাতে জীবন গতিপথের পরিবর্তন সম্পূর্ণ আসে না। দ্বীন ইসলামের গাঢ় জ্ঞান পায় না।

তাছাড়া সংসারের দায়িত্বে থাকা বয়স্ক লোকেদের মাদ্রাসা বা মক্তবে ভর্তি হবার জন্যে বলা অবাস্তব হয়ে যায়। কাজ কাম ছেড়ে সারাক্ষণ মাদ্রাসায় দ্বীনি ইল্‌স শিখুক এমন আশা করাও ঠিক নয়।

ওদিকে ওয়াজ নসিহত শুনে মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন চলে আসা প্রায় অসম্ভব। ওয়াজ নসিহতের প্রভাব থাকে দু'একদিন বড় জোর হপ্তাখানেক। তাতে হাতে কলমে দ্বীন শেখানো সম্ভব হয় না। ফলে প্রচলিত আঁধার জীবন থেকে বেরিয়ে হেদায়েতের পথে চলা শুরু করা আর তাদের আচার আচরণ, অভ্যেস, স্বভাব, মেজাজ ও আবেগ বদলে যাওয়ার আশা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

তাহলে উপায়?

কী করে পথ পাবে উম্মত?

কী এমন পদ্ধতি নিলে দ্বীন ইসলামের গভীর বুঝ অন্তরে গেঁথে যাবে? বদলে যাবে মূর্খতা আর অজ্ঞতার জীবন। প্রবেশ করবে নূরের বা আলোর জীবনে।

কোন সে পথ।

মানুষের মুক্তির জন্যে দ্বীনি কোনো বিপ্লব খুবই দরকার। কিন্তু ধরনটা কি হবে? কোন নিয়মে কাজ করলে দ্রুত একটা পরিবর্তন আসবে জগত জুড়ে?

শেষমেষ তিনি একটা সিদ্ধান্ত নিলেন।

তা হচ্ছে দ্বীন ও ঈমান সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষকে তার পরিচিত পরিবেশ, নিয়মের কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা সমাজ থেকে টেনে নিয়ে যেতে হবে দ্বীনি পরিবেশে, জ্ঞানের সমাজে। যেখানে তারা দেখে দেখে হাতে কলমে দ্বীন শিখবে। দ্বীনদারদের দেখবে। দেখবে তাদের শান্তিময় আলোকিত জীবন। তখন তারা উৎসাহিত হবে। আগ্রহী হবে। ফের এই দ্বীনি পরিবেশ থেকে বের করে জামাত আকারে অজ্ঞ, মূর্খ, জনতার মাঝে

www.eelm.weebly.com

পাঠাতে হবে। দেখবে তাদের দৈন্য। তাদের শোনাবে দ্বীনের কথা, শেখাবে কালিমা তাইয়্যেবা আর নামাজ। তখন দ্বীনি মহল থেকে শেখা ঈমান ও নামাজ তাদের নিজদের মধ্যে পাকাপোক্ত হবে। সুদৃঢ় হবে। আর দ্বীনের উন্নতির জন্যে চিন্তান্বিত হবে। দ্বীনহীন মানুষের অজ্ঞতা ও মূর্খতা দেখে ব্যথিত হবে।

তাছাড়া দ্বীনি পরিবেশের কেন্দ্রগুলোতে ওরা জামাত আকারে গিয়ে ওখানকার বড় বড় পীর, বুজুর্গ, আলিম আর সাধক পরুষদের কথা শুনবে। দেখবে তাদের সাধনা, রাত্রি জাগরণ, ইবাদাত, আমল আখলাক ও জীবন যাপনের ধারা। শিখবে দ্বীন। যেমন শিশু শেখে মায়ের কাছে। প্রকৃতির কাছে। পরিবেশের কাছে। পৃথিবীতে শেখার মৌলিক যা নিয়ম সেভাবেই এরা শিখবে দ্বীন। তারপর চর্চার মাধ্যমে গড়ে উঠবে ইসলামী জীবন ধারা।

প্রচুর সময় নিয়ে বের হয়েছে তারা। কাজেই পূর্ণ একাগ্রতার সাথে শিখবে শরীয়তের নিয়ম কানুন, ফজিলতের ও মাসায়েলের ইল্‌ম। শুনবে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আজমাঈনদের জীবন কাহিনী। জানবে তাদের আত্মত্যাগের মহান ঘটনা। গভীর একাগ্রতার সাথে এগুলো শুনলে তার প্রভাব পড়বে অন্তরে। উদ্বুদ্ধ হবে দ্বীনের ওপর চলার জন্যে।

এক্ষেত্রে বছরের পর বছর মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে প্রায় সম্পূর্ণ সময় দিয়ে যে ফল পাওয়া যায় না তারচেয়ে অল্প (চার মাস চল্লিশ দিন) সময় খরচ করে প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া নিয়ে ঘরে ফিরে নিজ নিজ কর্মে মন দিতে পারবে একজন মানুষ। এবার সে সংসার করবে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের হুকুম আর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ মতো।

এই মানুষটি সময় লাগিয়ে ঘরে ফিরে এসেছে এখন নতুন আখলাক নতুন আমল নিয়ে। ফেরেশতা তূল্য!

কারণ একটানা অনেকদিন নিরালায় (মসজিদে) থেকে একাগ্রচিত্তে দ্বীনি মানুষ দেখে, তাদের কাছ থেকে শিখে, তাদের প্রভাব অন্তরে নিয়ে ফিরে এসেছে সে।

বিরাট এক অন্তর্বিপ্লব ঘটে গেছে। নীরবে।

অনেক ভেবে এই সিদ্ধান্তে এলেন হযরতজী (র)। যে মানুষকে কিছুদিনের জন্যে বের হতে তার ঘর থেকে। থাকবে মসজিদে। দ্বীনি পরিবেশে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? কে সমাধা করবে এই দুরুহ কাজ?

ব্যস্ত মানুষ!

ব্যস্ত পৃথিবী।

আর এ পদ্ধতি একেবারে আনকোরা। দু'একজন আধ্যাত্মিক সাধককে বাদ দিলে এ কথা বলাই যায় যে কোনো তরীকত ও মারেফাতের পীর তাঁর ভক্ত বা শিষ্যকে এতো বড় কঠিন মুজাহাদায় ফেলবেন না। রুজি রোজগারের ব্যস্ততা, কর্মমূখর জীবন,

www.eelm.weebly.com

বিলাসী পরিবেশে বড় হওয়া, তাঁকে আরো উন্নত করার জন্যে চেষ্টায় পাগলপারা মানুষকে জিনিষ বা বস্তু থেকে ফিরিয়ে আল্লাহর পথে ডাকা, তাতে তৈরি করা এসব ছেড়ে ছুড়ে যাবার জন্যে-এ প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। আর যাদের ওপর হযরতজী এ নিরিক্ষা চালাবেন তারা অনেক কষ্ট ও সাধনার পর মাত্র সামান্য ছোঁয়া পেয়েছে দ্বীনের। কিভাবে এদের রাজী করাবেন?

রাজী হলেও এদের সামনে রয়েছে আরেকটা সমস্যা। তা হচ্ছে যেখানে পাঠানো হবে সেখানের মানুষেরা কি এদের গ্রহণ করবে? ভালবেসে তুলে নেবে বুকে? দেবে দ্বীনের আশ্রয়? নাকি এদের অশুদ্ধ ব্যবহার, চরিত্র আর আনাড়ি চালচলনে তাদের অস্বস্তি হবে। ঠেলে দেবে দূরে! তাদের মুর্খতা, সরলতা আর অজ্ঞতায় ওরা যদি রাগ হয়, টিটকারী করে, দূর দূর করে সরিয়ে দেয়। তাহলে তো এই সরলমনা মেওয়াতিদের মন ভেঙে যাবে।

উত্তর প্রদেশের পশ্চিমে মুজাফফর নগর আর সাহারানপুর। এ দুটো স্থানে রয়েছে সব ওলামায়ে কেরাম আধ্যাত্মিক সিদ্ধ পুরুষদের আবাস। দ্বীনের প্রাণকেন্দ্র। ওদের দ্বীনি ইলমের এই লালনভূমিতে এনে এঁদের সাথে রাখলে খুবই ফায়দা হতো। কিন্তু ওনাদের অন্তরে কি এদের জন্যে কোনো মমতা হবে?

অনেক ভেবে তিনি পরিবেশ পরিবর্তনের জন্যে পছন্দ করলেন সাহারানপুর এলাকাকে। এটা একটা ধর্মীয় কেন্দ্র। এখানে নিয়ে এক নাগাড়ে ক'দিন দ্বীনি চর্চা করলে মন মানসিকতা আর আমালের পরিবর্তন আসবে। তারপর গড়ে উঠবে নিয়মিত আমালের অভ্যেস।

হযরতজী (রঃ) ভাবতেন দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের মূর্খতা, ইসলাম সম্পর্কে অবহেলা আর অজ্ঞনতা, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মমতা ও ভালবাসা না থাকা হচ্ছে যাবতীয় ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মূল কারণ। সেজন্যে দরকার দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞান, আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিষ্কার পরিচয় সামনে আসা।

এতো বিশাল ও ব্যাপক যোগ্যতা আসার জন্যে চাই নিরিবিলি সময় ও মন। তা একমাত্র সম্ভব ঘর ছেড়ে, ব্যস্ততা ছেড়ে ক'টা দিনের জন্যে নেক পরিবেশে যাওয়া। কিছুদিনের জন্যে দুনিয়াদারি ছাড়া আর দ্বীন প্রচারের লক্ষে কষ্ট ও মেহনত করা।

হয়তো তাতে আসতে পারে এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

এ নিয়ে তিনি মিয়াজি মুহম্মদ ঈসা সাহেবকে এক চিঠিতে লিখলেন--

বন্ধু,

সব অপকর্মের আসল কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা, অলসতা আর অজ্ঞানতা। ধর্মের উন্নতির জন্যে চেষ্টা করা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার কারণে দুনিয়া জুড়ে যে কতো নতুন পাপ আর বিপর্যয় তৈরি হচ্ছে তার হিসেব কে রাখে? তাদের অলসতা আর অপকর্মে

www.eelm.weebly.com

পৃথিবী জুড়ে কতো অন্যায় ও অশুভ ছড়িয়ে পড়ছে আর নতুন কতো বিপর্যয় ও পাপ স্রোতের প্রকাশ পাবার পথ পেয়ে যাচ্ছে তা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই ভালো জানেন। এসব থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে দরকার নষ্ট হবার পরিবেশ থেকে সরিয়ে পথহারা মানুষকে নিরালায় নিয়ে, ধর্মীয় আদর্শ, প্রেরণা ও কর্মের আলোচনা শোনানো। তাদের চেতনাকে বদলে দেয়া।'

হযরতজী (রঃ) আশা করছিলেন যে, তাঁর এ দাওয়াতী বিপ্লব ওই এলাকার যাঁরা সত্যিকার আলিম ও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মাশায়েখ তাঁদের সহানুভূতি, সহযোগিতা পাবে। বিশেষ করে দূর মেওয়াতের অসহায়, অজ্ঞ, মূর্খ, সরল মুসলমানদের দ্বীনি কি হাল তা তাঁরা জানতে পারবেন। চমকে উঠবেন তাঁরা। মুসলমানের এমন অধঃপতন আর অজ্ঞতা দেখে হবেন বেদনার্ত। তখন তাঁদের ভূমিকা তারা নেবেন। কমপক্ষে এই দুর্ভাগা মুসলমানদের জন্যে একটা মমতা জাগবে তাঁদের অন্তরে।

তিনি ভাবতেন দ্বীনের উন্নতির এতো বিশাল ও মহান আন্দোলনের হেফাজত ও এগিয়ে নেয়ার জন্যে আলিম ও সুফী সাধক সমাজের সাহায্য ও সহযোগিতা খুব দরকার। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে, এ বিপ্লবের পেছনে জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞ ও সুধীবৃন্দের দেখাশোনা না থাকলে আন্দোলন বিপদজনক ও ভয়ঙ্কর দিকে মোড় নিতে পারে।

সেজন্যেই তিনি জামাত কান্দালা, তাঁর জন্মভূমি ও মাতৃভূমিতে পাঠানোর ইচ্ছে করলেন। এটি তাঁর নিজের শহর। এখানে তাঁর আত্মীয় স্বজন ভরা। এখানে ঘরে ঘরে আলিম ও মাশায়েখ বৃন্দ রয়েছেন। দ্বীনি ও জ্ঞানীদের প্রাণকেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত।

কিন্তু বাধ সাধলেন সবচেয়ে বড় সুহৃদ, পুরনো ছাত্র, হযরতজী (রঃ) এঁর সার্বক্ষণিক সাথী মেওয়াতী হাজি আবদুর রহমান।

তিনি বললেন, 'ওটা আমার আধ্যাত্মিক শিক্ষক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সাহেবের এলাকা। এখানে তাবলিগে যাওয়া সাজে না।'

এ ধরনের কথা বলার কারণ ছিলো সাধারণ মানুষ এবং বিজ্ঞজনও এ কথা ধারণা করতো যে তাবলিগ মানে অন্যের সংশোধন। অন্যকে শেখানো। সেক্ষেত্রে নিজ শিক্ষকের পাড়ায় গিয়ে অন্যের সংশোধন এক ধরনের বেয়াদবী। সেজন্যেই হাজী সাহেব যেতে চাইলেন না। কান্দালায় যাবার জন্যে জামাত তৈরি হচ্ছে, কথাটা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। অজ্ঞ, মূর্খ মেওয়াতিরা যাবে দ্বীনের প্রাণকেন্দ্র কান্দালায় জামাত নিয়ে। সে কী করে হয়? ব্যাপারটা বড় কঠিন আর অস্বাভাবিক মনে হলো সবার কাছে।

আসলে হযরতজী (রঃ) এঁর দূরদর্শিতা, সার্বিক উদ্দেশ্য সবার সামনে পরিষ্কার ছিলো না। এখানে গিয়ে মেওয়াতিরা দ্বীনি পরিবেশের প্রভাব নেবে। নিজেদের ধর্মীয় দৈন্য বুঝতে পারবে। আর কিভাবে দ্বীনি পরিবেশ গড়ে তোলা যায় তার প্রেরণা নিয়ে বাড়ি ফিরবে--- সাথীরা এসব দিকগুলো ঠিকমতো ঠাহর করতে পারেনি।

www.eelm.weebly.com

হযরতজী (রঃ) এঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা কতো সঠিক ছিলো তা আজ অনেক বুঝতে পেরেছে। তবে পুরোপুরি স্বচ্ছ নয়। এ কাজটা করতে করতে বুঝে আসে।

হযরতজী (রঃ) গভীর স্তরের মানুষ। তাঁরা কথা শুধু 'কথার কথা' ছিল না। তিনি জামাত তৈরির ব্যাপারে অনমনীয় রইলেন। তাঁর ঘুম, বিশ্রাম হারাম হয়ে গেল। এমনি ছিলেন তিনি সারা জীবন। একটা সিদ্ধান্তের শেষ না দেখে ছাড়তেন না। তিনি তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব, প্রভাব আর কৌশল খাটিয়ে তৈরি করে ফেললেন জামাত।

প্রথম আলো

ওরা দশজন।

জিম্মাদার হলেন হাফিজ মকবুল হাসান। জামাত তৈরি। রমজানের উদ্যোগ সফলতার মুখ দেখলো। ঈদের নামাজ পড়ে রওনা হয়ে গেল জামাত। কান্দালার উদ্দেশে। জামাতটি ছিলো বিশেষভাবে নির্বাচিত। প্রতিটি সাথীকে হযরতজী (রঃ) নিজ তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে যথেষ্ট যোগ্য তৈরি করেছিলেন। এরা মাহে রমজানের শেষ দশ দিন ইতেক্বাফ করেছিলো। তাদেরকে জিকিরের ব্যাপারেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছিল।

কান্দালার মানুষ জামাতটিকে গভীর ভালবাসায় স্বাগতম জানালো। একটা খালি ঘর ছিলো আম্মিবি এঁর। সেখানে এদের থাকার ব্যবস্থা হলো। মেহমানদারি করা হলো খুব সম্মান ও আন্তরিকতার সাথে।

শাহ আবদুর রহিম রায়পুরী (রঃ) হচ্ছেন উপমহাদেশের এমন একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব যাঁর আত্মিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা ছিল অসাধারণ উঁচু পর্যায়ের। তাঁর এলাকা হচ্ছে রায়পুর। তাঁর আধ্যাত্মিকতার প্রভাব এই এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। রায়পুরে অত্যন্ত প্রভাবশালী দ্বীনি ও রুহানী পরিবেশ।

শাওয়াল মাস। তেরোশো বায়ান্ন হিজরি।

হযরতজী সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত রায়পুরে দ্বিতীয় জামাতটি পাঠানোর উদ্যোগ নিলেন। অবিরাম পরিশ্রম, চেষ্টা আর দোয়ার বরকতে জামাত ঠিকই তৈরি হয়ে গেল। এগারো জনের। সাথে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ)।

হযরতজী (রঃ) ও জামাতের জন্যে রায়পুর খুবই উপযুক্ত জায়গা। কারণ হযরতজী (রঃ) এঁর সাথে শাহ আবদুর রহিম রায়পুরী (রঃ) এঁর গভীর সম্পর্ক ছিলো। ওখানে তখন রয়েছে মাওলানা আবদুল কাদির। তাঁর সাথে হযরতজী (রঃ) এঁর চিন্তা ও চেতনার বিরাট ঐক্য রয়েছে। আর আছে গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক।

এই জামাতটিতে ছিলেন কাজের উসুল সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী আজকের জগদ্বিখ্যাত মিয়াজী মেহরাব মাদ্দাজিল্লুহুল আলী। তিনি অসুস্থ ছিলেন। ভয়ংকর

www.eelm.weebly.com

নিউমোনিয়া আক্রান্ত। হযরতজী (রঃ) তাঁকে যেতে মানা করলেন। তিনি বললেন, 'না, আমি যাবো। এই মোবারক জামাত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবো না। হযরতজী (রঃ) বললেন, 'ঠিক আছে। তবে আজ নয়। কাল সুস্থ হলে চলে এসো।'

মিয়াজী খানিকটা অবাক হলেন। তাঁর সুতীব্র অসুখ। কাল সুস্থ হবার তো সম্ভাবনাই নেই।

কিন্তু পরদিন সত্যিই সুস্থ হয়ে গেলেন মিয়াজী মেহরার (রঃ)।

তিনি উড়ে চলে এলেন জামাতে।

ওদিকে।

আরেকটা মর্মান্তিক ঘটনা।

ক্বারী দাউদ (রঃ) ছিলেন ওই জামাতের আরেকজন সাথী। তাঁর বাচ্চা মারা গেল জামাত রওনা হবার দিন। তিনি শিশুটিকে গোসল করালেন, খুশ্‌বু মাখালেন, কাফন পরালেন। জানাজা পড়ানো হলো। নিজ হাতে দাফনের কাজ সারলেন। তারপর শোক সন্তপ্ত, বিরহ বিধুর পরিবারের কারো সাথে দেখা না করে, বাড়ি না ফিরে সরাসরি চলে এলেন জামাতে।

শুরু হলো সেই প্রবল ক্ষমতাধর কোরবানীর জীবন। আত্মত্যাগের মহড়া। আল্লাহ তায়ালা রাব্বুল আলামিনের তাঁর বান্দার জন্যে মনোনীত, সবচেয়ে প্রিয় জীবন যাপন। শুরু হলো মিথ্যার পরাজয়ের আর সত্যের জয়ের দিন। ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবার দিন। দিকে দিকে।

অসুরপুরে সুরে উঠেছে

বসে থাকার মানুষ নয় হযরতজী (রঃ)।

রায়পুরের সফরে অভাবনীয় সাফল্যের সাথে সাথেই নতুন কর্মসূচি তৈরি করে ফেললেন। এবার ফের মেওয়াতে। ওখানে মানুষের ময়দানে ব্যাপক চাষাবাদ করতে হবে। উদ্দেশ্য অন্তরের জাগরণ। পরকালের সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরি করা। মানুষের সাথে দয়ালু আল্লাহতায়ালার পরিচয় করে দেয়া। দয়াময় নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মদানের কথা স্মরণ করানো।

তিনি মেওয়াত এলাকার সব তহশীলের মানচিত্র তৈরি করালেন। এতে বৃহত্তর গুরগাঁও জেলাও বাদ পড়লো না। মানচিত্রে যাওয়া আসার পথ চিহ্নিত করলেন। দিক ঠিক করে দিলেন। সাথীদেরকে বললেন–

তোমরা কাজ কিভাবে করলে তার বিবরণ লিখবে। কি কি কাজ করবে তাও লেখো। একেকটা গ্রামের জনসংখ্যা কতো, আবাদি কতো, এক গাঁ থেকে আরেক

www.eelm.weebly.com

গাঁয়ের দূরত্ব কতো? বড় বড় গ্রাম ক'টা? গাঁয়ের জিম্মাদার কে? কোন গাঁয়ে বেশিভাগ মানুষ কোন সম্প্রদায়ের এসব লিখবে।'

সাথীরা ঠিক ওভাবেই সবকিছু সেরে ফিরে এলো ক'দিন পর।

এবার ফিরোজপুর এলেন হযরতজী (রঃ)।

বেশ ক'দিনের টানা মেহনত ও প্রচেষ্টার পর একটা সমাবেশ বা ইজতিমা কায়েম হলো। এই ইজতিমা থেকে জামাত তৈরি হলো মোট ষোলটি। প্রতিটি জামাতের একজন করে আমির হলো। প্রতি চার জামাতের জন্যে তৈরি হলো একজন করে প্রধান আমির। এদেরকে গোটা মেওয়াত এলাকা চষে ফেলার জন্যে পাঠানো হলো। এমনভাবে এদের চলার পথ করে দেয়া হলো যাতে প্রতিটি জামাতের পুরো মেওয়াত সফর একবার হয়ে যায়।

প্রথম চার জামাতকে পাঠানো হলো পার্বত্য এলাকায়।

দ্বিতীয় চার জামাতকে পাঠানো হলো পাহাড় ও পথের মাঝখানের এলাকায়। এখানে প্রচুর মানুষজন রয়েছে।

চার জামাতের তৃতীয়টিকে হোডল থেকে দিল্লী যাবার রাস্তায় ও ইলোর থেকে দিল্লী যাবার পথের মাঝামাঝি জায়গায় পাঠানো হলো।

চতুর্থ চার জামাতকে হোডল থেকে দিল্লী যাবার পথে ও যমুনার মাঝামাঝি জায়গায় পাঠানো হলো।

জামাতকে এভাবে ভাগ করে পাঠিয়েই থেমে থাকলেন না হযরতজী (রঃ)। নিয়মিত লোক পাঠিয়ে খোঁজ খবর নেয়া হতো। তাদের শিক্ষা দীক্ষা, থাকা খাওয়ার যাতে সমস্যা না হয় সেসব দেখাশোনা করা হতো। এদের মাঝে বয়ান রাখার জন্যে নিজামুদ্দিন থেকে যোগ্য লোক পাঠানো হতো।

প্রচণ্ড মেহনত করে অবশেষে জামাতগুলো এসে হাজির হলো ফরিদাবাদ। এখানে আয়োজন করা হলো এক সমাবেশ। হযরতজী (রঃ) এলেন। বিশাল সভা। মর্মস্পর্শী বয়ান রাখলেন মাওলানা (রঃ)। অনেক লোক তাশকীল হলো। এখানেও ষোলটি জামাত তৈরি হলো। এটাকেও আগের মতো চারটি ভাগে ভাগ করা হলো। একেকটা 'চার জামাত' দিল্লীর চারপাশে মেহনত করে দিল্লী জামে মসজিদে জড়ো হলো। বিরাট সমাবেশ। তৈরি হলো বেশ কিছু জামাত। সেসব জামাত চলে গেল পানিপথ, সোনিপথ ও অন্যসব এলাকায় উদ্দেশে।

হযরতজী (রঃ) চেয়েছিলেন, মানুষ আল্লাহতায়ালা রাব্বুল আলামিনকে রাজিখুশি করার জন্যে নিজেদের ঘর সংসার, খেত-খামার, ব্যবসা, বাণিজ্যের লোকসান সহ্য করতে শিখুক। সেজন্যে সে এসব ছেড়ে ক'টা দিনের জন্যে বের হয়ে পড়ুক আল্লাহর রাস্তায়। হিজরত এর নকশার ওপর থেকে ঈমান ও নামাজ শিখুক। কোরান সহি করে পড়তে শুরু করে দিক। যেমনটি আগের দিনের মুসলমান করতেন। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু

www.eelm.weebly.com

তায়ালা আনহুদের আদর্শ ফের ও যুগের মুসলমানের ভেতর আসুক। তাঁদের মতো ত্যাগী, কোরবানী দেনেওয়ালা হোক। তিনি হিযরতের লাভ আর দ্বীনের জন্যে কোরবানী দেয়ার পুরস্কারের আলোচনা মেওয়াতিদের কাছে ব্যাপকভাবে করতেন। এ আলোচনা তাঁর চলতো বিরামহীনভাবে। চলা, ফেরা, ওঠা, বসায় ওই একই বক্তব্য, একই আওয়াজ। এসব আলোচনার জন্যে মেওয়াতের বিভিন্ন এলাকায় তিনি লোক সমাগত করলেন। হিজরতের আর দ্বীন ইসলাম শেখার জন্য সফরের ফজিলত শোনালেন।

'একমাত্র এই কাজ, এই রাস্তায় মুসলমানের দু'দুনিয়ার যাবতীয় সফলতা লুকিয়ে রয়েছে। তোমরা একথা বিশ্বাস করো-'এই গৎ বাঁধা বুলি তিনি সবার সামনে, সব জায়গায়, সব অবস্থায় আর সব সময় দিতে লাগলেন। তাঁর একই দাবী একই আবেদন। আকুল আর ব্যাকুল সুরে হৃদয়ের সব আবেগ ঢেলে তিনি খোশামদ তোষামদ করে চলেছেন।

তাঁর এই বিরামহীন চেষ্টা, আপ্রাণ মেহনত আর প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসের প্রভাব ধীরে ধীরে সমাজের মানুষের ভেতর প্রবেশ করলো। এই অসম্ভব ও অসামাজিক কাজটি সবার জন্যে আস্তে আস্তে সহজ হয়ে গেল।

মানুষ আল্লাহর রাস্তায় পূর্ব জামানার মতো, জান, মাল ও মহামূল্যবান সময় নিয়ে বের হতে শুরু করলো। তাঁর (রঃ) এর আত্মার আগুন অনেক আত্মায় প্রবেশ করলো। মেওয়াতে অনেক জামাত গেল বাইরে থেকে। বাইরের বিভিন্ন জায়গায় মেওয়াতিদের জামাত গেল। আস্তে আস্তে দূর দূরান্তে জামাত যাওয়া শুরু হলো।

চৌদ্দশো বছর পর ফের মানুষ শুধু আল্লাহকে রাজী খুশি করার জন্যে জান মালের কোরবানী দেয়া শুরু করলো। চারদিকে সমাবেশ আর জলসা শুরু হলো। অন্য সময় চাঁদা হতো টাকা পয়সা। এক্ষেত্রে চাঁদা হলো 'সময়' দেয়া। আর জীবন ও অর্থ পীর বুজুর্গ নয় নিজের পেছনে খরচ করে দ্বীন শেখার অভ্যেস গড়ে তোলা। অনেকদিন পর মেওয়াতে আবার ও সুন্নত জীবিত হলো। মানুষ বিপদ ও অসুবিধার ঝুঁকি নিয়ে বের হলো আল্লাহর পথে।

খুশির খবর এই যে, যদিও তারা ঝুঁকি নিয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের কোনো অসুবিধে বা বিপদে ফেলেননি। তাদের সংসারে, খেতে, খামারে, ব্যবসায় কোনো ক্ষতি হয়নি। উল্টো তারা ঘরে ফিরে আশ্চর্য হয়ে দেখেছে ক্ষতি তো হয়ইনি বরং লাভ হয়েছে।

খেতে-খামারে, ব্যবসা-বাণিজ্যে দেখা দিয়েছে অবিশ্বাস উন্নতি।

কারণ-

আল্লাহতায়ালা রাব্বুল আলামিনের অদৃশ্য সাহায্য অবতীর্ণ হয়েছিলো। যা যুগে যুগে বার বার হয়েছে।

'ইনতানসুরুল্লাহ ওয়া ইয়ানসুরুকুম...

www.eelm.weebly.com

মেওয়াত।

সূর্য ধীরে ধীরে উঠছে। ওপরের দিকে।

ক্রমশঃ দূর হয়ে যাচ্ছে গাঢ় আঁধার।

বিশাল এক বাহিনী। তাদের কাঁধে ভারি বোঝা। পোশাক মলিন। চেহারা জ্যোতির্ময়। চোখে আশার আলো। মাথায় পাগড়ি। বিশাল। তাদের ভেতর চলেছে চিন্তার ঝড়। উম্মতের কী হবে? মানুষের মুক্তির উপায় কি?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যথা বুকে নিয়ে ওরা ঘোরাফেরা করছে। এক গাঁ থেকে আরেক গাঁ। এক শহরে থেকে আরেক শহর। মেওয়াতের এক সীমা থেকে আরেক সীমা। এদের আত্মার আগুন এমনভাবে সর্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়লো যে গোটা মেওয়াত দ্বীনের ওপর ঝুঁকে পড়লো। এমনি এক নিরব বিপ্লব ঘটে গেল এই সুবিশাল জনবসতিতে যা গোটা দুনিয়ায় অনেকদিন ধরে ঘটেনি।

কয়েক শো বছরের আঁধার যা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিলো তা অল্প কদিনেই দূর হয়ে গেল। এক প্রদীপ থেকে শত শত হাজারে হাজার নিভন্ত প্রদীপ জ্বলে উঠলো যেন পলকে। আলোয় আলোয় ভরে গেল অজ্ঞাত, অখ্যাত জনপদ। মেওয়াত।

কোনো সন্দেহ নেই যদি একটা ইসলামী রাষ্ট্র হাজার হাজার বেতনভুক্ত দ্বীনের দাঈ রেখে বছরের পর বছর এমন অজ্ঞতা মুর্খতার চরম পরাকাষ্ঠা কোনো জনপদে দ্বীন প্রচারের জন্যে মেহনত করতো, তবে এতো বড় পরিবর্তন আসতো না। কারণ সেটা হতো টাকার কারণে। তাতে থাকতো এখলাসের অভাব।

যদি সুবৃহৎ সব মাদ্রাসা কায়েম করে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রপতি বড় বড় ওলামায়ে কেরাম উঁচু মানের বেতন দিয়ে ওই এলাকার দ্বীনি ইলম শেখার অমল স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা আনার চেষ্টা করতো তবে অবশ্যই তারা ব্যর্থ হতো।

কারণ ওখানে কর্মের পেছনে, ত্যাগের পেছনে কাজ করছে টাকার ইশারা। তাতে থেকে যেতো প্রাণের স্পন্দন। আত্মার চেতনার বৈপ্লবিক পরিবর্তন কোনো বস্তুবাদী জিনিষ দিয়ে হয় না। যেমন সম্পদ, অর্থ, ক্ষমতা আর বুদ্ধির কাজ নয় এটা। তার জন্যে দরকার সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এরাদা বা ইচ্ছা। কারণ তিনি 'হও' বললেই হয়ে যায়। আর আল্লাহ পাক তার ইচ্ছা হেদায়েত আসার পক্ষে করেন। যখন মানুষ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী মেহনত বা প্রচেষ্টা চালায়।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেদায়াত আনার জন্যে কী বা কোন পথ ধরেছিলেন? এ ব্যাপারে তাঁর আদর্শ কী ছিলো?

দাওয়াত।

www.eelm.weebly.com

একমাত্র জবাব।

মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাওয়া। নিছক আল্লাহ পাককে রাজী করার জন্যে। নিজের জান ও অর্জিত হালাল মাল বা অর্থ নিয়ে যখন দায়ে ঠেকার মতো আমরা মানুষের দুয়ারে হাজির হবো, নিজের ব্যক্তিত্ব, সামাজিক মান মর্যাদা বিলীন করবো, তাদের রূঢ় আচরণ, বিদ্রূপ, টিটকারি এমনকি মারধর খাবো-তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের ওপর আমাল করা হলো।

তখন এই চেতনার পরিবর্তন আসবে।

মদখোর তাহাজ্জুদ পড়বে।

জুয়াড়ি হালাল রুজি করবে।

বেনামাজি নফল ইবাদাত করবে। ফরয তো আছেই।

দাঁড়িয়ে পেশাব করনেওয়ালা মানুষের দুয়ারে গিয়ে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আশ্চর্য ও অভাবনীয় পরিবর্তন আসবে।

আর তাই ঘটলো মেওয়াতে।

সারা দুনিয়া জুড়ে।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে আজ থেকে চোদ্দশো বছর আগে যে পথে, যে নিয়মে ও সাধনায় দ্বীন জিন্দা করেছিলেন সেই পথের অনুসরণ করলেই ফের দুনিয়াতে দ্বীনের পূনর্জীবন ঘটবে।

হযরতজী (রঃ) হুবহু সেই পথেই এগুলেন।

ইসলামের জন্যে জীবন উৎসর্গকারী সাহাবা রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহুগণ যুদ্ধের সময় নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিজেরাই কিনতেন। দুশমনের ভিড়ে ঢুকে পড়তেন আল্লাহকে রাজী খুশি করার জন্যে। শহীদ হবার আশায়। ঠিক তেমনি দাওয়াত, ওয়াজ ও তাবলিগের কাজ করতেন স্রেফ আল্লাহ তায়ালাকে রাজী খুশি করার জন্যে। এটা তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করতেন। তাঁরা ছিলেন কর্তব্য কর্মে সৎ, আন্তরিক আর নিবেদিত প্রাণ।

তাঁদের সেই আত্মত্যাগ, নিছক আল্লাহকে পাওয়ার সাধনা, তিতিক্ষা আর জীবনের সব সুখ আহলাদের বলিদান, গোটা মানজাতিকে উপহার দিয়েছিল আশ্চর্য এক পৃথিবী!

স্বর্ণযুগ।

চৌদ্দশো বছর পর।

মেওয়াতের নীলাকাশের নিচে, কাঁচা, আর পাকা সড়কে সেই স্বর্ণযুগের ছায়া যেন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। দল বেঁধে কাতারবন্দী কাফিলা। কোথা যায় ওরা? ওদের কাঁধে মুসাফিরের ঝুলি, ছোট ব্যাগে কোরান ও কিতাব, বিছানার চাদরে বাঁধা আছে শুকনো

www.eelm.weebly.com

শক্ত রুটি, মুখে আল্লাহর নাম, মৌমাছির গুণ গুন শব্দের মতো, পুরো শরীর জুড়ে কঠোর পরিশ্রমের ছাপ, রোদে পোড়া চেহারায় অচেনা আলো। চোখে ঐশীপ্রভা।

ওরা কারা যায়?

ওদের চলার পথে কি ভেসে ওঠে না সেই বীরে মাউনার শহীদান সাহাবা (রঃ) দের ছবি। যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দিয়ে হাসিমুখে জীবন দিতে ছুটে চলেছে!

সেই রক্তাক্ত পথ ধরে ছুটে চলেছে আজ তাঁদেরই ছায়া।

ধন্য।

ধন্য আজ পৃথিবী।

ধন্য আজ মানুষ।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক হতে চলেছে আজ।

আজ অবাক পৃথিবী!

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

শুরু হলো দিন বদলের পালা।

মেওয়াতিদের মাঝে বিশাল পরিবর্তনের ঢেউ লাগলো। গোটা সমাজ তার খোলস কচ্ছপের মতো খুলে ফেলতে শুরু করলো। আস্তে আস্তে। পাথরের মতো হয়ে ছিল মানব জমিন। দক্ষ কৃষকের হাতে পড়ে ধীরে ধীরে নরম কোমল হয়ে উঠলো। চাষীরা খুবই পরিশ্রমী, অক্লান্ত, শক্তিশালি। ফলে শক্ত হাতে হাল পড়ায় ক্রমশঃ পাথুরে জমিন হয়ে উঠলো বীজ বোনার উপযুক্ত। বীজ বোনাও হয়েছে কিছু। তা থেকে আস্তে আস্তে ফসল ফলবে। পুষ্ট হবে। সজীব, সতেজ হয়ে উঠবে খেত।

এতো দিন দ্বীনের সব কটা শাখায় প্রচণ্ড চেষ্টা ও কষ্ট করেছিলেন হযরতজী (রঃ) এখন তারই বরকতে বিশাল সমুদ্রকে আল্লাহ তায়ালা রাব্বুল আলামিন সুতো দিয়ে বেঁধে দিলেন। দাওয়াত।

দাওয়াতের কাজ প্রবল হচ্ছিল মেওয়াতে। দূর হচ্ছিল যতো সব পুরনো প্রচলিত প্রথা আর কুসংস্কার। খানিকটা বাকী ছিলো সেটাও এই তাবলিগী গাশতের দ্বারা শিকড়সহ উপড়ে ফেলা হচ্ছিল। এখন ওদেরকে একথা বললেই হয় যে, 'এটা বেদাত, এটা কুফরী, ওটা শিরক আর এগুলো আল্লাহর আদেশ ও নবীর তরিকা।'

ব্যস, সাথে সাথে তারা ওটা মেনে নিত।

নাফরমানি ছেড়ে দিল।

শুরু হলো আল্লাহর আনুগত্য।

www.eelm.weebly.com

চিকিৎসক রোগীর অসুখের উপসর্গ দেখে শরীরের ভেতরের খবর নেন। দেখেন রোগের কারণটা কোথায়? সেটাকে ধরে তিনি এগোন। সময় নেয় কিন্তু রোগীর সঠিক চিকিৎসা হয়ে যায়। হযরতজী (রঃ) পুরো উম্মতের রুহানী রোগের শেকড়টা কোথায় ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তির এক নম্বরটায় মরিচা পড়েছে। ঈমানী রোগে ভুগছে। ঈমান এমন অসুস্থ হয়েছে যে চলতে ফিরতে পারে না। মুমূর্ষ। সেজন্যে ঈমানের আসল রূপ খোলা দরকার উম্মতের সামনে। দ্বীন কতো মূল্যবান! দ্বীনকে আপন করে নিলে আমরা কতো সম্মানিত হবো, আমাদের জীবনে কতো প্রশান্তি নেমে আসবে, কতো অহেতুক ঝুট ঝামেলা থেকে আমরা বেঁচে যাবো, দুনিয়া ও আখেরাতে কতো বড় ধরনের সফলতা আমাদের পায়ে চুমু খাবে– একথা উম্মতকে জানাতে হবে। এই ছিলো হযরতজী (রঃ) এঁর রোগ নিরাময় পদ্ধতি। তাদের সামনে চিরকালের পরকাল এমনভাবে তুলে ধরতেন আলোচনায় যে ওরা নিজের অগ্রহে দ্বীনের ওপর চলা শুরু করলো। ওদের ভেতর তৈরি হলো সুতীব্র পিপাসা। এবার তার তৃষ্ণার্তের কাছে ভিস্তিওয়ালাকে যেতে হচ্ছে না। পিয়াসু নিজেই পানি পানের জন্যে কুয়োর কাছে চলে আসছে।

মেওয়াতে এই যুগান্তকারী ঘটনাই ঘটলো।

এমন মেহনত তাদের মাঝে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রঃ) করেন যে তারা প্রচণ্ড উদ্দীপ্ত হয়ে নিজ থেকে অবাধ্যচারণ ছেড়ে দিলো। নিজেরাই দ্বীনের ওপর চলার জন্যে তৈরি হয়ে গেল।

যেসব পাপ তারা ছাড়লো তার এক একটার জন্যে যুগের পর যুগ চেষ্টা করা হয়েছে। কোনো ফল হয়নি। যে ধরনের পূণ্য তারা করলো তার এক একটার জন্যে বহু পথে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। কোনো পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু যুগান্তকারী এ পদ্ধতিতে রাতারাতি পরিবর্তনের ঢেউ এসে পড়লো। সমাজে, জীবনের সবখানে তার ছোঁয়া লেগেছে।

এমন সব এলাকা ছিল যেখানে অনেক এলাকা জুড়ে একটা মসজিদ ছিলো না। এখন দেখা যাচ্ছে এখানে সেখানে মসজিদ। প্রতিটি গাঁয়ে মসজিদ। প্রতি মসজিদ ঘেঁষে মক্তব। বেশ বড় বড় মাদ্রাসা। ঘরে ঘরে কোরান হাদিসের চর্চা। তালিমের শব্দ। আজানের মধুর ধ্বনিতে মেওয়াতের হাজার বছরের তিমির নিবিড় রাতের আঁধার টুটে গেল।

দ্বীনি জাগরণের এক নতুন ইতিহাস রচিত হলো।

হাজার মসজিদের মিনার মাথা তুলে দাঁড়ালো মেওয়াতে। হাফেজদের সংখ্যা বেড়ে কয়েক'শ ছাড়িয়ে গেল।

মাদ্রাসায়ে মাঈনুল ইসলাম।

মেওয়াতের সবচেয়ে বড় আর সেরা মাদ্রাসা।

www.eelm.weebly.com

তেরোশো একচল্লিশ হিজরি।

হযরতজী (রঃ) নিজ হাতে ও মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্তর গাড়লেন। এই মাদ্রাসার জন্যে সবচেয়ে খাটলেন খান বাহাদুর শেখ আজিজ উদ্দিন দেহলবী সাহেব। তিনি প্রাণের টানে খরচ করলেন নিজের মাল। অকৃপণ হাতে।

দ্বীনের জন্যে জান মাল ব্যয়কারী এই মহান মানুষটি মারা যান উনিশ শো চল্লিশ সালের চব্বিশে ডিসেম্বর।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আল্লাহ তাবারাকওয়া তায়ালা তাঁর কবরকে নূর দিয়ে ভরে দিন। তাঁকে যাবতীয় মঙ্গল ও সম্মানিত মুক্তি দান করুন। তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নাসীব করুন। আমিন।

এমনিভাবে মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়ে চললো। খানকাগুলো প্রাণবন্ত হলো। ঘরে ঘরে আলিম তৈরি হয়ে গেল। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখলেন মেওয়াতিদের বুজুর্গ শিক্ষক ও গুরুজন হযরত মাওলানা আবদুস সুবহান।

দিল্লীতে তিনি একটা মাদ্রাসা গড়লেন। নাম কারুলবাগ দারুল উলুম। ওখান থেকে দলে দলে মেওয়াতিরা আলিম হিসেবে বের হয়ে এলো।

সূর্য ঝলমলে হয়ে উঠেছে। মানুষের মন থেকে হিন্দুয়ানি আচার, পোশাক আশাকের ওপর তৈরি হচ্ছে ঘৃণা। বরং টুপি, দাড়ি, জুব্বা, লাঠি এসবের ওপর ভক্তি শ্রদ্ধা বেড়ে চলেছে। ভালবাসা এসেছে দস্তরখানায় বসে খাওয়া, ডান হাতে খাওয়া, ডান দিকে করোট ফিরে নবীর তরিকায় শোয়ার প্রতি।

আচমকা ওরা চুড়ি আর কানের দুল ফেলে দিল।

বিয়েতে চলে এলো সুন্নাত। শেষ হলো হিন্দুদের কাছ থেকে পাওয়া প্রথা আর আচার।

সুদ হারাম হয়ে গেল ওদের কাছে। মদ যেন এ এলাকার কেউ খেতোই না। দেখলে চমকে উঠছে। মিথ্যা অহমিকা আর আত্মমর্যাদার জন্যে যারা বংশ পরম্পরায় হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল তারা প্রতিশোধ নিতে ভুলে গেছে। সামাজিক অপরাধ, ব্যভিচার, চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, লুটতরাজ আর ধর্মদ্রোহীতার কোনো কিছুর আর লেশ মাত্র থাকলো না। যেন হাওয়ায় উবে গেছে অন্যায় অত্যাচার আর পাপের জলছবি।

একজন বুড়ো মেওয়াতিকে একবার ক্বারী দাউদ (রঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ভাই, মেওয়াতে কি ঘটছে এসব?'

তিনি বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে দেখছি ঘাড় ট্যারা পাপীরা গোনাহ ছেড়ে দিচ্ছে। কিছু না বলতেই। দেখছি সবাই নেক আমল করার জন্যে প্রতিযোগিতা করছে একে অন্যের সাথে। যেন কেউ যাদুর বাঁশিতে ফুঁ দিয়েছে। চারদিকে ভেল্কি লেগে গেছে। পরিবর্তনের ঝড় উঠেছে।'

এমন সরল আর সুন্দর মন্তব্য হতে পারে না।

www.eelm.weebly.com

মিয়াজি মুহাম্মদ ঈসা ফিরোজপুরিকে এক চিঠিতে তখন হযরতজী (রঃ) লিখলেন- আশ্চর্য! শ'দুয়েক মাত্র সাথী দ্বীনি পরিবেশের কেন্দ্র উত্তর প্রদেশে গিয়ে এমন প্রভাব নিয়ে এসেছে যে বোবা হয়ে যেতে হয়। ওদের সময়ই বা ক'দিন ছিলো? সামান্য।

এতোটুকুতেই এমন হয়েছে যে মূর্খ, গেঁয়ো, গোঁয়ার গোবিন্দ মেওয়াতিরা আজ দ্বীন দুনিয়াতে প্রচারের উদ্দীপনায় অবিশ্বাস্যভাবে উজ্জীবিত হয়েছে। অথচ এর আগে এসব আবেগ পাপের কাজে খরচ হচ্ছিলো। আজ এ কাজকে মানুষ, গৌরবময় মৌন আন্দোলন' বলে আখ্যা দিচ্ছে---

এত বড় একটা সাফল্যের পরও হযরতজী (রঃ) এঁর মনে কোন স্বস্তি ছিলো না। তিনি তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, মেওয়াতিরা যদি তাদের এই জাগরণের ঢেউকে ধরে রাখতে না পারে তাহলে বড় ধরনের একটা পতন আসবে। ফের আঁধারে ঢেকে যাবে ওদের মনের আকাশ।

সেজন্যে দরকার আজকের এই আত্মত্যাগ মহীয়ান আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার মেহনতকে জারী রাখা, ধরে রাখা। এর পরিমাণ বাড়ানো আর শক্ত হাতে এর হাল ধরা। যাতে বিপরীত স্রোতে ভেসে না যায়। কারণ যদি এরা পড়ে তাহলে যতটুকু ওপরে উঠেছিলো তার চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে নিচে পড়বে।

হযরতজী (রঃ) ভয় পেতেন এজন্যে যে, এতোদিন মেওয়াতিরা ছিলো বর্বর, মূর্খ অনুন্নত। তখন এরা শয়তানী শক্তি নজরে ছিল না। এখন এরা তাদের নিশানা। সামান্য ফাঁক পেলেই সেখান দিয়ে ভেঙে চুরমার করে দেবে অনেক কষ্টে গড়ে তোলা দ্বীনি ইমারত। কাজেই দ্বীনের মেহনতের আদর্শ পীঠস্থান মেওয়াতবাসীদের খুবই সতর্ক আর হুঁশিয়ার থাকবে হবে। তাই দারকার বার বার আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী করে বের হবার সিলসিলাকে কায়েম রাখা। আর উত্তরোত্তর কোরবানীকে বাড়ানো।

তিনি মিয়াজি মুহাম্মদ ঈসা ফিরোজপুরীকে দেয়া এক চিঠিতে লেখেন,

"---দেখো, মেহনত করে তোমরা চার মাসের জন্যে লোকদের আল্লাহর রাস্তায় বের করো। নইলে ঈমানের দুর্বলতা এসে যাবে। ঈমান কমজোর হলে আমালের জান থাকবে না। তখন তোমাদের দোয়া কবুল হবে না।

এই নিয়মে তোমরা জানমাল খরচ করা জারি রাখো।

জীবনের প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব হিসেবে ধরে নাও। এর জন্যে পুরো উদ্যম খরচ করো। নইলে ঈমানের মজা পাবে না। ঈমানের অন্তর্নিহিত আনন্দ হারিয়ে যাবে। আমল দুর্বল হয়ে যাবে। তখন দিশেহারা করে তুলবে শয়তান। কারণ এই কাজটির শেষ একটা লক্ষ্য আছে। সেই গন্তব্যে না পৌঁছুতে পারলে শয়তান তোমাদের ঠেলে নিচে ফেলে দেবে। তা খুবই ভয়ংকর গভীর এক খাল। সেখানে পড়লে জাতি আর

www.eelm.weebly.com

কোনোদিন ওপরে উঠতে পারবে না। তখন তোমাদের অবস্থা সেই অজ্ঞতা ও মূর্খতার যুগের চেয়েও বেশি খারাপ হয়ে যাবে।

শত্রুপক্ষ এতদিন তোমাদেরকে দেখেছে, মূর্খ, অজ্ঞ, সরল এক জাতি হিসেবে। তোমাদেরকে তারা হিসেবের মধ্যেই ধরেনি। এখন ওরা লক্ষ্য করছে তোমাদের পরিবর্তন। এবার তোমরা যদি মেহনতের পরিমাণ বাড়িয়ে ঈমান ও ইসলামের দুর্গ গড়ে না তোলো তাহলে ওরা তোমাদের ছত্রখান করে দেবে, চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে দ্বীনের দুর্বল প্রাসাদ। তারপর শুরু হবে নির্দিষ্ট নিয়মে শোষণ ও শাসন।

তার চেয়ে অভিশপ্ত ও ভয়াবহ আর কিছুই হবে না---।"

ভুল সবই ভুল

উম্মতের হেদায়াত ও মুক্তির চিন্তায় হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রঃ) এতোটাই অস্তির ও অধীর হয়ে পড়েছিলেন যে বেশ ক'জন কর্মীকে দাওয়াতের কাজের জন্যে দিল্লী ও আশপাশ এলাকার জন্যে নিয়োগ করেছিলেন। তাদেরকে তিনি মাসে শেষে পারিশ্রমিক দিতেন। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তিনি ক'বার এসে তাদের এলাকার অবস্থা দেখলেন। হতাশায় ভেঙে পড়লেন। কারণ কোনো কাজ হয়নি।

অথচ মেওয়াতে স্বেচ্ছা কর্মীরা নিজেদের জান মাল ও সময় খরচ করে যে মেহনত করেছে তাতে প্রাণের সাড়া জেগেছে। এখানে যে জাগরণ এসেছে তাতে মহাকালের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়।

কিন্তু পেশাদার কর্মীদের দিয়ে কাজ করে কোনো প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়নি। তিনি এদের আলসেমি আর উদাসিনতা দেখে খুবই হতাশ আর বিরক্ত হলেন।

আর এ ধরনের দাওয়াতি উদ্যোগ পুরোপুরি বন্ধ করে দিলেন।

উৎস থেকে নিরন্তর

দ্বীনের আসল প্রাণকেন্দ্র কোথায়?

আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহ, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারক সোনার মদিনায়।

তাই হযরতজী (রঃ) ভাবতেন, হিন্দুস্থানে কাজটা শক্তপোক্ত ভাবে গড়ে উঠলে চলে যাবেন জাজিরাতুল আরবে। সাথে নেবেন কিছু বিশিষ্ট সাথী। ওখানে শুরু করবেন দাওয়াতের কাজ।

www.eelm.weebly.com

উদ্দেশ্য উৎসমূলে ফিরে যাওয়া।

যেখানের কাজ সেখানে ফের চালু করা। তিনি বিশ্বাস করতেন এই মহান পবিত্র কাজের সবচেয়ে বেশি যোগ্য হচ্ছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরেরা। তাঁদের কাজ তাঁদের হাতে তুলে দেয়া। তখন তাঁরা বলবে আমাদের সম্পদ আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হলো। আর ওঁরা যদি এ কাজের দায়িত্ব নেন তাহলে বিদ্যুতের মতো দ্রুত সারা দুনিয়ার ঘরে ঘরে এ কাজ পৌঁছে যাবে।

জিলকদ মাসের আঠারো।

তেরোশো ছাপ্পান্ন হিজরি।

তাঁর (রঃ) এঁর অন্তরের আকুতি এতো প্রবল হয়ে উঠলো যে তিনি আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। ওই তারিখে রওনা হয়ে গেলেন হজ্জের জন্যে। তাঁর সাথে এ সফরে ছিলেন হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হাসান, হাজি আবদুর রহমান, মাওলানা নুর মুহাম্মদ, মাওলানা ইদ্রিস, মাওলানা জামিল, মাওলানা জাহিরুল হাসান, মুতাওয়াল্লী তোফায়েল আহমাদ, মাস্টার মাহমুদুল হাসান। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, হযরতজী (রঃ) এঁর ছেলে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (রঃ) ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ এনামুল হাসান (রঃ) এই জামাতে ছিলেন।

সফরের সময় হবে দীর্ঘ। কারণ হযরতজী (রঃ) এঁর লক্ষ্য জাজিরাতুল আরবে কাজ শুরু করা। সেক্ষেত্রে নিজামুদ্দিনে কে হাল ধরবেন? মেওয়াতের সাথীদের উদ্দীপনা ও উদ্যমকে কে ব্যবহার করবে?

সেসব ব্যবস্থা হযরতজী (রঃ) করে গেলেন।

নিজামুদ্দিন ও মেওয়াতের কাজের ভার পড়লো মাওলানা সৈয়দ রেজা হাসান সাহেবের ওপর। আর দিল্লীকে দেখবেন হাফিজ মাওলানা মাকবুল হাসান সাহেব।

গোটা কাজের সব রকম দেখাশোনা করার মহান দায়িত্ব ছিল শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া কান্দুলভী (রঃ) এঁর ওপর।

প্রশাসনিক দিক যেমন, সবার মাসোহারা দেয়া, বিভিন্ন সমাবেশে শরীক হওয়া, যদি কারো পদোন্নতি দেয়ার দরকার পড়ে কিংবা নতুন মদ্রাসা তৈরি করা– এসব দায়িত্ব এসে পড়লো হাজি রশিদ আহমাদ সাহেবের কাঁধে।

এ সফর ছিলো সমুদ্র পাড়ি।

জাহাজে বসে দাওয়াতের কাজের গুরুত্ব ও মাহাত্ম আলোচনা হলো। সাথে হজ্জের নিয়ম কানুন, ফজিলত ও উদ্দেশ্যেরও আলোচনা চললো।

জাহাজ জেদ্দা থেকে মক্কার পথে রওনা হলো। পথে 'বাহরা' বলে একটা জায়গায় খানিকক্ষণ থামলো জাহাজ। সেখানে জড়ো হলো ওখানকার নামকরা লোকেরা। তাদের সামনে হযরতজী (রঃ) দাওয়াতের কাজের গুরুত্ব ও মাহাত্ম, এর আবশ্যকীয়তা ও লাভ সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রাখলেন। শ্রোতারা খুব মনযোগ দিয়ে শুনলো।

www.eelm.weebly.com

তারা বললো, 'দাওয়াতের কাজ করা খুবই দরকার। আমরা আমাদের এখানে এ কাজ করবো ইন্‌শাআল্লাহ।'

মক্কা শরীফে পৌঁছুনোর সাথে সাথেই হজ্জের সময় চলে এলো। সেখানে তাড়াহুড়োয় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হলো। সে জন্যে দাওয়াতের কাজ তেমন পরিপূর্ণভাবে করা গেল না।

এবার হযরতজী (রঃ) যখন মিনাতে এলেন তখন সুযোগ এলো। অনেক দেশের হাজী সাহেবরা এসেছিলেন। তাঁদের সমাবেশ করে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের গুরুত্ব, প্রয়াজনীয়তা আর লাভের কথা আলোচনা করলেন। শ্রোতাদের মাঝে ভালো প্রভাব পড়লো।

সব প্রশংসা আল্লাহর। বেশ সুন্দরভাবে হজ্জ শেষ করলেন হযরতজী (রঃ) ও তাঁর জামাত। তিনি বেশ সময় নিয়ে ক'জন ভারতীয় ব্যক্তিত্বকে জড়ো করলেন। তাঁদের সাথে পরামর্শ বসলেন।

ওঁরা জাকিরাতুল আরবের এখনকার পরিবেশ ও অবস্থা পর্যালোচনা করে দাওয়াতের কাজ এখানে শুরু করার ব্যাপারে চরম বিরোধিতা করলেন।

তারপর হযরতজী (রঃ) আলোচনা করলেন মাওলানা মুহাম্মাদ শফিউদ্দিনের সাথে। তিনি শুনে খুব উৎসাহিত হলেন। বললেন, এই কাজ শুরু হোক। আমার মন বলছে আল্লাহতায়ালা রাব্বুল আলামিন আমাদের অদৃশ্য সাহায্য করবেন।'

শুক্রবার।

মুহম্মাদ সাঈদ মাল্কী দাওয়াত দিলেন খাবার। জোরশোর আতিথেয়তার পর হযরতজী (রঃ) ধীরে সুস্থে খানিকক্ষণ আলোচনা রাখলেন। আচমকা সাঈদ মাল্কী ভয়ানক রাগ হয়ে গেলেন। বয়ানের কিছু বক্তব্য তাঁর ভালো লাগেনি। সবাই মিলে তার রাগ থামালো। অনেক সময় লাগলো। তারপর তিনি তাঁর কিছু মত প্রকাশ করলেন। সেগুলো ছিল প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং ভালো দিক নির্দেশনা। হজ্জে এসেছিলেন বাহরাইন থেকে এক বিরাট দল। হযরতজী (রঃ) তাঁদের সাথে আলাপ করলেন। অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। খানিকটা পারস্পরিক মত বিনিময়ও হলো। তারা ওয়াদা করলো। বললো, 'ইনশা-আল্লাহ, আমরা বাহরাইন ফিরে গিয়ে এ কাজ করবো। কথা দিচ্ছি।'

ওই দলটিতে দু'জন আলিম ছিলেন। তাদের সবার চেহারায় জ্ঞানের নতুন দিগন্ত খুলেছে। তার খুশিতে উজ্জ্বল। বোঝা যাচ্ছে মাওলানা (রঃ) এঁর বক্তব্য তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। এই কাজের খাত তাদের সামনে খুলেছে। তাঁরা তৈরি। দাওয়াতের কাজ করার জন্যে।

কিন্তু চমকে উঠলেন ক'জন ভারতীয় ব্যবসায়ী। দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন ধরনের কথা শুনে। হযরতজী (রঃ) তাঁর সেই আবেগদীপ্ত কণ্ঠে ব্যাখ্যা করে চলেছেন এই

www.eelm.weebly.com

কাজের গুরুত্ব, লাভ আর উদ্দেশ্যের কথা। অনেক কষ্টে ওদের একত্রিত করেছেন মাওলানা (রঃ)। এখন প্রাণের সব আবেগ ঢেলে দিচ্ছেন এই কাজ বোঝানোর জন্যে।

অবশেষে তারা বুঝলো। আল্লাহতায়ালা তাঁদের অন্তরের দরোজা খুলে দিলেন। ঝলমলে আলো আর ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে পড়লো বন্ধ ঘরে। কেটে গেল মনের গুমোট ভাব।

ফের একদিন ওদের নিয়ে বসলেন হযরতজী (রঃ) এবার ওরা কাজের জন্যে পুরোপুরি তৈরি।

তারা বললো, 'হযরত, কাজ তো আমরা করবো কিন্তু সরকারী পর্যায়ের অনুমতির দরকার। আপনি বাদশাহের কাছে যান। তাঁর সাথে আলোচনা করুন। তিনি আপনার ডাকে সাড়া দিলেন আমাদের জন্যে সহজ হবে।'

চমৎকৃত হলেন হযরতজী (রঃ) ওঁদের পরামর্শে। তারা ঠিকই বলেছে। তিনি সাত তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরামর্শে ফায়সালাও হলো তাই।

চিঠি লেখা হলো আরবীতে।

চিঠির ভেতর বক্তব্য থাকলো, তাবলীগ কি ও কেন। এর উদ্দেশ্য ও লাভ। আবশ্যকতা আর গুরুত্ব।

পৌঁছে গেল চিঠি।

বাদশাহ ওঁদের ডাকলেন।

এর আগে অবশ্য হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হাসান আলাদাভাবে শায়খুল ইসলাম আবদুল্লাহ বিন হাসান ও শায়খ বিন বালিহাদ এর সাথে দেখা করলেন। আলোচনা হলো সংক্ষিপ্ত।

এই ঘটনার পুরো বিবরণ দিল্লীতে জানিয়ে চিঠি পাঠালেন হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হাসান। চিঠি এসে পৌঁছেছিল ফেব্রুয়ারির সাতাশ তারিখ, উনিশ শো আটত্রিশ সালে।

তিরিশে মার্চ, উনিশশো আটত্রিশ। ফের চিঠি এলো দিল্লীতে। লিখেছেন হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হাসান। নতুন ঘটনার বিবরণ দিয়ে।

---চোদ্দ মার্চ, উনিশ শো আটত্রিশ। আমরা বাদশাহের সাথে দেখা করার জন্যে চলেছি। হযরতজী (রঃ) এঁর সাথে আছেন হাজি আবদুল্লাহ দেহলভী, প্রধান মুয়াল্লিম আবদুর রহমান মাজহার আর আমি।

রাজ দরবারে পৌঁছে আমরা হতভম্ব হয়ে পড়লাম। দেখি স্বয়ং বাদশাহ শাহী তাখ্‌ত ছেড়ে নিচে নেমে আসছেন। দু'হাত বাড়িয়ে। মুয়ানাকা বা আলিঙ্গনের জন্যে।

এই দারুণ অভ্যর্থনা পেয়ে আমরা অভিভূত।

তিনি আমাদের সাদরে বসতে বললেন। ঠিক তাঁর পাশে আমাদের আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করলেন। শুরু হলো বক্তব্য রাখা। গভীর মনযোগের সাথে

www.eelm.weebly.com

শুনলেন তিনি সেই আলোচনা। বেশ প্রভাবিত হয়েছেন, বোঝা গেল তাঁর চেহারা দেখে। বক্তব্য শেষে খানিকক্ষণ নিরবতা নেমে এলো। চুপচাপ।

এবার বাদশাহ তাঁর আলোচনা শুরু করলেন। তাওহিদ, রিসালাত ও শরীয়ত সম্পর্কে। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে। তারপর এ কাজ তিনি সমর্থন করেন জানিয়ে নেমে এলেন রাজ সিংহাসন থেকে।

বিদায় জানালেন আমাদের। সসম্মানে।

পরদিন তিনি রাজধানীর দিকে চলে গেলেন।

এপ্রিলের সাতাশ। উনিশ শো আটত্রিশ। এদিন আর একটা চিঠি এলো দিল্লীতে। লিখেছেন ইহতিশামুল হাসান। তাতে লেখা–

---তাবলিগ কী ও কেন করা দরকার এর ওপর একটা ছোট বক্তব্য লিখে পাঠালাম কাজীউল কোজাত বিচারপতি ও শায়খুল ইসলাম আবদুল্লাহ বিন হাসানের কাছে। তারপর হযরতজী ও আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে দেখা করলাম।

তিনি খুব মনযোগ দিয়ে শুনলেন আমাদের প্রতিটি কথা। তারপর বেশ জোর দিয়ে বললেন, "এ কাজ করা আমাদের জন্যে খুবই জরুরী।" তিনি সব ধরনের সহযোগিতা ও সমর্থন করবেন ওয়াদা করলেন।

কিন্তু মূল সমস্যাটি হচ্ছে কাজ করার জন্যে দরকার সরকারী অনুমতির। সেটা দেয়া হবে উপ-প্রধান জেনারেল প্রিন্স ফয়সলের সিদ্ধান্তের ওপর।---'

তার কাছে অনুমতি নেয়ার প্রক্রিয়া চললো।

আর তখন সকাল বিকাল দু'বেলা জামাত বের হলো দাওয়াতের কাজে। কয়েকটা সমাবেশ ও বৈঠক হলো। সেখানে মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রিস আর মাওলানা নূর মুহাম্মাদ উর্দুতে কথা বলতেন। খুব কাজ হলো। শ্রোতারা তাবলিগের কাজটা বুঝতে পারলো। দাওয়াত ও তাবলিগকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলো।

এ সময় শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া (রঃ) এঁর কাছে একটা চিঠি এলো হযরত মাওলানা এনামুল হাসান (রঃ) এঁর কাছ থেকে। তাতে লেখা-

'---হযরতজী আমাদের দাওয়াতের কাজের ওপর খুব গুরুত্ব দিতে বলছেন। তিনি তাওয়াফ, ওমরা ও অন্য সব প্রাসঙ্গিক ইবাদাতের চেয়ে তাবলিগের কাজকে বেশি করতে বলছিলেন। তিনি বলেন, 'এটা পূতঃ পবিত্র স্থান। এখানেই দাওয়াতের কাজের শুরু। শেকড় এখান থেকেই। তাই এখানে দাওয়াতের চেয়ে বড় কোনো ইবাদাত নেই।

একবার বেশ কিছু নামীদামী লোক ও ওলামা হযরতকে একত্রিত করলেন এক সমাবেশে। সেখানে তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা বলুন মুসলমানদের এই বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার আসল কারণ কি?

www.eelm.weebly.com

সবাই যার যার মত নিজের ভাবনা বললেন।

হযরতজী নিজে তাঁর মত প্রকাশ করলেন।

সবাই খুব প্রভাবিত হলেন তার বক্তব্যে। একমত হলেন। আন্তরিক সহযোগিতার ওয়াদা দিলেন।

কে এই অলৌকিক আগন্তুক?

বাবুল ওমরা।

কাছেই একটা বাড়ি। এখানে হজরতজী (রঃ) এঁর জামাতটি থাকছেন আজ ক'দিন। এটার একটা কামরা। একদিন। ওরা সবাই বসে আছেন। জগদ্বরেণ্য সব মহাপুরুষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় হজরতজী। আরো সব বুজুর্গ।

কথা বলছেন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ)। গভীর একাগ্রতার সাথে শুনছেন সিদ্ধপুরুষ সম্মানিত শ্রোতারা।

অমিয় বাণী।

মধু ঝরে পড়ছে যেন হজরতজী (রঃ) এঁর ঠোঁট থেকে। প্রচণ্ড আবেগ, খানিকটা ক্ষোভ, যা নাবাচক নয়, ওটা ছিলো গভীর দুঃখবোধজাত কিছু বেদনাবিধুর উচ্চারণ। আর তা ছিলো মননশীলতায় ঋদ্ধ। যেন অন্য কোনো ভুবন থেকে ভেসে আসছে কথাগুলো।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একত্ববাদ, কোরআন, সুন্নাহ, শরিয়ত, দাওয়াত, হিজরতের ওপর ছিলো বক্তব্যের বিষয়বস্তু। জ্ঞানগর্ভ, প্রজ্ঞাময়, বিস্ময়কর ব্যঞ্জনা আর প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক আকর্ষণে ভরা কথাগুলো জোয়ারের মতো বেরিয়ে আসছে তাঁর কণ্ঠ চিরে।

সবাই চেয়ে আছেন এই ছোট খাটো মানুষটার দিকে। কী গভীর আর অর্থবহ তাঁর কথা। চেহারা আর দৃষ্টি। সবাই যেন চৌদ্দশো বছরের কোনো একজন মানুষকে দেখছেন। দেখছেন দ্বীনের জন্যে পাগল, আল্লাহতায়ালা জাল্লাশানুহুর ইশ্‌ক ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেম পীযুষে পরিপূর্ণ এক সাধক আর মানুষের কল্যাণের তরে পাগলপারা নিবেদিত প্রাণ একজন সূর্যপুরুষকে।

আচমকা গম গম করে উঠলো ঘরটা। বজ্র নির্ঘোষ একটি কণ্ঠস্বরে। আমরা সবাই চমকে উঠলাম। ঝট করে ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখি উত্তম দিকের দরোজায় একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ। আশপাশ আলোকিত করে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, 'তোমরা যে কাজ করছো তা নিয়ে এগিয়ে যাও। এর মাঝেই ডুবে থাকো। এই কাজের কী যে পুরস্কার! তা প্রকাশ পেলে সুতীব্র আনন্দে প্রাণ ফেটে তোমরা মারা যাবে!

হঠাৎ এসেছিলেন। হঠাৎই মিলিয়ে গেলেন।

www.eelm.weebly.com

সেই আগন্তুক।

হযরতজী (রঃ) কিন্তু তখনো আলোচনা করে যাচ্ছেন। কে এলো কে গেল তা যেন তিনি লেখতেই পাননি।

এ ঘটনাটি বলেছেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (রঃ)।

মরু নির্ঝরদের মাঝে

পচিশে সফর।

হিজরি তেরোশো সাতান্ন।

এদিন সূর্য পূবের আকাশে ঝলমল করে উঠতেই হযরতজী (রঃ) ট্যাক্সি চড়ে মক্কা থেকে রওনা হলেন রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেশে। মদিনার পথে।

সাতাশ সফর।

সকাল। তিনি (রঃ) পৌছে গেলেন সোনার মদিনায়।

এ ব্যাপারে একটা চিঠি হযরত মাওলানা ইহইতশামুল হাসান সাহেব তেরোশো সাতান্ন হিজরির বারো বরিউল আউয়াল তারিখে শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া (রঃ) এঁর কাছে লেখেন। তাতে লেখা-

---মদিনা পৌছেই হযরতজী তাবলিগের কাজ এখানে চালু করার জন্যে আপ্রাণ উদ্যম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এজন্যে পরামর্শ করে মদিনার প্রশাসকের দেখা করার দিনক্ষণ ঠিক হলো। হযরতজী নিজেই যাবেন। সাথে রয়েছেন মাওলানা সৈয়দ মাহমুদ আর আমি।

মদিনার প্রশাসক আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

আমরা তাবলিগের উদ্দেশ্য, এর লাভ আর প্রয়োজনীয়তার কথা কোরান হাদিসের আলোকে খুলে বললাম। শুনে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করলেন ও উদ্যোগের। তারপর তিনি বললেন, "আমি জানি কাজটি খুব ভালো, অত্যন্ত দরকারী কিন্তু অনুমতি দেবার কোনো ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমি সংশিরষ্ট কাগজ মক্কা মুয়াজ্জামায় পাঠিয়ে দেবো। ওখান থেকে যা বলে তাই করবো"। আমরা ফিরে এলাম।---'

এ ধরনের প্রায় ব্যর্থতায় হজরতজী (রঃ) কখনো নিরাশ হতেন না। তিনি অনুমতির অপেক্ষা না করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও আলোচনা চালিয়ে গেলেন অক্লান্ত ভাবে।

দাওয়াতের কাজকে বোঝানোর জন্যে 'কোবায়' যাওয়া হল দুবার। ওখানে বেশ বড় সমাবেশ হলো। তাতে গভীর আবেগে কথা রাখলেন হজরতজী (রঃ)। কিছু লোক প্রভাবিত হয়ে কাজের জন্যে তৈরি হলেন।

www.eelm.weebly.com

এবার হজরতজী (রঃ) ছুটলেন অহুদ পানে। সেখানে দুটো আলাদা সমাবেশে দু'বার আলাদা কথা রাখা হলো। আলোচনা করলেন মাওলানা নূর মোহাম্মদ ও মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ। কথা হলো আরবীতে অনেকেই এই কাজ শুরু করার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

বেদুইনরা হচ্ছে আরবের সৌন্দর্য। মরুর নির্ঝর।

ওদেরকে ডেকে কথা বলতেন হজরতজী (রঃ)। তাদের শিশুদের কালিমা শুনতেন। বিভিন্ন সরাইখানা ও মুসাফির খানায় অবস্থানরত লোকদের সাথে যোগাযোগ করা হলো। মাঝে মাঝে এতো ব্যাপক সাড়া পাওয়া যেতো যে সবার মনে আশার আলো জ্বলে উঠতো। ফের অনেক সময় লোকজন এমন সব কটুক্তি ও সন্দেহ প্রকাশ করতো যে হতাশা ভর করতো জামাতের মনে। হজরতজী (রঃ) ছিলেন অনমনীয়। আত্মবিশ্বাসী আর দুঃসাহসী। তিনি তাঁর লক্ষ্যে অবিচল অটল পাহাড়ের মতো অনড় রইলেন। একটা সিদ্ধান্তে আসা গেল যে ভারতের চেয়েও বেশি দাওয়াত ও তাবলিগের কাজের দরকার জাজিরাতুল আরবে।

তাই তৃষ্ণার্ত মন দিয়ে ব্যাথাবিধুর মানুষটি নবীজি'র রওজার দিকে চেয়ে থাকেন আশায় আশায়। আকাশ প্রদীপের মতো।

ফেরা

দিন পনেরো থাকলেন তিনি মদীনায়। এখানে কাজ শুরু করার যে প্রচেষ্টা নেয়া হলো তা হচ্ছে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজের একেবারে প্রথম পাঠ। আসল মেহনত শুরু করতে হলে হজরতজী (রঃ) বুঝতে পারলেন এখানে বেশ ক'টি বছর থাকতে হবে। একনাগাড়ে। তখন এখানের স্থানীয় মানুষ এ কাজ বুঝে চালিয়ে নিতে পারবে।

তাহলে ভারতবর্ষের কাজের কী হবে?

ওখানে কাজ যে প্রাথমিক স্তরে চালু করে হজরতজী (রঃ) চলে এলেন সেটাকে সমাপ্তির পর্যায়ে নিয়ে যাবে কে? তিনি ভাবলেন। অনেক চিন্তা করলেন। অবশেষে সিদ্ধান্তে এলেন। আগে ভারতবর্ষের কাজটিকে একটা মজবুত অবস্থানে দাঁড় করাতে হবে। যখন সুযোগ্য লোকেরা কাজটিকে বুঝে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো ক্ষমতা অর্জন করবে তখন তিনি মদিনায় যেতে পারেন। সেখানকার কাজকেও একটা শক্ত অবস্থানে ওঠাতে পারেন।

হজরতজী যদিও জাজিরাতুল আরবে রয়েছেন তবুও বার বার চিঠি ও অন্যান্য সংবাদ মারফত খবর রাখছিলেন হিন্দুস্থানের কাজের গতি প্রকৃতির ওপর। হেজাজ শরীফে বসেই দরকার মতো দিক নির্দেশনা ও উৎসাহ দিয়ে যেতেন।

www.eelm.weebly.com

মদিনার দাওয়াতের কাজের গোড়াপত্তনের জন্যে যখন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছেন তখন বেশ ক'জন বুজুর্গ ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তাঁকে পরামর্শ দিলেন দেশে ফেরার জন্যে। হিন্দুস্থানের কাজকে সামলানো, জোরদার ও শক্তিশালি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। হজরতজী (রঃ) অভিজ্ঞ বুজুর্গদের পরামর্শে সাড়া দিয়ে ভারতে ফেরার তৈরি নিলেন।

জন্মভূমিতে ফিরে এলেন। কিন্তু চোখে মদিনার ছবি। একূল রক্ষা হলে ওকূল ধরে রাখা যায় না। কী করবেন? কী হবে উম্মতের। কেন এমন হলো।

উম্মতের কাছ থেকে কেমন করে হাতছাড়া হয়ে গেল দাওয়াতের কাজ। ভাবতে ভাবতে দাঁড়িয়ে যেতেন। পায়চারি করতেন। তারপর অস্থির পায়ে বেরিয়ে যেতেন ঘর ছেড়ে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকতেন বিশাল আকাশের দিকে। এতো বিরাট সৃষ্টি, এর মাঝে এতো বৈচিত্র্য। এরা কী কথা বলে? নৈঃশব্দতার শব্দ বুঝি তিনি শুনতে পেতেন। তারা বুঝি বলছে, 'এতো বড় আর বিচিত্র সৃষ্টির স্রষ্টাকে তোমরা মানতে পারছো না! মানব, তুমি বড়ই দুর্ভাগা।'

এসময় একদিন একটা চিঠি এলো।

পবিত্র মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে। পত্র লেখক ওখানে কাজ শুরু করেছেন। কিন্তু, মাওলানা (রঃ) এঁর অনুপস্থিতি বড় অসহনীয়। কারণ কাজ করার সময় উদ্ভূত পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দিতে হবে তা বুঝতে পাচ্ছেন না।

হজরতজী (রঃ) চিঠিটির উত্তর লিখলেন–

ভাই,

চিরদিনের হোক আপনার সম্মান। আপনি সালাম জানিয়েছেন। তার জবাব দিচ্ছি। গ্রহণ করুন। আপনি প্রশ্ন করেছেন আমি কেন এভাবে চলে এলাম। তার উত্তর বলছি।

আমি মদিনা মনোয়ারাতে ছিলাম মোট পনেরো দিন। রোজ সকালে চায়ের আসর বসতো। সেখানে আমি জ্ঞানী গুণী লোকদের সামনে মক্কা, মদিনা ও তায়েফে পূর্ণভাবে কাজ শুরু করতে চাই এ ব্যাপারে আলোচনা করলাম। তাঁরা সবাই আমাকে বললেন, 'ব্যাপারটি দীর্ঘমেয়াদী। একটা মোটামুটি পর্যায়ে পৌঁছতে কমপক্ষে বছর দুয়েক সময় লাগবে'।

সময়ের হিসাবটি আমার কাছেও ঠিক মনে হলো। দীর্ঘ সময় থাকার ইচ্ছেও ছিলো। কিন্তু প্রজ্ঞজনেরা আমাকে বললেন, 'আপনি হিন্দুস্থানে যে কাজ শুরু করেছেন তা অঙ্কুরিত হয়েছে মাত্র। একে আপনার নিজ দেখাশুনায় বড় হতে দিন। পূর্ণ রূপ ধারণ করুক। আপন কাণ্ডে ভর দিয়ে ডাল পালা মেলে দিক। তারপর আপনি এখানে

www.eelm.weebly.com

করুন। নইলে এখানেও অপূর্ণ আর ভারতবর্ষেও অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে কাজ। কেচে হবে আপনার উদ্দেশ্য।

এদের কথায় যুক্তি ছিলো।

সেজন্যে ভাই হিন্দুস্থানে চলে এলাম। অল্প সময়ের জন্যে। আমি চাই এখানের কাজকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আল্লাহ চাহেন তো তখন সাথিরা নিজেরাই কাজ সামাল দিতে পারবেন। তারপর আমি ফিরতে চাই ইসলাম ও মুসলমানের উৎস স্থলে। আমি বুঝতে পারি এ কাজ কে নিরন্তর চালাবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরেরা। তাঁরা এ কাজে লাগলে মহাসমুদ্রে প্লাবন আসবে। এখন কূয়োতে ঢেউ উঠছে।

আর ভাই,

যদি আপনার মনে কথা ওঠে যে, দ্বীনে মুহাম্মাদীকে রক্ষা করতে হবে। চিরদিন এর প্রবাহকে জারী রাখতে হবে তাহলে যে নিয়ম ও পদ্ধতি বলেছি তা যদি আপনার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয় তবে আশা করছি ঠিক সেই নীতিমালার ওপর আপনি এই কাজ গুছিয়ে করুন। যদি নিজের পার্থিব সফলতার জন্যে যাবতীয় কর্মসূচীর চেয়ে দ্বীন জিন্দা করার কাজকে বেশি বড় সফলতার চাবিকাঠি মনে করেন তাহলে দয়া করে আমার মূলনীতিগুলো বুঝুন। সবাই কে বোঝান। আর খুব মনপ্রাণ দিয়ে কাজটি করুন।

বিশেষ আর কি? সালাম শেষে

বান্দা মুহাম্মাদ ইলিয়াস"

নিযামুদ্দিন, দিল্লী।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রঃ) দেশে ফিরে এলেন। কাজের অবস্থা দেখলেন। কাজ চলছে কিন্তু একটু ঢিলে ঢালা ভাব। এটা স্বাভাবিক। যে কোনো আন্দোলনের মূল নেতা চলমান বিপ্লবের পাশাপাশি না থাকলে অন্যেরা একটু ঝিমিয়ে পড়েই। হজরতজী (রঃ) ফিরে এসেই শক্ত হাতে হাল ধরলেন। একের পর এক জামাত বের হলো। চারদিকে পাঠানো হলো জামাত। যারা ঘরে রইলো তারা গাশতের কাজে ব্যস্ত রইলো। আবার জান মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানীর আমল জারী হলো।

ব্যাপক ও বিস্তৃত আকারে।

জামাত বের হলো গাঁ থেকে। চলে গেল শহরে। শহর থেকে বেরুলো জামাত। চলে গেল গ্রামে গ্রামে। হজরতজী (রঃ) নিজে সফরে বেরুলেন। একের পর এক। অক্লান্ত মেহনত চললো মানুষের ময়দানে। দলে দলে মানুষ জান মাল আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করার জন্যে উৎসাহিত আর উদ্বুদ্ধ হলো। দিল্লীর ব্যস্ত মানুষেরাও জান-মাল

www.eelm.weebly.com

সময় কোরবানী দিয়ে গ্রামে গঞ্জে এলো। মেওয়াতিদের জামাত পাঠানো হলো দিল্লীতে। বেশ কিছু ইজতিমা হলো।

এলাকার মসজিদ গুলোতে মসজিদওয়ার জামাত তৈরি হলো। সেখানে ঠিক হলো গাশতের দিন।

শুরু হলো মোকামী গাশ্‌ত।

মহল্লার মেহনত।

তাঁর ব্যথা কতটুকু?

কাজ নিয়ে ছুটে চলেছেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রঃ)। কখনো গ্রামে কখনো শহরে। তিনি সবচেয়ে ব্যথিত শহুরে মানুষদের অবস্থা দেখে। এরা দ্বীন থেকে সরে যাচ্ছে। দূর থেকে দূরে। ক্রমেই।

এক সময় দ্বীনদারীর অবস্থা ভালো ছিলো শহরে। কিন্তু নানান দেশের নানান ধরনের দুনিয়াদার মানুষেরা এসে এদেরকে করেছে প্রলোভিত। দেখিয়েছে দুনিয়ার ঐশ্বর্যের রূপ, বিলাস ব্যসনের চমৎকার আসবাব, চোখ ঝলসানো পাপ কর্মের আকর্ষণ। এসব দেখে মুসলমানেরা মন্ত্রমুগ্ধ। নতুন স্থাপত্যের বাড়ি, প্রসাদোপম অট্টালিকা, চলার জন্যে আধুনিক মনোলোভা গাড়ি আর অর্জনের জন্যে জায়েজ নাজায়েজের ধার না ধারা। একের দেখে অন্যজন ছুটছে মরিচিকার পেছনে। এই প্রতিযোগিতায় সবাই দৌড়ুচ্ছে পড়ি মড়ি। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই শহরবাসীর। যেমন করে হোক হাসিল করতে হবে জিনিষ। সেজন্যে দরকার টাকা। অর্থ। সম্পদ। কাড়ি কাড়ি টাকা অর্জন করতে গিয়ে সে ভুলেছে আখিরাত। পরকাল। তার স্থায়ী আবাস। চিরদিনের সুখ শান্তি আর আরামের জায়গা। হায় মানুষ!

হায় মুসলমান।

হজরতজী (রঃ) শুধু ভাবেন।

কেন এমন হলো?

কী করে জাতিকে উদ্ধার করা যায়। এই অভিশপ্ত জীবন থেকে?

হজরতজী (রঃ) এর হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ব্যথা। কান্না। সুগভীর যন্ত্রণায় তিনি কাতর। এ ব্যথার গভীরতা কতটুকু? এ ব্যথা যে শেষ হবার নয়। যতদিন উম্মতকে তিনি একটা সন্তোষজনক অবস্থায় না দেখেন।

শহরের দ্বীনদারী দুনিয়ার চোখ জুড়ানো প্রলোভনে শেষ হয়ে চলে গেল সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে। ধর্মের প্রতি আকর্ষণ আর অনুরাগ শেষ হতে হতে তা প্রায় মিলিয়ে গেল। শহরের মাত্র কিছু লোকের কাছে দ্বীন রইলো। বিশেষ বিশেষ কিছু

www.eelm.weebly.com

মানুষ। তার সংখ্যা হাতে গোনা যায়। যত দিন গেল ততো এ সংখ্যা কমে গেল। শেষে দেখা গেল মাত্র ক'জন লোক দ্বীনের ওপর চলছে। আর সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এদের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। দিনে দিনে।

দ্বীনের এমন অবক্ষয় সম্পর্কে সাধারণ মানুষ আর বিশেষ লোকেদেরও ধারণা ছিল না। তারা মাঝে মাঝে বড় ধরনের জলসা বা ওয়াজ মাহফিল করতো। সেখানে রাতভর ওয়াজ চলতো। ভোরের দিকে শ্রোতারা সব কান্নাকাটি করে ঘুমিয়ে যেত। বেশ নির্বিকার ওদের ছিল না। ওরা ভাবতো, 'বাহ! সব প্রশংসা আল্লাহর! আমাদের ভেতর এতো দ্বীনদারি! সারা রাত আমরা দ্বীনের কথা শুনলাম। অথচ এই ওয়াজ শোনা মুগ্ধ শ্রোতা সে বছর এক ওয়াক্ত নামাজ পড়েনি, অনায়াসে হারাম কামাই করেছে, অহেতুক মিথ্যে কথা বলেছে, প্রতিদিন দাড়ি কামিয়েছে, বছর শেষে রোজার মাস এলে পয়লা ও শেষ রোজাটা রেখে আটাশটি রোজা ক্বাজা করে দিয়েছে।

এতো বড় বেদ্বীনি হাসিমুখে মেনে নিয়েছে ওয়াজের ও জলসার আয়োজনকারীরা। এভাবে শ'য়ের মধ্যে পঁচানব্বই জন মানুষ যে দ্বীন থেকে খালি এ কথা দ্বীনদার ক'জন মুসলমান জানে? দ্বীনের বিস্তার আর প্রচার দ্রুতগতিতে কমে প্রায় শেষের দিকে চলে আসছে। সমাজে দেখা দিচ্ছে পাপ। পূণ্য তো নেই, উল্টো গুণাহের সাগরে ভেসে যাচ্ছে মুসলমান। পাপগুলো যে কতো জঘন্য আর ভারি সে অনুভূতিও কমে গেছে। মদ পান হয়েছে শরবত পানের মতো। জুয়া অবাধ। ব্যাভিচার। খোলাখুলি। সুদ। ধীরে ধীরে। সবার মধ্যে। ঘুষ। সুযোগ পেলেই। বাপ মাকে ভুলে স্ত্রী পুত্র পরিজন নিয়ে ব্যস্ত। দ্বীনি ইলম শেখানোর জায়গায় ইংরেজি পড়াশোনা। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শকে তামাশার নজরের দেখা। ছোট করে দেখা। আর অবাস্তব বলে ধারণা কারা। ইহুদি ও নাসারাদের আদর্শকে মুগ্ধ চোখে দেখা, বড় ও সম্মানের দৃষ্টিতে গ্রহণ করা। এসব বন্যার তোড়ের মতো ছুটে আসছে ইসলামের নাম নিশানাকে মুছে দিতে। সবচেয়ে দুঃখের আর ব্যথার কথা হচ্ছে এসব করছে বেশির ভাগ শহুরে মুসলমানরাই।

ইসলাম ও মুসলমানের মর্মান্তিক অধঃপতন হজরতজী (রঃ) চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। তিনি ব্যথায় ব্যথায় নুয়ে পড়ছেন। ভাবছেন কী করে শতকরা পঁচানব্বই জন মানুষের মাঝে দ্বীনি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া যায়। এমন ভাবে যেন তা বংশ পরম্পরায় তা চলতে থাকে। আর নিভে না যায়। কি সেই উপায়?

দিল্লীর দ্বীনি প্রাণকেন্দ্র যেগুলো ছিলো তার অবস্থাও খুব শোচনীয়। বংশের পর বংশ ধরে যারা দ্বীনি প্রদীপ এক হাত থেকে অন্য হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন, দীপ থেকে দীপ প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিলো, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তা যেন নিষ্প্রভ হতে হতে গভীর গাঢ় আঁধারে ডুবে গেল। এক বুজুর্গ চলে গেলে দ্বীনি ইলম আর আমল নিয়ে চলে যেতেন। তাঁর উত্তরাধিকার কাউকে খুঁজে পাওয়া যেতো না।

www.eelm.weebly.com

চিরদিনের জন্যে শূন্য হয়ে যেত জায়গাটা।

এ অধঃপতন চলছিল সর্বত্র।

মুজাফফরনগর, সাহারানপুরও দিল্লীর দ্বীনি ঐতিহ্যে ঝলমলে এলাকাগুলোর ক্রমেই জমাট আধার ঘনিয়ে এলো।

এ ব্যাপারটি হজরতজী (রঃ) কে অবর্ণনীয় যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে দিল।

একটা চিঠি লিখেছিলেন এ ব্যাপারে তাঁর মনের অবস্থা জানিয়ে।

'--- বড়ই দুঃখ, বড় ব্যথা। এই দুনিয়ায় দ্বীনদার, বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব নতুন করে আর দেখা যাচ্ছে না। আর এদের সাথে থেকে যাঁরা দ্বীনদার ও আল্লাহওয়ালা হয়েছিলেন তাঁরাও কোনো যোগ্য প্রতিনিধি না রেখেই দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছেন। একে একে। ফলে ভয়াবহ শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্যে আমি চাইছি ফের জনতার মাঝে দ্বীন নিয়ে যেতে। সর্ব সাধারণ দ্বীনদার হোক। তাদের দ্বীনি চর্চা এতো ব্যাপক ও উন্নত হোক যে কিছু বিশেষ ব্যক্তিত্ব আবার তাদের মাঝে তৈরি হয়ে যায়। ওইসব বুজুর্গ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব নতুন প্রজন্ম তৈরি করুক। আগের জামানায় এই ধারা প্রচলিত ছিলো। এখনো এমন হলে দ্বীন টিকবে। নইলে ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়াবে সমাজের। ---'

পুরোপুরি দ্বীনের ওপর চলার লোক যেমন হাতে গোনা ক'জন তেমনি ইল্‌ম বাদ্বীনি জ্ঞান হিসেব করা ক'জন মানুষের মাঝে বন্দী হয়ে পড়েছে। ধর্মীয় জ্ঞান জনতার মাঝে কিছুই নেই। যেমন অজুর ক'টি ফরজ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, প্রতি ওয়াক্তে কত রাকাত, নামাজের ফরজ, ওয়াজিব ক'টি, কি কি কারণে রোজা ভেঙ্গে যায়, কোন কারণে রোজা মাকরুহ হয়, হজ্জের আরকান ও আহকাম ক'টি? যাকাত কি ভাবে দেবে? এসব সম্পর্কে কিছুই জানে না। সবচেয়ে বড় ভয়ংকর মূর্খতা রয়েছে ঈমানের ব্যাপারে। ঈমান কি? ঈমানের শব্দ। তার নিজ ভাষায় মানে। তার ব্যাখ্যা। কালিমার উদ্দেশ্য। তা আমার কাছে কী চায়? এ সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ রয়েছে সর্বসাধারণ।

এদের মাঝে যারা কিছু জানে দাবী করে তারাও সব ভুল জানে। তারা বকরিকে ভেড়া জানে। সেই ভুল জানাকেই সঠিক জেনে তারা জীবন যাপন করছে।

এই ভয়াবহ অবস্থা যুগের পর যুগ ধরে চলছে।

দ্বীনের জ্ঞান না থাকলে ইসলামের ওপর চলবে কী করে উম্মত?

ভেবে পান না মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)।

সাধারন মানুষের কাছে দ্বীনি ইল্‌ম কিভাবে পৌছানো যায়?

কী করে সবার মাঝে ফরজ ইল্‌মটুকু এসে যায়?

তারপর কীভাবে জনতার মাঝে থেকে আবার একদল সত্যিকার আলিম, ধর্ম বিশারদ আর অভিজ্ঞ জ্ঞানী লোক বেরিয়ে আসে?

এই চিন্তায় হজরতজী (রঃ) অস্থির, অধীর হয়ে পড়লেন।

www.eelm.weebly.com

আরেকটা সমস্যা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) কে বেদনাকাতর করে তুললো। সেটা হচ্ছে শহরের মানুষেরা দ্বীনের ওপর চলাকে খুবই কঠিন মনে করে। তারা ভাবে ইসলামের পথে চলার মানেই হলো সংসার, পরিবার পরিজনকে একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। কাজেই এটা আমাদের জন্যে নয়। ওটা শুধু একদল মৌলভী, মাওলানা ও দরবেশদের জন্যে। এতো সুন্দর দুনিয়ার এই সুন্দরী স্ত্রী, এই কোমল মণিমুক্তার মতো ছেলেপুলে, জাকজমক ব্যবসা বাণিজ্য, চোখ ঝলসানো বিলাস ব্যসন, মনোমুগ্ধকর চিত্তবিনোদনের সামগ্রী সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে মৌলভী মুন্সী হওয়া যাবে না।

কাজেই এমন দুনিয়াছাড়া দ্বীনের ওপর চলা যখন আমাদের জন্যে সম্ভবপর নয় তখন মন দিয়ে সংসার ধর্ম করি। এখন তারা তাদের সম্পূর্ণ মানসিক ও দৈহিক শক্তি দুনিয়াদারীর পেছনে খরচ করছে।

মৃত্যু আখিরাতের কথা মনে এলে তাড়াতাড়ি ঝেড়ে ফেলছে সে চিন্তা। এ নিয়ে ভাববার সময় নেই। ও যখন আসার আসবে। তেমন সাংঘাতিক কি আর ঘটনা। কেউ তো মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে চিন্তা করছে না। সংসারের শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ যেটা যা নিয়ে ভাবছে না, সেটা নিয়ে আমি এতো ভাবি কেন?

শয়তানও তাই চায়।

মৃত্যু, কবর, হাশর, পুলসিরাত এসবকে ভুলে দুনিয়ায় মোহ মায়ায় পড়ে থাকুক। শহুরে মুসলমান ডুবে আছে দুনিয়ার চাকচিক্যের ভেতর। আর মর্মান্তিক ব্যাপার এই যে, তারা যে দুনিয়ার পিছনে ছুটছে তা মৃত্যু ও পরকালকে জেনেই। অর্থাৎ কাজটি কঠিন তাই ভবিষ্যত যতই লাভজনক হোক আমি করতে রাজি না। কাজেই দ্বীনহীন জীবনেই আমি নিমগ্ন হলাম। এতেই আমি খুশি। এতেই আমি তৃপ্ত।

এরা রিপুর ক্রীতদাস হয়ে গেল।

দুনিয়ার গোলাম হয়ে রইলো।

হাদিসপাকে বলা হয়েছে, 'পৃথিবী আর পৃথিবীর সব জিনিষ অভিশপ্ত। শুধু আল্লাহর স্মরণ ও তার সাথের যাবতীয়। আর জ্ঞানী ও জ্ঞান সন্ধানী ছাড়া।'

শহরবাসী ছেড়ে দিয়েছে শান্তিময় জীবনধারা, আপন করেছে তাকে আল্লাহ যা কিছু অভিশপ্ত করেছেন। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, দ্বীনের কথা বললে এদের নাভিশ্বাস ওঠে। তাড়াতাড়ি বলে, 'ভাই, আমাদের কথা ছাড়ুন। আমরা হচ্ছি গিয়ে দুনিয়াদার মানুষ।"

অনেকে একটু বিনয় মাখিয়ে বলে, 'দেখুন ভাই, আমরা হলাম দুনিয়ার কুকুর, পেটের গোলাম।'

অর্থাৎ, দ্বীন তাদের থেকে এতোদুরে, এতই তারা ইসলামের ব্যাপারে হতাশাগ্রস্থ যে মৃত্যু, পরকাল, আল্লাহর আদেশ ও নবীর আদর্শ এসব কথা শুনতে, ভাবতে মোটেই রাজী নয়।

www.eelm.weebly.com

মুসলমানের এ হতাশা কাটাতে হবে। তাকে উদ্ধার করতে হবে নফস ও বিপুর অক্টোপাশ আলিঙ্গন থেকে।

হজরতজী (রঃ) ভাবতেন।

তাঁর চিন্তাধারা এমন ছিলো যে, মুসলমানকে এ কথা বোঝাতে হবে দুনিয়াদারী বা সংসার ধর্ম পালন করা কোনো অপরাধ নয়। দুনিয়ার যাবতীয় কাজ কর্মের ভেতর দুটো জিনিষ যোগ করলেই সবকিছু দ্বীন হয়ে যায়। তা হচ্ছে, আল্লাহর আদেশ আর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। তাতে জগত সংসারকে ছেড়ে দিতে হয় না। কিংবা অতি আধুনিক মডেলের গাড়ি থাকলে তা দুমড়ে মুচড়ে বনে ফেলে দিয়ে আসতে হয় না।

দরকার হচ্ছে বড় প্রাসাদে স্মরণ করো আল্লাহকে। সুন্দর গাড়িতে চড়ে আদায় করো আল্লাহর কৃতজ্ঞতা। ব্যস হয়ে গেল দ্বীন। খুবই সহজ। সবাই চলতে পারে সেজন্যে দরকার অল্প একটু জ্ঞান। দ্বীনি জ্ঞান। সে জ্ঞান অর্জন করাও খুব সহজ। সামান্য পরিশ্রমে ওই জ্ঞানটুকু হাসিল করে এবার ঝাঁপিয়ে পড়ো কাজে কামে।

দ্বীন যে এতো সহজ তা সবাইকে বোঝানো দরকার। জনতার মাঝে গিয়ে। সবার কাছে বলতে হবে। তা সে যেই হোক। মন্ত্রীকে, সচিবকে, কর্মকর্তাকে, চাকুরিজীবিকে, ব্যবসায়ীকে, চাষীকে, শ্রমিককে, মজদুরকে, মালিককে, জমিদারকে, প্রজাকে, রাজাকে- সবাইকে। বুঝিয়ে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

এই বোঝানোর কাজটি এ সময়ের সবচেয়ে বড় ফরজ।

সবচেয়ে বড় কর্তব্য ও দায়িত্ব।

না বোঝানোর কারণে অজ্ঞ মুসলমান ইসলামকে সুকঠিন মনে করে, পারছে না দ্বীনের ওপর চলতে। পাচ্ছে না দ্বীনি জীবনের অনাবিল শান্তি আর সুখ। আজ তারা বঞ্চিত। এ জীবনে আর পরকালেও।

অজ্ঞতার কারণে যেটা দ্বীন ছিলো সেটাই দুনিয়া বা অভিশপ্ত হয়ে গড়ছে। আর ওই অভিশাপে জীবনেই ডুবে আছে শহরবাসী।

এসব চিন্তা ভাবনা নিয়ে তিনি মিয়াজি মুহাম্মাদ ঈসা ফিরোজপুরীকে একটা চিঠি দিলেন।

'---দুনিয়ার আসল পরিচয় কি? এ সম্পর্কে ক'জন ঠিক মতো জানেন। একটা ভুলের ওপর 'দুনিয়াদারি' শব্দটি দাঁড়িয়ে আছে। সবাই ভাবছে বেঁচে থাকার জন্যে উপায় আর উপকরণ গ্রহন বুঝি দুনিয়া। কখনো তা নয়। এটা গ্রহণ করার আদেশ রয়েছে। সে সব জিনিষ দুনিয়া যা গ্রহন করার আদেশ রয়েছে। সে সব জিনিষ দুনিয়া যা গ্রহণ করতে মানা করেছেন আল্লাহ (যেমন– সুদ)। সেগুলো অভিশপ্ত। আদেশ ও নিষেধের জ্ঞান অর্জন করে তা মেনে চললে সংসার ধর্মই দ্বীন হয়ে যায়। অন্যদিকে

www.eelm.weebly.com

আল্লাহর হুকুমগুলোকে অমান্য করে জাগত সংসারের অশুভ, অশুচি, অশুদ্ধ, গ্রহণ করা হলো দুনিয়া। ---'

দ্বীন হচ্ছে মুখের লালার মতো, হজরতজী (রঃ) বলতেন। 'ওটা মুখের ভেতর থাকার কারণে সব খাবার মজা লাগে, হজমও হয় ভালো। আল্লাহতায়ালা জাল্লাশানুহু সবার মুখেই লালা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তেমনি দরকার মতো দ্বীন সবার ভেতর আছে। আমাদের দায়িত্ব হলো দুনিয়ার সাথে ওই দ্বীনের মিলন ঘটানো। তাহলে দুনিয়াদারিতে বেহেশ্‌তী স্বাদ এসে যাবে।

আর দ্বীনি জ্ঞান সম্পর্কে হজরতজী (রঃ) এর মত ছিল, 'সাহাবা (রাঃ) বেশিরভাগই বয়স্ক ছিলেন। তাঁরা রাশি রাশি কেতাব পড়ে, মাদ্রাসার চারদেয়ালের কঠিন পরিবেশে আট দশ বছর ধরে প্রায় বন্দী জীবন কাটিয়ে বড় আলিম হননি। বরং সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্যে যখন যা জানা দরকার তা জেনে তাঁরা আমল করতেন। সাথে সাথে চর্চা। প্রথমে আলিম হলাম, তারপর চাকরি নিলাম, সবশেষে আমলের চর্চা করলাম এমন নয়'।

সাহাবা (রাঃ) দের ধারায় দ্বীনিজ্ঞান শেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন হজরতজী (রঃ)। 'সাহাবা (রাঃ) দের ঘর ছিলো, ছিলো ব্যবসা, চাষাবাদ ও বিভিন্ন পেশা, নানান দায়দায়িত্ব ছিলো, ছিলো ব্যস্ততা ও কর্ম কোলাহল। তাঁরা এসবের মাঝে কখন আল্লাহতায়ালা রাব্বুল আলামিনের কী হুকুম আর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী আদর্শ জেনে নিতেন। তার উপর আমল করতেন।

সংসারের সব ঝুটি ঝামেলা সেরেই তাঁরা অর্জন করতেন দ্বীনি জ্ঞান। সেজন্যে মক্কা বা মদিনায় কোনো মাদ্রাসা ছিলো না। যদি থাকতো তবু সে মাদ্রাসায় প্রায় একযুগ ধরে ধর্মীয় জ্ঞানের চর্চা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু তাঁরা জীবন যাপনের যাবতীয় ক্ষেত্রের জন্যে যা যা ধর্মীয় জ্ঞান থাকা দরকার তা সব জানতেন।

সাহাবা (রাঃ) দের কাছে তাহলে দ্বীনি জ্ঞান কোত্থেকে এলো? তাঁরা তো জীবন যাপনে সব দরকারী মাসায়েল আর ফাজায়েলের ইলম জানতেন। এটা সম্ভব হয়েছিলো মসজিদে নববী'র চব্বিশ ঘন্টা যে জ্ঞানের মজলিশ বসতো তাতে বার বার বসে। তাছাড়া আগের মুসলমানদের সাথে সময় কাটিয়ে তাঁদের চলাফেরা, ওঠাবসা, আচার ব্যবহার দেখতেন। গভীরভাবে। নানান সফরে গিয়ে সময় মতো জেনে নিতেন আল্লাহর আদেশ ও নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। অর্থাৎ, পরিবেশ আর মহল থেকে পৃথিবীর মৌলিক নিয়মে তাঁরা জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

হজরতজী (রঃ) বলতেন, 'সে যুগের সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুদের মতো অতো উঁচু পর্যায়ের জ্ঞান আমরা হয়তো অর্জন করতে পারবো না। কিন্তু কিছু জ্ঞান ওই ওনাদের চলা পথেই আমরা পাবো। আমার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য সেটাই।'

www.eelm.weebly.com

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) এর অভিমত এই যে, 'ফের সেই চৌদ্দশো বছর আগের আলোচিত সমাজ ফিরে পাবার একমাত্র উপায় হলো– শহরে জাঁকজমক পূর্ণ আর জৌলুসময় সৌন্দর্যের মোহমায়ায় আটকে পড়া মুসলমানকে কিছুদিনের জন্যে মসজিদের দ্বীনি পরিবেশে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সময় কাটাতে হবে। যেখানে অনুভব ও বোধ সুতীক্ষ্ণ হবে। আসবে তীব্র ভীষণ চেতনা। তারপর যা তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছে থাকার পরও আমল করতে পারেনি সেসব সহজেই সেরে নিতে পারবে। কুড়ি পঁচিশ বছরের আঁধার মাত্র চল্লিশটি দিন বা চার মাসে দূর হয়ে আলো ঝলমল জ্যোতির্ময় জীবন পাবে। যে দোয়া কুনুত বা জানাজার নামাজ জানতো না সে শত বিষয়ের জ্ঞানে গুণান্বিত হয়ে যাবে। এতোগুলো বছরে সে এগুলো জানতে চেয়েছিল, শিখতে ইচ্ছে করেছিল কিন্তু, পারেনি। কারণ পরিবেশ। আজ মাত্র কটা দিন ওসব পরিবেশ থেকে আলাদা হয়ে একটু নিরালায় দ্বীনি চর্চা করে এতো উন্নতি হচ্ছে।

সেজন্যে লোকজনকে শহরের, ঘরের, অফিসের, চাষাবাদের, দোকানের মৃত পরিবেশ থেকে কিছুদিনের জন্যে নিজের জান মাল সহ বের হবার জন্যে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতে হবে। এতে তারা পুরনো স্বভাব ও অভ্যেসের প্রভাব কাটাতে পারবে। এখানে নেই কর্মচাঞ্চল্য, অস্থির রুদ্ধ মস্তিষ্ক– যা সবসময়ই এটা চাই ওটা চাই নিয়ে ব্যস্তটা তার হাত থেকে মুক্তি পাবে। তখন তার ঘুমিয়ে পড়া অচেতন দ্বীনি বোধ ও অনুভূতি ফের আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠবে। দ্বীনের জন্যে, দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্যে তারা হয়ে উঠবে আগ্রহী আর প্রচণ্ডভাবে উৎসাহী।

হজরতজী (রঃ) দেখেছিলেন শহুরে মানুষের বিলাসী জীবন। দীর্ঘদিন ধরে তারা বাস করছে এখানে। পাচ্ছে আরাম আর আয়েসের যাবতীয় উপায় উপকরণ। তাতে তারা বুঁদ হয়ে রয়েছে। ফলে মুসলমানদের যে জীবন যাপন তা থেকে তারা পুরোপুরি অজ্ঞ। ইসলামী জীবনের মূল যে আদর্শ তা তাদের সামনে পরিষ্কার ছিল না। মুসলমান তো ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইসলাম যাতে জারি থাকে, তার প্রচার ও প্রসার হয় সেজন্যে যদ্দুর পারে সেবা ও সাহায্য করবে নিজে থেকে। নইলে যারা এ কাজ করছে তাদের সহযোগিতা করবে। তারপর দ্বীনি কাজে নিজেই মাঠে নেমে পড়ার উদ্যম ও উদ্দীপনা মনের ভেতর রাখবে। মারাত্মক কোনো অসুবিধে থাকলে হয়তো খানিকটা অবসর নিতে পারে। তিনি মনে করতেন সাহাবা (রাঃ) যে হিজরত ও নুসরতের জীবন যাপন করেছেন সে তুলনায় শহরবাসীর জীবন বিলাসী জীবন। আর এটা তাঁর ভাষায় ভুল জীবন। পশুর জীবন এমন হয়। মাওলানা (রঃ) এর অন্তর জ্বলতো, পুড়তো। নিরন্তর দগ্ধ হতেন। তিনি চাইতেন শহুরে লোকেরাও দ্বীনি মেহনতে অংশ নিক। বেছে নিক হিজরত ও নুসরতের জীবন।

কিন্তু এভাবে নয় যে একদল হিজরত করছে অন্যদল তার সাহায্য সহযোগিতা করছে। টাকা, খাবার বা অন্যান্য উপহার দিয়ে। তিনি এ ধরনের আলাদা গোষ্ঠী তৈরি

www.eelm.weebly.com

হওয়াকে পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে যে হিজরত করবে সেই আবার নুসরত করবে। যে আজ নুসরতে আছে, সে হিজরত করবে। এটা যেমন প্রত্যেকে খিদে পেলে খায় তেমন। কেউ একথা বলেনা, 'ও খেয়ে নিক, আমি ঘুমোই। আমি খাই ও ঘুমোক।' এমন ভাগাভাগি মৌলিক চাহিদাগুলোর ক্ষেত্রে হয় না। যেমন ও খেলেই তো আমার পেট ভরে গেল। বা তিনি ঘুমালেই আমার ঘুম হয়ে গেল। এটা অবাস্তব। বরং যিনি খান তিনিই ঘুমোন। বিশ্রাম নেন। একই লোক দুটো কাজ করছেন। তেমন দ্বীনের ব্যাপারেও কেউ দ্বীনি কাজ করবে আর আমি আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করবো। আর তাতেই বেড়া পার। এসব ধারণার প্রতি তিনি খুব অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত ছিলেন। তাঁর মতে সবাই দ্বীন শিখবে। সবাই দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করবে। সবাই হিজরত করবে। সবাই নুসরত করবে। সবাই সব কাজে এগিয়ে যাবে। তবে গোটা জাতির একটা পূর্ণাঙ্গ উত্থান হবে। একটা পরিপূর্ণ বিপ্লব ঘটবে।

এর সাথে সাথে রুজি রোজগার, ঘর সংসার দুনিয়ার যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবে।

সাঁকো

এক চিঠিতে হযরতজী (রঃ) লেখেন--

'-- শুধু মসজিদের মিম্বরে বসে বেহেশত, দোজখ ও শরীয়ত সম্পর্কে বক্তৃতা করলে দ্বীন আসবে না। খানিকটা প্রতিক্রিয়া হবে। তবে তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী নয়। শ্রোতাদের জীবনে আমল বা নেক কর্ম আনার জন্যে দরকার ওয়াজের পরে এমন কর্ম পদ্ধতি যা তাদেরকে নেক আমালের দিকে ঠেলে দেবে আর তার চর্চা করিয়ে তাদের অভ্যেসে পরিণত করবে। এটাই একমাত্র উপায়।

তা নইলে ওয়াজের শেষে শ্রোতাদের ওয়াজের বিষয়বস্তু বা ধর্ম বিষয়ে নানান অসভ্য ও অশিষ্ট মন্তব্য করার অভ্যেস তৈরী হয়ে যাবে।'

হযরতজী (রঃ) এবার শহরে জামাত পাঠানো শুরু করে দিলেন। মেওয়াতের ওইসব মানুষের জামাত যারা দুনিয়াবী দৃষ্টিতে গেঁয়ো, মূর্খ আর গরীব। কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে তারা অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। কারণ জান, মাল ও সময়ের কোরবানী দিয়ে তারা একটা স্তরে পৌছেছিলেন।

পয়লা দিকে জামাত তিন, পাঁচ, বা দশ দিনের জন্যে থাকতো। ধীরে ধীরে সময় বাড়াতে লাগলো। এবার দীর্ঘদিনের জন্য ওরা শহরে এলো। শুরুতে জামাতগুলোকে কেউ সহ্য করতে পারতো না। শহরবাসী ও সৌখিন মুসুল্লিরা বড় হেয় দৃষ্টিতে দেখতো এদের। কেউ বসতো না। কেউ সাড়া দিত না মেওয়াতিদের ডাকে।

করুণ অবস্থা।

www.eelm.weebly.com

শহরবাসী ভাবতো আমরা শিক্ষিত, ধনী। এরা আলিম নয়, মূর্খ গরীব। পোশাক আশাক নোংরা, এরা কী বলবে যা আমরা শুনবো!

কোনো মসজিদে তো রাতে থাকা নিষেধ করে দিল। জামাতগুলো বেশ বিপাকে পড়লো। অনেক কষ্ট আর বিড়ম্বনার মধ্যে থেকেও তারা মেহনত করে যেতে লাগলো। থাকাটা হয়তো খোলা আকাশের নিচে হতো কিন্তু যে সব প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছিলো সেগুলো সারতে বিরাট লজ্জার মধ্যে পড়তে হলো।

তবু শহুরে মানুষের মন গলেনি। তারা জামাতের লোকদের গালিগালাজ করতো। নানান অভিযোগ করতো তাদের বিরুদ্ধে। এক চরম তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। তারা সবই সহ্য করে নিত।

মেওয়াতিরা হযরতজী (রঃ) এর সংস্পর্শে থেকে ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক হয়েছিল। তারা সবই সহ্য করে নিত। দিল্লীর শহরে যারা সাথী ছিল তাদের অবস্থা শাঁখের করাতের মতো। একবার শোনে মেওয়াতিদের অভিমান আর অনুযোগ। আবার এলাকাবাসী ক্রুদ্ধ মুসুল্লিদের রাগ ও অভিযোগ। তারা মহল্লাবাসীদের শান্ত করেন মাফ চেয়ে, খোশামদ তোষামদ করে। আবার জামাতিদের শেখান ধৈর্য্য ধরার কথা বলে। সামনে আল্লাহতায়ালা রাব্বুল আলামিনের সাহায্য আসছে– এসব শুনিয়ে।

একসময় অস্থির করে তুললো তাদের দু'দল মিলে। এ ছিলো মুহাজির ও আনসারদের জন্যে এক অগ্নিপরীক্ষা। যার আগুনে তারা প্রতি মুহূর্তে পুড়ে যেত। তার প্রভাব প্রতি পলে তাদের সাহস ও আত্মবিশ্বাস ও মনের দৃঢ়তা ভেঙ্গে চুরে গুঁড়িয়ে দিতে চাইত।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) একবার নয়, বেশ ক'বার বলেছেন, 'মিয়াজি দাউদ। তাঁর কাজ ছিলো শহরবাসী আর মেওয়াতীদের মাঝের নানান অমত ও অমিলকে সমঝোতায় আনা। একদল সম্পর্কে অন্যদলকে ভালো ধারণা দেয়া। দু'দলের মাঝে সুন্দর সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। আসলে কাজটি ছিলো সুকঠিন। দু'দলের অভিযোগ, অনুযোগ, দোষ ত্রুটির আলোচনা শুনতে শুনতে দিশেহারা, বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন মিয়াজি। শেষমেশ একদিন, গভীর রাতে খুব কাঁদলেন তিনি। সকাতরে। তাঁর ব্যাকুলতা ও কান্নাকে কবুল করে নিলেন আল্লাহতায়ালা রাব্বুল আলামিন। শহরে কাজের রাস্তা খুলে গেল। আচমকা শহরে খুব বেড়ে গেল কাজ। লোকজন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল। এমন সব লোক এই কাজ করার জন্যে দাঁড়িয়ে গেলেন যারা শহরের খুব প্রভাবশালী। বিরোধিরা তা দেখে কেউ চুপসে গেল, কেউ কেউ এই কাজে লেগে গেল।

শহুরে লোকদের আচার ব্যবহার, দেখার ভঙ্গিমা পাল্টে গেল। মেওয়াতিদের অজ্ঞতা ও ঘৃণা করার বদলে তারা তাদের ভালবাসতে শুরু করলো।

www.eelm.weebly.com

আসলেই মেওয়াতিরা এই দ্বীনের জন্যে দিয়েছিলো অসীম ত্যাগ, তিতিক্ষা। প্রচণ্ড উৎসাহ আর উদ্দীপনায় কাজ করতো তারা।

আর এসব কিছুই করতো আল্লাহকে রাজী খুশি করার জন্যে। এটাই ছিল তাদের সব ক্ষমতার উৎস।

শহর অভিমুখে

হযরতজী (রঃ) দিল্লির কাজের উন্নতি দেখে সব বড় বড় শহরে জামাত পাঠানোর জন্যে উৎসাহিত হলেন। সে সময় কোলকাতা শহরে সুন্দর দ্বীনি পরিবেশ ছিলো। সেখানের ব্যবসায়ীদের সাথে উঠা বসা করলে সহজেই যে কোনো লোক নামাজী ও দ্বীনদার হয়ে যেত। কোলকাতা শহরের দ্বীনি পরিবেশের সাথে মিশে তাউড়ু এলাকার কশাইদের মধ্যেও, নামাজ, দ্বীনি প্রেরনা ও বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা জমেছিল। তাছাড়া জামাতের সাথীদের সাথে কশাইদের বন্ধুত্ব থাকায় জামাতকে তাঁরা দাওয়াত করে খাওয়ানোর জন্যে খুবই অনুরোধ জানাতে লাগলো।

পৃথিবীর প্রাচীন আর মানুষে ঠাসা শহর কলকাতা। এখানে মেওয়াতের জামাত খুবই অভ্যর্থনা ও সম্মান পেল। জামাতের কাজের কথা তারা শুনলো। কাজ করার জন্যে একাত্মতা ঘোষণা করলো। মসজিদে মসজিদে জামাত তৈরি হলো। তারা এলাকায় কাজ করবে বলে ওয়াদা করলো। এছাড়া তিনদিন, দুদিনের জন্যে অনেকে বের হলো।

তখনকার দিনে দাওয়াত খাবার শর্ত ছিলো যারা মেজবান তাদের আল্লাহর রাস্তায় বের হতে হবে। কোলকাতাবাসী রাজি হলো।

কাজেই তাদের অবিরাম অনুরোধে জামাত দাওয়াত কবুল করলো। অবশ্য এর আগে বিভিন্ন বস্তিতে জামাতকে খাবার জন্যে অনেক অনুরোধ করার পরেও কারো নিমন্ত্রণ কবুল করেনি জামাত। হযরতজী (রঃ) এর নির্দেশ ছিলো তেমনি। সব সফরে জামাতের সাথীরা নিজেরাই রান্না করে খেয়েছেন। সাথীরা নিষ্ঠার সাথে বলতেন, 'মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে তাদের খাবার খাওয়া এটা লজ্জার বিষয়। কারণ এমন চললে অনেকটা ভিক্ষার ভান হয়ে দাঁড়ায়। যা হোক কশাইদের দাওয়াতে খুব বড় ধরনের আয়োজন হলো। ঠিক হলো হযরতজী (রঃ) সহ জুম্মার নামাজ শেষে খাওয়া হবে।

এদিকে হযরতজী (রঃ) জুম্মার আগে আগেই দিল্লীর কিছু ব্যবসায়ীকে নিয়ে বিশাল ডেক ভর্তি জর্দা, পোলাও নিয়ে উপস্থিত। এগুলো এতদূর পথ বেয়ে আনতে হযরতজী (রঃ) এঁর খুব কষ্ট হয়েছে ভেবে কোলকাতার কশাইরা মন খারাপ করলো।

www.eelm.weebly.com

হযরতজী (রঃ) বুঝতে পেরে বললেন, 'ভাই, মন খারাপ করার কি আছে? তোমাদেরর দাওয়াত কবুল করেছি। আমি যা এনেছি ধরে নাও এও তোমরাই তৈরি করেছো। নাও, এগুলো তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাও। আমরা তোমাদের তৈরি খাবার খাই আর আমাদের খাবার তোমরা খাবে। তোমাদের প্রতিবেশিদেরকেও দেবে। এতে কোনই অসুবিধে নেই।'

হযরতজী (রঃ) এর এই কথা শুনে তারা সীমাহীন খুশি হলো। জুম্মার নামাজ শেষ। হযরতজী (রঃ) সবাইকে এই কাজ করার ও আল্লাহর রাস্তায় বের হবার দাওয়াত দিলেন। সবাই মেহনত করার ওয়াদা করলো। হযরতজী (রঃ) খুব খুশি হলেন। সবার কাছে আগামীতে এই মেহনত করার ওয়াদা নিয়ে দোয়া করলেন।

শহরবাসী কারো চোখ শুকনো রইলো না।

শহরের কাজ ওঠা শুরু হলো।

রাজধানী দিল্লীতে নতুন নতুন কর্মী কাজে এলো। তাদের প্রাণের জোয়ারে চঞ্চল হয়ে উঠলো শহর। নাগরিক নোংরামি থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হলো মুসলমান যুবক, বৃদ্ধ ও বালক। এখানের কাজকে সুন্দর ও সাজানোভাবে করার জন্যে একজন আমিরের দরকার পড়লো।

হযরতজী (রঃ) দিল্লীর কাজের জিম্মাদার হিসেবে হাফেজ মকবুল হুসাঈনকে পছন্দ করলেন। এছাড়া অত্যন্ত দায়িত্বশীল জ্ঞানী গুণী কর্মঠ কর্মী হচ্ছেন ফখরুদ্দিন সাহেব। তিনিও হাফিজ মকবুল সাহেব মিলে এ শহরের কাজকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল করলেন।

এ দু'জনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় জিম্মাদার ও কর্মঠ কর্মীদের মাঝে খুব সুনিবিড় সম্পর্ক তৈরি হলো। যোগাযোগ, সাক্ষাৎকার বেড়ে গেল। কাজের মাঝে গতি ও প্রাণের সঞ্চার হলো। শহরের বেশিভাগ সাথী বৃহস্পতিবার নিজামুদ্দিন চলে আসতেন। কেউ আসর নামাজে অংশ নিতেন, কেউ মাগরিব। বিছানাপত্র ও রাতের খাবার নিয়ে হাজির হতেন। ওখানের নুরানী কথা আর পরিবেশের প্রভাব তাদের অন্তরে পড়তো। সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী আমল ছিলো রাত্রি যাপনের পর ফজরবাদ বয়ান। কারণ রাতে প্রায় সবাই তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন। কান্নাকাটি ও দোয়া হতো। তাতে অন্তরের জমিন নরম, কোমল ও উর্বর হয়ে যেতো। সকালের বয়ানে যেন এই উর্বর জমিতে বীজ বোনা হতো। ওখান থেকে ফিরে সাথীরা গোটা সপ্তাহব্যাপী প্রচণ্ড ঐকান্তিকতা আর আগ্রহ নিয়ে প্রতিদিনের মেহনত করতো। সাপ্তাহিক গাশতে প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হতো।

শহরে টুপি, দাঁড়ি, সুন্নাতি পোশাক আশাকের মানুষ নজরে এলো। ক্রমশঃ তার পরিমান বেড়ে গেল। দ্বীনি উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ার এলো যেন।

www.eelm.weebly.com

বৃহস্পতিবার রাতেই শহরবাসী পুরো সপ্তাহের কর্মসূচী তৈরি করে নিত। পরামর্শ করে। সে অনুযায়ী হপ্তাভর কাজ চলতো।

কাজকে আরো আঁটসাঁট ও গভীর করার জন্যে মাসের শেষ বুধবার শহরের সব কর্মীদের ডাকা হতো। মাসব্যাপী কাজের বিবরণ শোনা হতো। ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ঠিক করে দিতেন স্বয়ং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ (রঃ)। তিনি মাসিক এ সমাবেশে হাজিরা দেয়া কিছুতেই ছাড়তেন না। বিবরণ বা কারগুজারি শোনার পর পরমার্শ করে নেয়া হতো আগামী এক মাসের কাজের কর্মসূচী।

মাসিক এ সমাবেশে হযরতজী (রঃ) তো নিজে আসতেনই সাথে সাথে বড় ওলামা কেরামদের ও নিয়ে আসতেন।

এভাবে বৃহস্পতিবার নিজামুদ্দিনে রাত কাটানো আর মাসিক সমাবেশ কর্মীদের ভেতর এ কাজের জন্যে এক মায়া, এক আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতো। সবাই এ কাজকে নিজের কাজ মনে করতো।

শহরের পরিবেশ দিনে দিনে উন্নত হলো।

বৃহস্পতিবার রাতে হযরতজী (রঃ) নিজে শহরবাসীর সাথে খাওয়া দাওয়া করতেন। এশার নামাজের পরে ও আগে তিনি তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজের গুরুত্ব ও মাহাত্ম আলোচনা করতেন। এই কাজের লাভ শুনিয়ে অব্যাহত গতিতে এ কাজ করার জন্যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জানাতেন।

মাঝে মাঝে হযরতজী (রঃ) এতো আবেগতাড়িত হতেন যে অনেকক্ষন ধরে সীমাহীন ব্যাকুলতা নিয়ে কথা বলে যেতেন। তখন আর তার সময় জ্ঞান থাকতো না।

কখনো কখনো কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যেতেন। চুপ। চোখ দুটো কোন সুদূরে। সব অনুভূতি যেন লোপ পেয়ে গেছে। তন্ময়, গভীর ধ্যান মগ্ন। তারপর হঠাৎ জেগে উঠতেন। শুরু হতো কথা বলা। ফের। তখন এশার নামাজ পড়তে বেশ দেরি হয়ে যেত।

একবার।

সেটা ছিলো নভেম্বর মাস।

কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেল। ঠিক বারোটায় এশার নামাজ পড়া হলো। শুক্রবার ফজরের পরের কথা তিনি নিজেই বলতেন। মাঝে মধ্যে কোনো ওলামাকে দিয়ে কথা বলাতেন যার ওপর তিনি আস্থা রাখতেন।

লোকজনের আগ্রহ ওইসব বক্তব্য শোনার ব্যাপারে এতো বেড়ে গেল যে তারা রাতে নিজামুদ্দিনে নিশিযাপন না করলেও ফজরের নামাজে শরীক হতেন। তারপর বয়ানে বসে যেতেন। এদের মাঝে দিল্লির শিক্ষিত মহল সাড়া দিলেন বেশি।

যেমন জামিয়া মিল্লিয়ার শিক্ষকগণ, ডঃ জাকির হোসেন খান ও আরো সব জ্ঞানী গুণী হাজির হতেন।

www.eelm.weebly.com

বৃহস্পতিবার রাতে নিজামুদ্দিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। এরা সব ছিল শহরবাসী। সাথীদের উৎসাহ উদ্দিপনা বেড়েই চললো। নতুন অনেকে দাওয়াতের বরকতে হাজির হয়ে নতুন চেতনা, নতুন বুঝ নিয়ে ঘরে ফিরতো।

শহরবাসীদের ভেতর দ্বীনি এক সাড়া পড়ে গেল। বন্যার স্রোতের মতো হেদায়াতের আলো ভাসিয়ে নিয়ে চললো যতোসব কুফরি, শিরক, বিদআত আর নাফরমানির জঞ্জাল। সবচেয়ে বেশি সাড়া পড়লো ব্যবসায়ী মহলে। শহুরে ব্যবসায়ীরা বেশির ভাগই সুদ ও অন্যান্য অবৈধ উপায়ে রোজগার করতো। সৎ ব্যবসায়ীরা এদের দাওয়াত দিতেন।

সৎ ব্যবসায়ীদের সাথে ওরাও সাপ্তাহিক গাশ্‌ত শুরু করলো। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ধরলো। এক সময় বৃহস্পতিবার নিজামুদ্দিন মসজিদে রাত কাটাতে এলো। হযরতজী (রঃ) এর কথায় যে শোক আর ব্যথার লহরী ছুটতো তা ওদের অন্তরকে স্পর্শ করে যেতো। তারা ধীরে ধীরে তাওবা করলো। হালাল রুজি রোজদারে উৎসাহিত হলো। একসময় তাদের জীবনে এলো আমূল পরিবর্তন। যা এই চৌদ্দশো হিজরিতে এক বিস্ময়কর ঘটনা ছিলো। দিল্লীর ব্যবসায়ীদের সাথে হযরতজী (রঃ) এর এক গভীর সম্পর্ক ছিলো। এসম্পর্ক শুরু হয়েছিল হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসমাইল এবং মাওলানা মুহাম্মাদ এর জামানা থেকেই। সেটা আরো গাঢ় গভীর হলো হযরতজী সময় এসে।

এসব ব্যবসায়ীরা আরো নতুর ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করালেন। তাদের মাঝে বেশ কিছু যুবক ছিলো। তারা হযরতজী (রঃ) এঁর ব্যক্তিত্বের পূজারী ছিল। তারা তাঁর কথা শুনতেন গভীর শ্রদ্ধা আর আগ্রহ নিয়ে। শহরের যে কোনো দ্বীনি চাহিদা পুরো করার জন্যে সব সময় তৈরি থাকতেন। তার মানে তারা হযরতজী (রঃ) ও তার দ্বীনি কাজের যে কোনো সেবা ও সহযোগিতা করাকে গৌরবের মনে করতেন।

হযরতজী (রঃ) গেঁয়ো মেওয়াতিদের পরে এসব ধনী শহুরে ব্যবসায়ীদের ভালবেসে ফেলেছিলেন। এসব শহুরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিরাট এক জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিলো। যা এই যান্ত্রিক ও বিজ্ঞান যুগে প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। এরা সপ্তাহের প্রায় দিনই অবসর পেলে নিজামুদ্দিনে হযরতজী (রঃ) এঁর সান্নিধ্যে চলে আসতেন। কথা শুনতেন। কোনো দ্বীনি চাহিদা থাকলে সেগুলো পুরো করতেন। তাছাড়া বৃহস্পতিবার রাতে নিয়মিত তারা এসে রাত্রিযাপন করতেন।

দিল্লীর ব্যবসায়ীরা জানের কোরবানীর সাথে মালেরও খরচ করতেন। যে কোনো এলাকায় বিশেষ করে মেওয়াতে কোনো সমাবেশ বা জলসা হলে গাড়ি বোঝাই খাবার দাবার নিয়ে তারা হাজির হতেন। তারপর সেসব সমাবেশের সফলতার জন্যে বিভিন্ন গাশ্‌ত বা সাক্ষাৎকারে চলে যেতেন। এছাড়া ওসব শহুরে ব্যবসায়ীরা যখন নিজেরা কোনো অনুষ্ঠান বা দ্বীনি কর্মসূচি গ্রহণ করতো তখন হযরতজী (রঃ) নিজে সেখানে চলে

www.eelm.weebly.com

যেতেন। সেখানে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজের প্রয়োজনীয়তা ও লাভের কথা শোনাতেন। এদেরকে হযরতজী নিজ ছেলের মতো স্নেহ ও মায়া করতেন। ওরা খুশি ওরা দুঃখ পেলে তাঁর মনও খারাপ হতো। এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হলো তাঁদের মাঝে।

হযরতজী (রঃ) সব সময় ওদের বোঝাতেন তোমরা দুনিয়ার ব্যবসার চেয়ে আখেরাতের ব্যবসার দিকে ঝোঁক দাও। যুবকদের মায়া স্নেহ দিয়ে বোঝাতেন। আর বড়দের শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে আবেদন করতেন। কিন্তু বয়স্করা যদি দ্বীনি মেহনতে উদাসীনতা বা অলসতা করতেন তখন আপনজনের মতো তাদের বকাঝকা করতেন। তাতে ওইসব প্রবীণ লোকেরা মনে কিছু নিতেন না। বরং আরো খুশি হতেন।

তাঁদের মাঝের ভাব ভালোবাসা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে যেতো। শহরে বিশেষ করে ব্যবসায়ীমহলে একটা পরিবর্তনের ঢেউ লাগলো। একে অন্যকে দাওয়াত দেয়া, তাদের নামাজ, ঈমান শেখানো, সাপ্তাহিক গাশতে নিয়মিত শরীক হওয়া, তালিমের হালকা ক্রমেই বড় হয়ে চললো। এদের এই উন্নতির কারণ ছিলো, (১) এই কাজের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ ভালবাসা। আর (২) হচ্ছে হযরতজী (রঃ) এঁর সাথে গভীর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক।

দ্বীনের মেহনতে তারা জান মাল অক্লান্তভাবে খরচ করলো। সমাজের সর্বত্র এলো বিরাট দ্বীনি জাগরণ। তাদের জীবন ও সমাজ, পরিবার ও সংসার, লেনদেন ও আচার ব্যবহার সবজায়গায় লাগলো দিন বদলের হাওয়া।

হযরতজী (রঃ) এঁর দাওয়াত ছিলো ঈমান ও নামাজের। কিন্তু শহরবাসী কালিমা নামাজের মেহনতে শরীক হয়ে শরীয়তের সবকটা শাখার সবধরনের হুকুম আহকাম খুবই গুরুত্ব সহকারে আমল করতে লাগলো। অথচ শরীয়ত সম্পর্কে হযরতজী (রঃ) খুব কমই আলোচনা করতেন। আসলে তিনি গোড়ার রোগ ধরতে পেরেছিলেন। নাড়ির রোগ ছিলো ঈমান। ঈমানী দুর্বলতার কারণে শরীয়তের সবকটা আদেশ অমান্য করে চলেছিলো জাতি। কাজেই নাড়ির রোগ ঈমানী দুর্বলতা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে কেটে গেল। একটু একটু করে ঈমানের হাক্কীকাত (আসল রহস্য) অন্তরে দানা বেঁধে উঠলো। তার সাথে সাথে তাল মিলিয়ে তাদের ভেতর আসতে লাগলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের সবকটা শাখায় চলার প্রচণ্ড আগ্রহ ও অভ্যেস। দ্বীনি প্রতিটি বিধানের প্রতি তাদের অন্তরে এলো শ্রদ্ধাবোধ ও আকর্ষণ। আর এটা হলো ফাজায়েলে ইলমের হালকায় বসার কারণে।

আরেকটা জিনিস এলো তাদের ভেতর। সেটা হচ্ছে আল্লাহওয়ালাদের সংসর্গ। এতে আপনা আপনি আদর্শ আমলগুলোর প্রতি এদের শখ ও আগ্রহ জন্মালো। তাঁদের জীবন যাপনের শুদ্ধতা, মৌলিকত্ব আর আদর্শ শহরবাসীকে করলো আকর্ষিত আর চমৎকৃত। তারাও সে ধরনের আমলের জন্যে হয়ে উঠলো আগ্রহী ও উৎসাহীত।

www.eelm.weebly.com

তাছাড়া ওরা নিয়মিত নিজামুদ্দিনে এসে হযরতজী (রঃ) ও অন্যান্য বুজুর্গদের পাশে থেকে অনেক কিছু শিখলো। তাদের বাহ্যিক ও ভেতরের আধ্যাত্মিক প্রভাব পড়লো এদের মনে।

শহরে, দোকানে, ব্যবসা মহলে আলোড়ন উঠলো। অন্য সব ব্যবসায়ী যারা এই কাজের সাথে জড়িত নয় তাদের জন্যে তাবলিগী ব্যবসায়ীরা আদর্শ হয়ে দাঁড়ালো। তারা দ্বীন ইসলামের নিবেদিত প্রাণ কর্মী হয়ে গেলেন।

দেখা গেল, যে ব্যবসায়ী তার দোকানে দাড়িওয়ালা, নামাজী কর্মচারি রাখতে নারাজ ছিলো তিনি নিজেই দাড়ি রেখে ফেললেন। দোকানী বা ব্যবসায়ী ব্যস্ততার জন্যে যারা ওয়াক্তের পর ওয়াক্ত নামাজ কাজা করে ফেলতেন, তারা আজানের শব্দ শুনেই বেহুঁশ বেকারার হয়ে দোকান পাট,ব্যবসা বানিজ্য বন্ধ করে কর্মচারী সহ চলে যেতেন মসজিদের দিকে।

সাপ্তাহিক গাশ্‌তে শরীক হবার জন্যে সেদিন চলে আসতেন শত ব্যস্ততা ঠেলে ফেলে। তেমনি বৃহস্পতিবার রাতে নিযামুদ্দিনে আসা তাদেরকে কোনো প্রলোভনেই বেঁধে রাখতে পারতো না।

ধীরে ধীরে আখেরাতের হাকিক্বাত, চেতনা তাঁদের অন্তরে খুলে যেতে শুরু করলো দুনিয়ার তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা আর অনিত্যতা চোখের সামনে স্পস্ট হলো। এক একজন ব্যবসায়ীর ঈমান ও আমল আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের মতো হয়ে গেল।

যেসব শহুরে ধনী ব্যবসায়ী দশগজ নিজেদের সুদৃশ গাড়ি ছাড়া চলতে পারতো না তারা আল্লাহর রাস্তায় মাইলের পর মাইল হাঁটলেন। তাদের ঘরের বাজারের জন্যে ছিলো দু'চার জন চাকর। ওরাই নিজ হাতে বাজারের থলি নিয়ে রওনা হয়েছেন জামাতের সাথীদের খেদমতে। কারণ খিদমতে আল্লাহকে পাওয়া যায়। বন্দেগী করে বেহেশত। যাদের ঘরে ছিলো রাজকীয় কারুকার্য করা পালঙ্ক আজ তারাই মসজিদের মেঝেয় একটা কাঁথা পেতে শুয়ে আছে। যাদের সেবার জন্যে দু'চার দশজন চাকর রয়েছে তাদের দেখা যাচ্ছে জামাতের বুজুর্গ, বয়স্ক ও অসুস্থ সাথীর হাত পা দাবিয়ে দিচ্ছে। যাদের ঘরের দুয়ারে মুখাপেক্ষী দরিদ্ররা দাঁড়িয়ে থাকতো সামান্য সাহায্যের আশায়, আজ তারা সেই দরিদ্র মানুষদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে খোশামদ তোষামদ করছে। ঈমান ও নামাজের দিকে আনার জন্যে।

তাদের মিথ্যে অহংকার,গর্ব, অকর্মন্যতা, অশিক্ষা, আর অজ্ঞতা রাতারাতি চলে গেল। সেখানে এলো বিনয়, বন্দেগী, রাত জাগা, দোয়া, কর্মদক্ষতা, উৎসাহ, উদ্দিপনা জ্ঞান আর সুশিক্ষার আলো।

অভাবনীয় পরিবর্তন!

যুগান্তকারী এক বিপ্লব। ঘটে গেল।

নিরবে। নিঃশব্দে।

www.eelm.weebly.com

দ্রুত।

দ্বীনি জাগরন এলো শহরে।

ধনী লোকদের মাঝেও। আর সেটা ছিলো এই কাজের জন্যে একটা বিপদ। কারণ ধনী এবার তাদের মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে প্রচণ্ড আগ্রহী হয়ে উঠলো। তারা অকাতরে অর্থকড়ি নিয়ে হাজির হলো হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) এর দরবারে। তিনি ভয় পেলেন। কারণ তিনি জানতেন এ জিনিস মুহাম্মাদ অভিশপ্ত। এ একবার ভেতরে ঢুকলে আর হেদায়াতের পথে মানুষকে টানা যাবে না। দ্বীনের কাজে মাল থাকা শর্ত নয়। কোরবানী বা ত্যাগ শর্ত। কিন্তু লোকজন এসব অর্থকড়ি দিয়ে ভাববে আমি দ্বীনের জন্যে কোরবানী দিয়েছি। হযরতজী (রঃ) এর ভাবনা ছিল অন্য। তিনি বলতেন,'যে জান লাগাবে সেই মাল দেবে। একজন জানের খাটুনি দেবে অথচ মালের খরচ করবে না। কিংবা একজন মালের কোরবানী দেবে অথচ জানের কষ্ট করবে না।'

দ্বীন ইসলামে এমন কোন বিভাজন নেই।

কাজেই তিনি সবাইকে ফেরাতে লাগলেন। তিনি অর্থ ও বিত্তকে কখনো মানুষ ও তার দেয়া সময়ের বিকল্প মনে করতেন না। তাঁর চিন্তাধারা হচ্ছে অর্থ সম্পদ হচ্ছে হাতের ময়লা। মানুষের মতো দামী সে কখনো হতে পারে না।

তিনি বলতেন, 'এসব নিয়ে তোমরা ফিরে যাও। আমি তোমাদের টাকা পয়সা চাই না। আমার দরকার তোমাদের মহামূল্যবান সময়।'

কিন্তু তারপরেও যেসব সাথী দ্বীনের মেহনতে পূর্ণভাবে শরীক থেকে জানের কোরবানী দিয়ে যাচ্ছেন, প্রচুর সময় দিয়েছেন আল্লাহর রাস্তায়, দ্বীনের সত্যিকার জ্ঞান, চেতনা ও বোধোদয় হয়েছে, যাঁর কাছে অর্থ সম্পদের আসল হাক্বীকাত খুলে গেছে। এমন সব মানুষ বা কর্মী যখন অর্থকড়ি নিয়ে এগিয়ে এসেছে, তিনি তাদের ফেরাননি। হযরতজী (রঃ) বলতেন, 'পয়লা যুগে তারাই অর্থকড়ি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ব্যাপারে প্রথম কাতারে ছিলেন।'

জান ও মালের কোরবানী সমানভাবে দিয়েছিলেন। সে সময়ে দু'জন মানুষ। তাদের দু'জনের নামই বেশি আসে। তাঁরা হচ্ছেন সদরবাজারের হাজি নাজিমউদ্দিন আর মুহাম্মাদ শফি কুরাইশী।

তাছাড়া আরো বেশ'কজনের অর্থকড়ি তিনি সাদরে গ্রহণ করেছেন। যাদের সাথে কোন লৌকিকতার দূরত্ব ছিল না। দ্বীনের প্রয়োজনে তাদের সাগ্রহ আবেদন কবুল করতে পিছপা হননি।

www.eelm.weebly.com

কাজ বেড়ে চলেছে।

জনতার সব স্তরের লোকই কাজে অংশ নিচ্ছে। গাঁয়ের সহজ সরল মানুষ। আবার শহরের বুদ্ধিমান, উচ্চ শিক্ষিত। গাঁয়ের গরীব দরিদ্র চাষী কিংবা সেখানের জমিদার। শহরের দরিদ্র শ্রমিক, মজদুর, মেথর, কুলি আবার ধনী ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা।

কিন্তু নবীদের উত্তরাধিকাররা কোথায়?

'আমার এ কাজে যখন, ওলামায়ে কেরাম ও আরবীরা যোগ দেবেন তখন সফলতার মুখ দেখবে দ্বীনের মেহনত, বললেন হজরতজী (রঃ)। তিনি বলতেন, 'এখন আমরা যে মেহনত করছি তা যেন কূয়োতে ঢেউ দেয়া হচ্ছে। ওলামায়ে কেরাম ও আরবীরা যখন এ কাজে মন দেবেন, সক্রিয়ভাবে অংশ নেবেন তখন মহাসমুদ্রে ঢেউ উঠবে। সে প্লাবনে গোটা পৃথিবী ভেসে যাবে।'

তার চিন্তাধারা ছিল যে, যদি সাধারণ মানুষের তাবলিগকে ওলামায়ে কেরামের দেখাশোনার ও সতর্ক দৃষ্টির কষ্টিপাথরে যাচাই করে একাজ না করা হয় তাহলে দাওয়াতের কাজে খাদ মিশে যাবে। তখন লক্ষে পৌছানো খুবই কঠিন হবে।

কারণ এ কাজ খুবই সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর। কাজ চলার পথে সেসব স্তরে এলেই দরকার পড়ে একজন কোরান ও হাদিসে অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ আলিমের। তিনি সে সময় ওগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন কোরান ও হাদিসের ভিত্তিতে। তখন কাজে ভারসাম্য আসে।

সেজন্যে তাঁর অন্তরে প্রচন্ড তাড়না ছিল। কখন ওরা আসবে? যাঁরা এ কাজটিকে দায়িত্ব নিয়ে করার মাধ্যমে দ্বীন ও ইসলামের শুকনো বৃক্ষটিকে এমনভাবে পরিচর্যা করবেন যাতে ফের তাতে প্রাণের ছোঁয়া লাগে। প্রতিটি ডালপালায়, সবুজ রঙের পাতায়, ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে।

মাওলানা (রঃ) চেয়েছিলেন ওলামায়ে কেরামদের জ্ঞান, প্রতিভা, মেধা ও ব্যক্তিত্ব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথহারা উম্মতের ছিন্নভিন্ন বাগানকে সাজানো ও গোছানোর কাজে ব্যবহার হোক।

তাই শুধু তাদের বয়ান, ওয়াজ, কিতাব লেখা বা মুখের সহযোগিতা কামনা করেননি। তিনি চেয়েছিলেন ঠিক যেমনটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন উম্মতের হেদায়াতের জন্যে। তিনি যেমন যেচে পড়ে দুয়ারে ঘুরেছিলেন তেমন করে তাঁর উত্তরাধিকাররাও ঘুরুক। অর্থাৎ দ্বারে দ্বারে ঘুরে পৌছে দেবেন দ্বীনের বাণী। ওরা যখন আল্লাহর রাস্তায় বেরুবে তখন ওসব অজ্ঞ, মূর্খ, অবুঝ লোকগুলোকে হাতে কলমে দ্বীন শেখাবেন। শেখাবেন কালিমা তৌহিদ। তার মানে। তার ব্যাখ্যা। কি চায় আমরদের কাছে। নামাজ। নামাজের নিয়ম কানুন। ফরজ। ওয়াজিব। গুছ। নাপাক থেকে পাক হওয়া। সুরা কেরাত ঠিক করা।

www.eelm.weebly.com

এসব ভাবনা নিয়ে তিনি একটা চিঠি লিখলেন শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া (রঃ) কে। তাতে লিখলেন -

---- আজকাল আমার মনে একথা জাগছে যে, যাঁরা দ্বীনি জ্ঞান শিখছেন, শেখাচ্ছেন আর এর উন্নতির জন্যে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন তাদের আরো একটা বড় কাজ রয়েছে।

সেটা হচ্ছে তারা দ্বীনের জ্ঞান শিখে নিজেদের জীবনে তার আমল এনে সেই জ্ঞান ও কর্ম নিয়ে চলে যাবেন সর্বসাধারণের কাছে। তাদের দুয়ারে গিয়ে ডাক দেবেন দ্বীনের দিকে, মূর্খতা ও অজ্ঞতা থেকে জ্ঞান ও আলোর দিকে।

এখন যারা দ্বীনের দিকে আহবান করছে তারা সাধারণ গেঁয়ো মূর্খ ও সামান্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোক। শুধু এদের ঘোরাফেরা, ছুটোছুটির দ্বারা পূর্ণতা পাচ্ছে না কাজ। কারণ একজন অজ্ঞ মানুষ তার মনে যতই দ্বীনি আবেগ থাকুক না কেন সে অন্যের অজ্ঞতাকে দূর করতে পারে না।

এজন্যে ওইসব সহজ সরল সাধারণ মানুষের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানী গুণী মানুষ থেকে একসাথে দাওয়াত না দেন ততক্ষণ এ বিপ্লব চরম লক্ষে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।

সাধারণ জনতার ওপর আলিমদের প্রভাব সাংঘাতিক। তাদের কোনো সমাবেশে জোরেশোরে বড় ধরনের বক্তব্যে খুব একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে না। অথচ ওঁরাই যদি সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। নিজেদের প্রতিদিনের জীবন যাপন দেখান তাহলে তারা দ্বীন বুঝতে পারে। জেনে নেয় ইসলামী দৈনন্দিন জীবনের ধারা। এটা সম্ভব হয় তাদের পাশে থেকে তাদেরকে বাস্তব চর্চা দেখিয়ে শেখানোর দ্বারা। এজন্যেই জামাতে যাওয়া। সাথীদেরও শেখানো। আর জনপদের মানুষের পাশে গিয়ে দাওয়াত দেয়া।

আমার মনে হয় আমরা যাঁরা জ্ঞানচর্চার সাধনায় নিবেদিত প্রাণ তাঁরা জানেন এই নিয়মেই আমাদের মহান পূর্বপুরুষরা দ্বীন প্রসার ও প্রচার করেছেন।

এই সময়ে বেশ ক'জন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক যাঁরা শিক্ষাবিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন তাঁরা হযরতজী (রঃ) এর এই উদ্যোগে খানিকটা ভয় পেলেন। সেটা এই যে, ওলামা আর তোলাবা (ছাত্র) যদি দ্বীনি দাওয়াতের কাজে জড়িয়ে পড়ে তাহলে বুঝি শেখানো ও শেখার কাজে ক্ষতি হয়ে যাবে।

ব্যাপারটা আসলে তা ছিল না।

হযরতজী (রঃ) ধর্মীয় শিক্ষক ও ছাত্রদের দাওয়াতের কাজে জড়ানোর এমন নিয়ম ও রূপরেখা তৈরি করেছিলেন যে তাতে তাদের লেখাপড়ার ক্ষতি নয় লাভ ছিল নিশ্চিত।

www.eelm.weebly.com

দাওয়াতের কাজ তাঁরা করবে অবসর সময়ে। যখন তাঁরা দ্বীনের দিকে ডাক দেবেন তখন দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজন ও মূল্যায়ন স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে তাদের সামনে। তাঁদের জ্ঞানের গভীরতা, প্রজ্ঞার বিকাশ ঠিক পথে এগুবে। নইলে তারা বিধর্মীদের শিক্ষা, চলন বলন, আচার আচরণকে নিজেদের চেয়ে বড় জানবে। আর ওটা ওদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় মনে হবে।

দাওয়াত দিলে জ্ঞান অনুযায়ী আমল হবে।

আমলের মাঝে প্রাণ আসবে।

প্রাণ এলে আমলের প্রতিক্রিয়া (Action) হবে তাৎক্ষণিক।

তা দেখে বিশ্বাস গাঢ় হবে।

বিশ্বাস প্রগাঢ় হলে পারলৌকিক মুক্তি ঘটবে।

এক চিঠিতে এ সম্পর্কে লিখলেন–

'---- দ্বীনের উন্নতি হবে জ্ঞান অনুপাতে। জ্ঞানের পথ ধরেই দ্বীন সফলতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছুতে পারে। যতটুকু জ্ঞান ঠিক ততোটুকুই তার কর্ম। দাওয়াতের কাজের উদ্দেশ্য দ্বীনি জ্ঞানকে খুব তাড়াতাড়ি সর্বসাধারণের মাঝে পৌঁছে দেয়া। এ কাজটা করতে গিয়ে যদি জ্ঞান শেখা আর শেখানোর কাজে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় তাহলে মারত্মক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ইলমের চর্চা হচ্ছে চাহিদার চেয়ে সামান্য। কাজেই এর সাধনায় বাধা দেয়া অন্যায়। কিন্তু যদি জ্ঞান অন্বেষণ কারীরা সময় সুযোগ মতো দাওয়াতের কাজ করে তাহলে ইলম শেখার জন্যে তাদের আরো আগ্রহ বাড়বে। আর এর গৌরব ও মর্যাদা বুঝবে।'

হযরতজী (রঃ) তাঁর চিন্তাধারা এক চিঠিতে এভাবে জানিয়েছেন-

'----- আহা! কতই না ভাল হতো যদি জ্ঞান অন্বেষণকারীরা ছাত্র অবস্থায় তাদের শিক্ষকদের দায়িত্বে ভাল কাজের দিকে ডাকা আর মন্দ কাজ থেকে ফেরানোর কাজ শিখতো। আসলে তখনি জ্ঞান আমাদের কাজে লাগতো। হায়! দুঃখ! আজ ইলম আলো ছড়ানোর উল্টো আঁধার ও ভ্রষ্টতা টেনে আনছে। আল্লাহ মাফ করুন।'

হযরতজী (রঃ) সময় নিয়ে তৈরি জামাতগুলোকে পাঠালেন দ্বীনি কেন্দ্রগুলোতে। যেখানে রয়েছে ঝলমলে ধর্মীয় পরিবেশ। সেখানে ছাত্রদের ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন শিক্ষকেরা। একদিকে চলছে কোরআন হাদিস, আরবী, ফারসী, তাফসীর, ফিকাহ, ফারাইয শাস্ত্র ও মান্তেকের চর্চা অন্যদিকে সলুকের কঠিনতর স্তর ও মার্গ সমূহের উত্তরণের নিরলস প্রচেষ্টা। যেখানে হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাসাওউফ বা অধ্যাত্ম বিদ্যার মহত্তর জগত। যার সাধনায় মানুষ পেয়ে যায় ইন্দ্রিয়াতীত জগতের জ্যোতির্ময় অরূপ ঠিকানা। অদৃশ্য অচেনা দুনিয়ার সাথে ঘটে একাত্মতা, অপরূপ সমন্বয় আর মিলন।

www.eelm.weebly.com

এ ধরনের কেন্দ্রভূমি গুলোতে জামাত পাঠিয়ে দুটো উদ্দেশ্য সার্থক করলেন হযরতজী (রঃ)। (এক) জামাতের অজ্ঞ, মূর্খ, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ধচক্রে পড়ে থাকা সাথীদের সাথে আলোর জগতের পরিচয় ঘটানো। সাথে সাথে এ পরিবেশ দেখে যেন ওদের ভেতর দ্বীনের ওপর চলার এক শখ, আগ্রহ ও উদ্দীপনা তৈরি হয়।

(দুই) আঁধার জগতের বাসিন্দাদের দেখে যেন আলোর যাত্রীদের বোধোদয় হয় যে এদের সাথে দ্রুত যোগাযোগ করা কতো দরকার। গোটা জগতে জুড়ে কতো মুসলমান ও অমুসলিম এভাবে অজ্ঞ, মূর্খ, অশিক্ষা আর কুশিক্ষার ঘোর তমসায় হাবুডুবু খেতে খেতে চলে যাচ্ছে মহাকালের অতল অন্ধকারে।

তাঁর (রঃ) উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো।

ভুল ভাঙতে লাগলো দু'দলের।

ফুটলো আলোর ফুল।

কাটছে। জগদ্দল পাথরের মতো জমাট আঁধার।

হাজার বছর পর।

এই ধারায় হযরতজী (রঃ) মেওয়াতিদের জামাত কখনো সাহারানপুর, কখনো দেওবন্দ, রায়পুর ও থানভবনে পাঠালেন। তাদের ওপর তাঁর হিদায়াত ও নির্দেশনা ছিলো এই যে, 'প্রাজ্ঞ পুরুষদের সাথে দেখা করবে। দোয়া ও দৃষ্টি পাবার জন্যে। যতক্ষণ না তাঁরা কিছু জানতে চান তোমরা নিজ থেকে কিছু বলবে না। পঞ্চাশ বা ষাটজনের জামাত ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোর আশপাশে কাজ করবে। দাওয়াতের। টানা সাতদিন। তারপর মিলিত হবে ওখান থেকে হেদায়াত নিয়ে। ছড়িয়ে পড়বে গ্রামে গঞ্জে।'

এই চিন্তাধারার ওপর একটা চিঠি লিখলেন তিনি শায়খুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া (রঃ) এঁর কাছে-

'আমার মন বলছে, জামায়াতের সাথীরা যদি খানকাগুলোতে যায়, সব রকম আদব মেনে প্রাজ্ঞ পুরুষদের সান্নিধ্যে খানিকটা সময় কাটায় তাহলে সিদ্ধপুরুষদের আধ্যাত্মিক প্রভাবে তাদের আত্মা সজীব হবে। সেক্ষেত্রে তাদের দাওয়াত খুব দ্রুত কার্যকর হবে। আপনাদের ওখানে যারা গেছে ওদের দিকে খেয়াল রাখুন। পরামর্শ করে কী করবেন তার কর্মসূচি তৈরি করুন। এ অধম বান্দা খুব সম্ভব এ সপ্তাহেই আরো ক'জন বিশিষ্ট ব্যাক্তিকে নিয়ে ওখানে আসবো ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে দেওবন্দ ও থানাভবনেও যেতে পারি। -----'

www.eelm.weebly.com

বলার অপেক্ষাই রাখে না যে, বিংশ শতাব্দীর ইসলামী রেনেসাঁর মহান দিকপাল, বিশ্ব ইতিহাসে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, যুগস্রষ্টা সাধক, যুগশ্রেষ্ঠ মণীষী, আধ্যাত্মিক প্রাজ্ঞ পুরুষ, মহান সংস্কারক, জ্ঞান সাধনার অতল ডুবুরি, ক্ষুরধার কালজয়ী লেখনী শক্তির অধিকারী হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) ছিলেন এ উপমহাদেশের জন্যে সৌভাগ্য স্পর্শমনি।

তিনি শরীয়ত তথা কিতাব-সুন্নাতের অনুসারী, তত্ত্বজ্ঞানী সাধক পুরুষ। আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি উচ্চ মার্গ লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিভ্রান্তদের পথের দিশারী, ধর্মের উজ্জ্বল প্রদীপ, ওলিকুল শিরোমনি, জ্ঞান ও মারেফাতের আকাশে দুপুরের সূর্য, খোদাতত্ত্বজ্ঞানীদের বাদশাহ।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) এঁর কাজের দিকে থানভী (রঃ) খুব খেয়াল রাখছিলেন। এই কাজের ইতিবাচক ভূমিকা দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। তাঁর সাথে সে জামানার আরো সব অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন প্রাজ্ঞ পুরুষদের ভুল ভাঙলো। সবাই খুশি। সন্দেহ দূর হয়েছে। কেটেছে সংশয়।

পয়লা দিকে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) বেশ অস্বস্তি ও দ্বিধা দ্বন্দ্বের মাঝে ছিলেন। তিনি ভাবছিলেন মাদ্রাসায় আট দশ বছর ধরে দ্বীন শিখে দক্ষ আলিমদের দাওয়াতী উদ্যোগ যেখানে সফল হচ্ছে না যেখানে মেওয়াতের অশিক্ষিত, মূর্খ ও অজ্ঞ লোকগুলো এতো বড় মহান সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর কাজের সুষ্ঠু ব্যবস্থা কী করে করবে? ওলামায়ে কেরামদের প্রচেষ্টাতেই তো কতো নতুন নতুন ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে ছিলেন খুব সতর্ক আর দূরদর্শী। ভয় পাচ্ছিলেন এই মেহনতের কারণে ফের কোনো বিভ্রান্তি, বিশৃঙ্খলা জেগে ওঠে কিনা।

তিনি ভুগছিলেন দারুণ হতাশায়।

আল্লাহ পাক যাকে দিয়ে কাজ নিতে চান জন্মসূত্রেই তিনি দুর্লভ সব গুণাবলীতে ভূষিত হন। যার জন্যে ছেলে বেলাতেই তার ভেতর সফল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উদ্দীপ্ত আভা চোখে পড়তে থাকে। তিনি সবার মাঝে থেকেও আলাদা থাকেন। এ অবস্থা পুরোপুরি ফুটে ওঠে আম্বিয়া কেরামের জীবনে। পরে উম্মতের পথের দিশারীদের মাঝে ও কিছু দেখা যায়।

হযরতজী (রঃ) কে ছোটবেলায় দেখে শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রঃ) বলেছিলেন, 'এই বাচ্চার মধ্যে আমি সাহাবায়ে কেরামের সৌরভ পাচ্ছি।'

কান্দালার পীর পরিবারে কারামত সম্পন্ন এক বিশিষ্ট মহিলা ছিলেন। যার সম্পর্কে 'শায়খে কান্দালা' গ্রন্থে বর্ণনা রয়েছে। সবাই তাকে 'আম্মিবি' বলে ডাকতো। ছোটবেলায় মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) যখন তার কাছে যেতেন তখন তিনি বলতেন,

www.eelm.weebly.com

'সৌভাগ্যবান ইলিয়াস বুঝি এখানে এসেছে? আমি ওর শরীর থেকে সাহাবা কেরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আলাইহিম আজমাঈনদের খুশবু পাচ্ছি।'

ইনি শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গেলেন। কাউকে দেখতে পেতেন না। তখনো হযরতজীকে চিনে নিতেন। তার উপস্থিতিতেই টের পেয়ে যেতেন। অথচ অন্যদের বেলায় নাম বললে তারপর চিনতে পারতেন।

হযরতজী (রঃ) তাবলীগের কাজ শুরু করলেন।

তখন ওলামায়ে কেরাম আলোচনা করলেন যে, 'মাওলানা ইলিয়াস এটা কি শুরু করলেন?

শীতকাল।

উনিশ শো তেত্রিশ সাল।

হযরতজী (রঃ) একবার দু'মাসের জন্য ষাট জন সাথীর একটা জামাত দিল্লীর শাহজাহান মসজিদে এনে জামাতের দিক ঠিক করে দেন। শায়খুল ইসলাম সাইয়্যিদ হোসাইন আহমাদ মাদানী (রঃ) কে জামাতের হেদায়াত দিয়ে দোয়া করিয়ে দিলেন। কিছু জামাত কর্ণাল পানিপথের দিকে, কিছু সাহারানপুরের আশে পাশে ও কয়েকটা জামাতকে কান্দালার চারপাশের এলাকায় পাঠালেন।

সময় পুরো হলে তোমরা কান্দালায় এসে হাজির হবে। আমি এসে তোমাদেরকে ফিরতি হিদায়াত দিয়ে মুসাফাহা করে বিদায় দেব।'

সময় পুরো হলো। তিনটি জামাত কান্দালায় হাজির। হযরতজি (রঃ) তাদেরকে দেখে খুব খুশি হলেন। কান্দালার নিজের আত্মীয়দের বলে দাওয়াত করে খাওয়াতে লাগলেন। তাদের কাজের ও আত্মত্যাগের অনেক প্রশংসা করার পর বললেন, 'ভাই' তোমরা মোট ষাট জন সাথী। মাত্র আট বা দশদিনের জন্যে আমাকে এমন আট বা দশজন সাথী দাও যাদেরকে যেখানে পাঠানো হোক সেখানেই যেতে তৈরি থাকবে।'

দীর্ঘ দু'মাস।

স্ত্রী পুত্র পরিজন, ঘর সংসার, ব্যবসা বাণিজ্য, ক্ষেতখামার ফেলে ওরা রয়েছে আল্লাহর পথে। আর নির্দিষ্ট সময়ও পেরিয়েছে। সবার দেহ মন প্রাণ বাড়ি ফেরার জন্যে উন্মুখ। এমন সময় পিছু ডাক!

নাহ, কেউ রাজি হলো না!

দু'দিন ধরে হযরতজী (রঃ) আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী দিয়ে বেরুনোর লাভ শুনিয়ে উৎসাহিত করছেন। সবাই শুনছে। উসখুস করছে। রাজি হচ্ছে না। হযরতজী (রঃ) এবার হযরত মাওলানা এহতেশামুল হাসান সাহেবকে দিয়ে বয়ান করালেন। একবার হযরতজী (রঃ) নিজে ফের মাওলানা এহতেশামুল হাসানকে দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছেন। তিনদিনের শেষ বিকেলে তৈরি হলেন একজন তরুণ। তাঁর নাম ঈসা ফিরোজপুরী (রঃ)।

www.eelm.weebly.com

হযরতজী (রঃ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিলেন।

তরুণ ঈসা নাম দিলেন। আল্লাহর পথে যাবার জন্যে তাঁর নাম লেখা হবার সাথে সাথে মাঝে উদ্দীপনার ঢেউ দেখা দিল। ধীরে ধীরে আরো ক'জন দাঁড়িয়ে নাম দিলেন।

হযরতজী (রঃ) তখন ওখানের সবাইকে লক্ষ করে এই অল্প বয়েসী ছেলেটির আশ্চর্য ত্যাগের কথা বলে বললেন, 'একে দেখেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? ছেলেটি বয়সে তোমাদের চেয়ে কম অথচ সাহসে সবার উপরে!'

ছেলেটির দেখাদেখি নম্বরদার মেহরাব খান ফিরোজপুরী, মুন্সি নাসরুল্লাহ খান সাহেব নুহাবী, হাফেজ আবদুর রহমান সাহেব ফিরোজপুরী, হাজি সাইদুল্লাহ রায়সিনাবী উঠে দাঁড়ালেন। শেষমেশ মৌলভী শাবী, আবদুল্লাহ সাকা ফিরোজপুরী আল্লাহর রাস্তায় ফের বের হতে রাজী হলেন। ফিরোজপুরের আরো একজন অল্প বয়স্ক ছেলে ছিলেন। তার নাম ঠিক জানা যায় না। সম্ভবত হাসান খান হবেন। জামাতটি ছিল মোট আটজন নিয়ে। মুন্সি নাসরুল্লাহ খানকে আমির ও মিয়াজি মেহরাব খানকে তাদের জিম্মাদার করা হলো। অনেক দোয়ার পর মেহনত করার দিক নির্দেশনা দিয়ে জামাত রওনা করে দিলেন।

জামাতের দিক ঠিক করা হলো।

জামাত যাচ্ছে থানাভবন!

বিংশ শতাব্দীর কালজয়ী কিংবদন্তী পুরুষ হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) এঁর সান্নিধ্যে!

সোনার সকাল বুঝি এলো

হযরতজী (রঃ) বললেন, 'তোমরা সরাসরি থানাভবনে যেও না। থানাভবনের আশেপাশে কাজ করবে। এমন প্রাণান্ত মেহনত করবে যাতে তার খবর থানভী (রঃ) এঁর কাছে পৌছে যায়। তোমাদের মেহনত তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যাতে তিনি নিজেই তোমাদের কাছে ডেকে নেন। থানাভবনের আশেপাশে মাত্র আট দিন কাজ করবে। যদি এই আট দিনের মধ্যে থানভী (রঃ) এঁর পয়গাম পেয়ে যাও তবে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হবে। নইলে সেখান থেকেই ফিরে চলে আসবে নিজামুদ্দিনে। হযরত থানভীর পয়গাম পেলে খুব দোয়া ও ইস্তিগফার পড়তে পড়তে সোজা তাঁর খানকায় হাজির হবে। পুরোপুরি আদব ও শ্রদ্ধার সাথে সেখানে ঢুকবে। যদি হযরত থানভী তোমাদের ডেকে এই কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন সঠিক, সংক্ষিপ্ত আর স্পষ্ট ভাষায় কাজের নিয়মগুলো বলবে। আগে বেড়ে কিছু বললে বেআদবী হবে। তাতে তিনি বিরক্ত হবেন। একজন আল্লাহর ওলি বিরক্ত ও বিব্রত হলে এ কাজের

www.eelm.weebly.com

উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। হযরত থানভী (রঃ) যদি জানতে চান তোমরা এখানে কতদিন থাকবে তখন বলবে তিনদিন। এরপর তিনি যদি বেশি থাকতে বলেন, তাহলে বলবে, "আপনি যতদিন থাকতে বলবেন ততদিন, থাকতে আমরা তৈরি"। খাবার কথা জিজ্ঞেস করলে পরিষ্কার বলবে, "আমরা নিজেরা রান্না করে খাই"। যদি তিনি খাওয়ার দাওয়াত দেন তাহলে পূর্ণ আনন্দ ও আগ্রহের সাথে তা গ্রহণ করবে। কারণ বুজুর্গানে দ্বীনের শুকনো রুটি বড় বড় দুনিয়াবী নেয়ামতের চেয়ে ভালো।"

এসব হেদায়াত ও উপদেশ হলো।

এবার হযরতজী (রঃ) দোয়া শুরু করলেন। দোয়াতে এমন অন্তরঙ্গ কথা বললেন আল্লাহর রাব্বুল আলামিনের সাথে যে সাথীরা শিউরে উঠলেন। মন্ত্রমুগ্ধ, অভিভূত ও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর হযরতজী (রঃ) দোয়াতে কাঁদতে শুরু করলেন। উপস্থিত সবাই কেঁদে আকুল হলেন। দোয়ার পর অভ্যেস মতো কান্দালার বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত জামাতকে এগিয়ে দিতে এলেন হযরতজী (রঃ)। চলার পথেও তিনি জামাতকে উৎসাহিত করছিলেন। এসময় কখনো তাঁর চেহারায় সীমাহীন খুশির ছাপ পড়ছিলো। একই সাথে মাঝে মাঝে কঠিন চিন্তার ছায়া পড়ে চেহারা মেঘলা হচ্ছিল। সাথীদের মনে হলো তিনি কাঁপছেন। ঝড়ে পড়া কবুতরের মতো। জামাতকে অনেক দূর পর্যন্ত পৌছে দিলেন। ফেরার পথে বার বার জামাতকে দেখলেন। চেহারায় আশা নিরাশার আলো ছায়া।

জামাত থানাভবনের উদ্দেশে চলছে। ভয়, আশা নিরাশায় দুলছে সাথীদের মন। সফর ছিল পায়ে হাঁটার। কাজেই মাগরিবের সময় ওঁরা শামেলী পৌছুলো। শীতের মৌসুম তাই পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো জামাত সেদিন শামেলীতেই থাকবে। সেখানে গাশ্ত হলো। লোকজন এলো। সংক্ষিপ্ত বয়ানের পর তাশকীলও হলো। এলাকার কাজের জন্যে তৈরি হলো মসজিদওয়ার জামাত।

পরদিন সকালে জামাত রওনা হলো নতুন গন্তব্যে। কোথায় যাবেন কিছুই স্থির করতে পারছেন না। চলতে চলতে অবশেষে কিটরি পৌছুলে সেখানেই থাকার সিদ্ধান্ত হলো। এই প্রথম জামাত মসজিদে ঢুকলো। আসরের নামাজের সময়। কাজেই অজু সেরে দাখলুল মাসজিদের নামাজ পড়ে নিলেন। জামাত পরামর্শে বসলো। এর মাঝেই আজান হয়ে গেল। দু'জন সাথী ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করে জামাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বললেন। তিনি হাঁ বা না কিছুই বললেন না। মসজিদের বেশি ভাগ মুসুল্লি আহলে হাদিস। কাজেই তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ে ফেললো। নামাজের পর একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মুসল্লি গম্ভীর স্বরে শুধালেন, 'মসজিদে এসব বিছানাপত্র কার? 'মেওয়াতের কিছু লোকের, 'ইমাম সাহেবের কণ্ঠে ভয়ের ছোঁয়া, 'ওরা দিল্লীর নিজামুদ্দিন থেকে এসেছে। তাবলিগ জামাতের লোক।'

www.eelm.weebly.com

জামাতের কথা শোনা মাত্রই লোকটি গর্জে উঠে বললেন, 'কীসের জামাত? কী কাজে এসেছে এখানে? তাদের কোনো দরকার নেই। ওদের বলুন এক্ষুণি এখান থেকে বেরিয়ে যাক।'

ভদ্রলোকের চেঁচামেচি শুনে জামাতের সাথিরা ঘাবড়ে গিয়ে ইশারায় আমির সাহেবের সাথে পরামর্শ করতে চাইলেন। ঠিক তখনি আমির সাহেব উঠে গর্জনকারীর সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করে জামাতের উদ্দেশ্য বললেন। দু'এক কথায়। 'গাশ্ত করি। লোকজন মসজিদে আসে। কালিমা ও নামাজ শেখাই। নিজেরাই রান্না করে খাই'।

মুখ কালো করে রইলেন ভদ্রলোক। দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছেন। কুঁচকে আছে ভ্রূজোড়া। চোখে প্রশ্ন ও বিস্ময়। খানিকপর বললেন, 'ঠিক আছে। দাওয়াত দিন। লোকদের মসজিদে আনুন। তাদের ওয়াজ করে শোনান। কিন্তু মসজিদে থাকা চলবে না।'

সাথিদের সবার শরীরের সবকটা পেশী টান টান হয়েছিলো তানপুরার তারের মতো। ঢিল পড়লো এই কথায়। ফোঁশ করে ছাড়লো আটকে রাখা দম। অস্বস্তি কেটে গেল। নেমে এলো প্রশান্তি।

কারণ তখনকার দিনে গাশত ও বয়ান করার অনুমতি বিরাট ব্যাপার। সবাই আল্লাহতায়ালার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। পরে ইমাম সাহেবের কাছে রাগী মানুষটি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি জানালেন, ইনি নওয়াব আবদুল কারিম সাহেব। ওনারা চারভাই। দু'ভাই 'আহলে হাদিস'। নওয়াব সাহেব সবার বড়। বাকি ভাই সবাই তাকে খুবই সম্মান করেন। সবাই খুব দ্বীনদার ও নেক। নামাজ রোজায় খুবই মজবুত। এখনো নওয়াবী আছে। সবকিছুর দায়িত্ব নওয়াব আবদুল কারিম সাহেবেরই হাতে। আবদুল কারিম সাহেবের ছোট ভায়ের নাম মনে নেই। তবে মেজো ভায়ের নাম আবদুল মাজিদ খান। এরা দু'জন হানাফী। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) এঁর মুরিদ। এশার আগে স্থানীয় কিছু সাথিদের নিয়ে গাশ্ত হলো। বেনামাজির সংখ্যাই বেশি। কিন্তু ঈমান আমালের কথা শুনে তারা মসজিদে এলো। মাগরিবের জামাতে কোনোমতে টেনেটুনে এক কাতার মুসুল্লী হয়েছিল। গাশ্ত হওয়ায় এশার জামায়াতে মসজিদের ভেতর ভরে গেল। বারান্দা ছাড়িয়ে বাইরের রাস্তায় চলে এলো কাতার।

কথা হলো।

গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শুনলেন নওয়াব আবদুল করিম খান সাহেব। দোয়ার পর চোখের অশ্রু মুছে এগিয়ে এলেন যিনি কথা রেখেছেন তার দিকে। দু'হাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করলেন। কান্নাভেজা স্বরে বললেন, 'আপনারা আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনাদের কাজ আমার খুবই ভালো লেগেছে। আমি চাই আমাদের পাড়ার সবাই নামাজী হয়ে যাক। কিন্তু যেসব উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার কোনোটা আজ পর্যন্ত সফল

www.eelm.weebly.com

হয়নি। আপনাদের এই নিয়ম দেখছি খুবই কাজের। আপনারা আমাদের এখানে আর ক'টা দিন থাকুন। রাতে মসজিদে থাকলেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আপনাদের সাথে আমরা কেউ একজন সব সময় থাকবো। আমি, আমার ভাই বা ছেলেদের মধ্যে কেউ একজন। কেউ খারাপ কিছু বলতে পারবে না। আর---আর যদি আপত্তি না করেন তাহলে আপনাদের খাওয়া দাওয়ার চিন্তা আমরাই করবো।'

জামাতের পক্ষ থেকে খাওয়ার ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করা হলো।

আটদিনের কর্মসূচি তৈরি হলো।

গোটা নওয়াব শাসিত এলাকায় ঘুরে ঘুরে জামাত কাজ করলো। প্রত্যেক গ্রামেই মুসল্লিতে মসজিদ ভরে গেল। আল্লাহ পাক জাল্লাশানুহুর মহিমা বোঝার সাধ্য কার? নওয়াব সাহেবের আর দু'ভাই (আবদুল হামিদ খান ও আবদুল মাজিদ খান) রোজ থানাভবনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) এঁর মসলিশে ফয়েজ হাসিল করতেন। জামাত যাবার পর থেকে তারা দু'জন হযরত থানভী (রঃ) কে জামাতের কর্মকান্ডের অভাবনীয় সফলতার কথা শোনাচ্ছিলেন।

তিনি শুনে খুব খুশি হলেন।

এক সপ্তাহ আগে শামেলীতে জুমা পড়ে ওই দিনই জামাত এই কাটরি এলাকায় এসেছিলো। পরদিন শনিবার থেকে পরের এক সপ্তাহ পর্যন্ত কর্মসূচি মতো জামাতের কাজ শেষ হয়। ওই বৃহস্পতিবার রাতেই থানাভবন থেকে খবর এলো জামাতটিকে জুমা পড়তে বলেছেন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)। খবর নিয়ে এলেন নওয়াব আবদুল হামিদ খান।

বিপুল আনন্দের বন্যা বয়ে গেল জামাতে। সাথীদের চোখে খুশির পানি। সবাই যেন ঈদের চাঁদ দেখলেন আকাশে। গভীর আনন্দে রাত কাটালেন জেগে। নামাজ, তেলাওয়াত ও তাসবীহে লেগে গেলেন। সুবহি সাদিক হলো। ফজরের নামাজ শেষে সূর্য ওঠার অপেক্ষায় সবাই। আজ যেন সূর্য উঠতেও দেরি হলো। সবাই অধীরে, অস্থির। চাপা কৌতূহল। কী হয়, কী হয়! আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে এশরাকের সময় হলো। এশরাক পড়েই জামাত রওনা হলো থানাভবনের পথে। আনন্দে কল্পনায় সাথীরা যেন ভেসে চললো।

ভোরে থানাভবন গিয়ে সোজা খানকায়ে এমদাদিয়ায় হাজির। হযরত থানভী (রঃ) এঁর খাদেম। তিনি অপেক্ষায় ছিলেন। জামাত পৌছুলে তাঁরা আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে গেলেন উত্তর দিকের কামরায়। সেখানে রাখা হলো বিছানাপত্র। এরপর কুলুখ, ইস্তেঞ্জা, পায়খানা, গোসলখানা ইত্যাদি দেখিয়ে দিয়ে বললেন আপনারা প্রয়োজন মিটিয়ে নিন।

খানিক পর চলে এলেন হযরত মাওলানা জাফর ওসমানী (রঃ)। জামাতের সাথীরা তাঁকে আগে থেকেই চিনতেন। কারণ তিনি এর আগে মেওয়াত ও নিজামুদ্দিনে সফর

www.eelm.weebly.com

করেছেন। হযরত মাওলানা ওসমানী (রঃ) জামাতের সাথীদের বসিয়ে তাদের থাকা, খাওয়া ও কাজের উসুল ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমীর সাহেব ও মিয়াজি মিহরাব সব উসুল সম্পর্কে বললেন। উসুল শোনার পর মাওলানা ওসমানী (রঃ) বললেন এভাবেই থানভী (রঃ) এর কাছে তোমাদের কাজের উসুলগুলো হুবহু তুলে ধরবে। নির্ভয়ে। স্পষ্টভাবে। ভুল হলে আমি পাশ থেকে স্মরণ করে দেব।'

তারপর তিনি সাথীদের হযরত থানভী (র) এঁর দরবারে উপস্থিতির আদব ও উসুল শিখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। লোকজন এসে মসজিদ ভরে গেল। আজ জুমার দিন। প্রচুর মুসুল্লী। হযরত মাওলানা থানভী (রঃ) ও তাশরীফ আনলেন। মুয়াজ্জিন খুতবার আজান দিল। জামাতকে এক পলক দেখে মিম্বরে গিয়ে বসলেন। খুতবা ও নামাজ পড়ালেন। নামাজ শেষে এক ব্যক্তি এসে বললো হযরত থানভী (রঃ) জামাতের সাথীদের স্মরণ করেছেন। কাজেই জামাতের সাথী হযরতের খেদমতে হাজির হলো। হযরত থানভী (রঃ) মুসাফাহা করলেন। বললেন পরে কথা হবে।

এক আনন্দ উত্তেজনায় কাটলো দিন।

বাদ মাগরিব।

হযরত মাওলানা ওসমানী (রঃ) এঁর দীর্ঘ বয়ান হলো। কোন ফাঁকে বেজে গেছে রাত বারোটা। আজ সারাটা দিন জামাতের সাথীরা দাওয়াত, বয়ান ও তাশকীলের কাজে মশগুল ছিলেন। আর সাথে রয়েছেন হযরত মাওলানা ওসমানী (রঃ)। তাঁর অমূল্য বাণী শোনার প্রচণ্ড আগ্রহে সাথীরা রান্না করতে পারেননি। সারাদিন না খেয়ে জীবনের খিদে যেন সেদিন এক সাথে লেগেছিল।

জামাত থাকার সিদ্ধান্ত হয়েছিল মাওলানা নাসির আহমাদ সাহেবের কামরায়। জাফর ওসমানী সাহেব সে বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার সময় কথা বলাতে মশগুল ছিলেন। সেই ফাঁকে জামাতের আমীর গোপন পরামর্শ করে দু'জনকে খাবার আনতে বাজারে পাঠিয়ে দিলেন। রাত গভীর তাই ছোলা বুট পেলেও আনতে বলে দেয়া হলো। সবার মাঝ থেকে দু'জন বের হওয়ায় কেউ টের পেল না।

হযরত মাওলানা জাফর ওসামানী জামাতকে মৌলভী নাসির আহমাদ সাহেবের বাসায় পৌঁছে দিলেন।

এ এলাকার সাথীরাও সব চলে গেল।

এদিকে সাথী দু'জন বাজারে কিছুই পেলেন না। শেষে এক ঘরের চালের ওপর দিয়ে ধোঁয়া উড়তে দেখে তার বাড়িতে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লেন। গভীর রাতে দরজায় শব্দ শুনে ভেতরের লোকজন লাঠিসোটা নিয়ে ভয়ার্ত চেঁচামেচি করতে করতে বেরিয়ে এলো। জামাতের সাথীরা টর্চ জ্বালিয়ে অভয় দিয়ে বললেন, 'আমরা চোর ডাকাত নই। তাবলিগ জামাতের লোক।'

www.eelm.weebly.com

বাড়িওয়ালা দিনে এদেরকে গাশ্ত করতে দেখেছিল। সে চিনে ফেললো। সবাইকে শান্ত হতে বললো। কাছে এসে সব শুনলো। ওই এলাকার নিয়ম ছিলো ছোলাব্যাপারী ছোলা ও বুট ভাজার সাথে গুড় ও চিড়ে রাখা। সাথীরা ছোলা, বুটভাজা ও চিড়েগুড় কিনে চলে এলো।

জামাতের সাথীরা ওদের ফিরে আসতে দেখে খুব খুশি হলো।

তখন গভীর নিঝুম রাত। একটি মানুষের চিহ্ন নেই বাইরে। শুধু দারোয়ান দরোজায় পড়ে গভীর নিদ্রায়। সাথীরা দরোজা জানালা বন্ধ করে ছোলাবুট আর চিড়ে গুড় খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমির সাহেব এ ব্যাপারে কারো সাথে আলোচনা করতে মানা করলেন। যেন কেউ জানতে না পারে আমরা অল্প কিছু খেয়ে রাত কাটিয়েছি।

খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে সব সাথী তাহাজ্জুদ পড়তে উঠে গেলেন। কামরাতেই জিকির তেলাওয়াত, তাসবীহ ও তাহলিল সেরে দোয়াতে মশগুল হলেন।

আজান হলো।

ফজরের নামাজ পড়তে জামাত মসজিদে এলো। ইমাম হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)।

নামাজ শেষে হযরত থানভী (রঃ) জামাতকে ডাকলেন। সাথীরা হযরতের খেদমতে হাজির হলো। তাদের সাথে অন্য লোকও এসে বসলো। থানভী (রঃ) মাওলানা জাফর আহমাদ সাহেবকে বললেন, 'জামাতের কাজ কেমন দেখলে?' তখন জাফর ওসমানী এঁর চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। নিজেকে প্রচণ্ড শক্তিতে সামলে নিলেন। তারপর এলকার দ্বীনি অবক্ষয় আর জামাতের কাজে প্রত্যক্ষ উপকার সম্পর্কে বললেন।

এবার জামাতের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'গতরাত কি হালে কেটেছে তোমাদের?'

সাথীরা বললেন, 'আল্লাহর ইচ্ছেয় ভালই কেটেছে।'

হযরত এলাকার সাথীদের উদ্দেশে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে জামাতকে চা পান করাবে?

মৌলভী নাসির আহমদ সাহেব বললেন, 'জ্বি হুজুর, অনুমতি পেলে আমি তৈরি।'

থানভী (রঃ) বললেন, 'শুধু চা নয় সাথে নাশ্তাও হতে হবে।'

নাসির আহমাদ সাহেব বাড়ি গিয়ে খানিক্ষণের মধ্যেই চা ও কুড়ি ভর্তি টাটকা বিস্কুট নিয়ে এলেন। সাথে কিছু পেয়ালা।

হযরত থানভী (রঃ) বললেন, 'দস্তরখানে বিস্কুট ঢেলে দিয়ে পেয়ালা ভরে চা দাও।'

হযরতের নির্দেশ মতো বিস্কুট ও চা ভর্তি পেয়ালা সাথীদের সামনে রাখা হলো। সাথীরা সবাই চুপচাপ বসে রইলেন।

www.eelm.weebly.com

তাদের সংকোচ দেখে থানভী (রঃ) বললেন, 'ভাই, আমারই ভুল হয়েছে। নিজেদের খরচে খাওয়া যে তোমাদের নিয়ম সেকথা আমি পুরোপুরি ভুলে গেছি। আমি নিজেও নিয়ম মেনে চলি। নিয়ম মেনে চলা খুবই দরকার মনে করি। খুবই ভালো কথা যে তোমরা উসুলের পাবন্দি করেছো। মৌলভী ইলিয়াস দাওয়াত কবুল করার ব্যাপারে কি কোনো নিয়ম বেঁধেছেন?'

'জ্বি, 'মাথা নত করে নম্র স্বরে বললেন জামাতের আমির।

'কী সেটা?'

'যে কাজের জন্যে আমরা ঘরবাড়ি ছেড়েছি সে কাজে যদি কেউ বের হয়।' কথা কটা বলতে গিয়ে আমিরে জামাত যেন ঘেমে নেয়ে উঠলেন। একটানে বলে চেয়ে রইলেন হযরতের দিকে। অপলকে।

গাঢ় নিরবতা নিমেছে।

সবাই চুপ। অপেক্ষা।

শুধু ঘড়ির একটানা টিকটিক শব্দ।

স্তব্ধতা ভাঙলেন থানভী (রঃ) মুখ খুলে। বললেন, 'কতো সময় তোমরা চাও?'

'তিনচিল্লা।' ঝট করে বললেন আমীরে জামাত।

'যদি তিনচিল্লা দিতে না পারে?

'তাহলে চল্লিশ দিনের জন্যে বের হবেন।'

'কমপক্ষে কতোদিন দিলে তোমরা দাওয়াত কবুল করো।'

'অন্ততঃ তিন দিন আমাদের সাথে থাকবেন।'

'যদি তাও না পারে?'

'তাহলে একদিন আমাদের সাথে থাকবেন।'

'শরীর যদি তাও অনুমতি না দেয়?

'সুস্থ হবার পর বের হওয়ার এরাদা করবেন। তার আগে এ কাজের সফলতার জন্যে অন্তর দিয়ে দোয়া করবেন।'

খুশির আলো ফুটলো হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) এঁর চেহারায়। সাথীরা চেপে রাখা নিঃশ্বাস ফেললো। তাদের বুকের পাটাতনে হৃদপিণ্ড আছড়ে পড়ছে বিরামহীন। কী হয়, কী হয়!

খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'আমার মন চায় যে আমি আপনাদের মেহমানদারী করি। কিন্তু এতো অসুস্থ যে ঘর থেকে মসজিদে আসাটাও অনেক কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে জন্যে আপাতত ঃ বের হতে পারছি না। এ ওজর আপনাদের দৃষ্টিতে যদি গ্রহণযোগ্য হয় তবে আমার দাওয়াত কবুল করুন। আর যদি প্রকৃত ওজর না হয়ে থাকে এক্ষেত্রে আপনারা দাওয়াত কবুল না করলেও আমি খুশি।'

www.eelm.weebly.com

থানভী (রঃ) এঁর বাণী শেষ হবার আগেই সবার চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুর ঢল। কাঁদছে। সবার এতক্ষণ ধরে চেপে রাখা উৎকণ্ঠা, আশা, ভয় আর সুতীব্র বেদনা চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো। অশ্রু হয়ে।

কবরের নিরবতা নেমেছে এখানে।

খানিকপর আমিরে জামাত নিজেকে সামলে নিয়ে অশ্রু মুছে কান্নাভেজা কণ্ঠে বললেন, 'হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস বলেছেন, "আল্লাহওয়ালাদের দাওয়াত অমূল্য মনে করে সর্বক্ষেত্রেই গ্রহণ করবে। তাদের দস্তরখানার শুকনো রুটিও দুনিয়ার বড় বড় নেয়ামাতের চেয়ে বেশি বরকতময়। তাদের দাওয়াত ভাগ্যে জোটায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। তাকে নিজের সৌভাগ্য, দয়াময় আল্লাহর দয়া আর বুজুর্গদের অনুগ্রহ মনে করবে"।

আমিরের কথা, সাথীদের অবুঝ কান্না থানভী (রঃ) এঁর ভেতর খুশি ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করলো।

তিনি বললেন, 'মৌলভী ইলিয়াস নিরাশাকে আশা দিয়ে বদলে দিয়েছেন।'

তিনি বার বার ওই কথা বললেন।

তারপর আচ্ছন্নতা কাটিয়ে যেন বাস্তবে ফিরে এলেন। বললেন, 'এই চা ও বিস্কুট আমার প্রিয় মৌলভী নাসির আহমাদ এনেছে। এটা খেতে তোমাদেরকে অনুরোধ করছি আমি। আর আমার তরফ থেকে চারবেলা খাবার দাওয়াত রইলো। দু'দিন দুপুরে ও দু'দিন রাতে। নাশ্‌তার ব্যাপার তোমাদের ইচ্ছে।'

এবার মজলিশের দিকে চেয়ে বললেন, 'কেউ যদি দেখতে চান সাহাবায়ে কেরাম কেমন ছিলেন তাহলে এঁদের দেখে নিক।' তারপর জামাতের দিকে ফিরে বললেন, একটা কথা বাকি থেকে যাচ্ছে। তা হলো আপনারা থানাভবনে কতদিন থাকবেন?

আমিরে জামাত বিনীতভাবে বললেন, 'হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস থানাভবনে তিনদিন থাকতে বলেছেন। কিন্তু যদি আপনার পক্ষ থেকে বেশি দিন থাকার হুকুম হয় তবে যতদিন বলেন থাকবো।'

একথা শুনে থানভী (রঃ) খুব খুশি হলেন। বললেন, 'আমার থানাভবন এলাকায় বায়ান্নটি মসজিদ আছে। কাজেই কমপক্ষে এখানে আটদিন থাকতে হবে। 'জামাতের সাথীরা খুশি মনে রাজী হয়ে গেলেন। এবার অনেক দোয়া করে বললেন, 'আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যাকে দিয়ে যে কাজ নিতে চান, তার জন্যে যোগ্য মানুষ তৈরি করেন। এই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ মাওলানা ইলিয়াসের ভাগে পড়েছে। এ মেহনত খুবই উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন। আমি আশা রাখি এ উদ্যোগের মাধ্যমে সত্যিই উম্মত উপকার পাবে। আল্লাহ কবুল করুন। বরকতময় করুন। সবরকম ফিৎসা ও অমঙ্গল থেকে হেফাজত করুন।'

www.eelm.weebly.com

এবার জাফর আহমাদ ওসমানী (রঃ) এঁর দিকে ফিরে বললেন, 'জামাতের আট দিনের কর্মসূচি বানিয়ে দিয়ে নিজে জামাতকে নুসরত করবে।' মজলিশের সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরাও সবাই জামাতের সাথে বেশি বেশি সময় কাটাও।'

হযরত মাওলানা জাফর আহমাদ (রঃ) এলাকার মসজিদগুলোর কর্মসূচী ঠিক করে গাশ্‌ত ও তালিমের সময় ঠিক করলেন। গোটা থানাভবন এলাকায় আটদিন ধরে মেহনত চলতে থাকলো। হযরত থানভী (রঃ) নিজেও নির্দিষ্ট সময়ে জামাতের কাছে গিয়ে কাজের বিবরণ শুনতেন। অনেক দোয়া করতেন। আটদিনের মাথায় জামাতের কাছে গিয়ে বললেন, 'যদিও আমার অন্তর পরিতৃপ্তি হয়নি তবু তোমাদের যেতে দিতে হবে। কারণ তোমাদের তো দুনিয়াবী কাজ রয়েছে। পারিবারিক প্রয়োজনাদির সাথে তোমরাও জড়িত। এই জন্যে খুশিতেই তোমাদের বিদায় দিচ্ছি। তবে যদি যাওয়ার পথে রামপুর মনিহারান এলাকায় কিছু কাজ করে যাও তবে খুবই ভাল হয়। সেখানে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ কিছু লোক রয়েছে। তাছাড়া অনেক দিক দিয়ে ওখানে জামাত কাজ করার বিশেষ দরকার রয়েছে।

জামাতের সাথীরা সেখানে যেতে রাজী হলেন।
অনেক দোয়া দিয়ে থানভী (রঃ) তাদেরকে বিদায় করে দিলেন।
জামাত মনিহারানে কাজ করলো।
ফিরে এলো নিজামুদ্দিনে।
সবার মুখে বিজয়ের আলো করছে খেলা।
সবাই খুশি। খুশি বিশ্বমানবতা। খুশি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে।
খুশি হজরতজীও।
খুশি স্রষ্টা। আর তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
কারণ?
তিমির নিবিড় রাত্রি শেষ হয়েছে। ফুটছে ভোরের আলো।
আসছে সোনার সকাল।

অন্তর ও দাহ অন্তবিহীন

প্রথম দিকে মাওলানা থানভী (রঃ) খুব ভয় পাচ্ছিলেন এ কাজের পূর্ণ সফলতার ব্যাপারে। তিনি ভারতের আট দশ বছর ধরে ধর্মীয় শিক্ষা পেয়েছে যেসব ছাত্ররা ভাবতেন ঠিকমতো দ্বীনি দাওয়াতী কাজ করতে পারছে না। তাহলে মেওয়াতের মূর্খ মানুষগুলো অল্প স্বল্প জ্ঞান নিয়ে কী করে দ্বীনি কাজ করবে? এ কাজ তো ভীষণ নাযুক, স্পর্শকাতর ও সূক্ষ্ম! এমন তো হবে না যে শত শত নতুন ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে?

www.eelm.weebly.com

এবার তিনি নিজে দেখলেন এর যুগান্তকারী, অভাবনীয় সফলতা। একবার হযরতজী (রঃ) তাবলিগের কাজের নিয়ম আর সফলতা সম্পর্কে বোঝাতে চাইলেন হযরত থানভী (রঃ) কে। তিনি বললেন, 'যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে হবে না। মাশাআল্লাহ্ এর বাস্তব ফল দেখে মন প্রশান্ত হয়েছে। যুক্তি তো এজন্যে যে কাজটি সত্য কিনা প্রমাণ করা। আপনার কাজটি সত্য। এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে।'

মাওলানা থানভী (রঃ) আরেকটি ভয় পেতেন, এই ধর্ম জ্ঞানহীন কর্মীরা কি করে দাওয়াতের কাজ করবে? তাঁর ভয় কেটে গেল যখন জাফর আহমাদ (রঃ) জানালেন যে, ওসব মুবাল্লিগরা শুধু শেখানো নির্দিষ্ট কিছু কথা বলে। শুনে খটকা কেটে গেল থানভী (রঃ) এঁর।

এ কাজের লক্ষ্য ছিলো গোটা মানব জাতির হেদায়াত। মুক্তি। হযরতজী (রঃ) বিশ্বাস করতেন এ লক্ষে জামাত একদিন না একদিন পৌছুবেই।

এ বিশ্বাস গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছিল। প্রত্যয় যতই গভীর হচ্ছিলো ততই বেড়ে যাচ্ছিলো অস্থিরতা। অধীরতা। ভেতরের জ্বালা। এ জ্বালা ছিলো ওলামায়ে কেরামদের এ কাজে না জোড়ার কারণে। দেশের জ্ঞানী আলিমার ঠিক মনযোগ দিচ্ছেন না। এ জন্যে বেড়ে চললো তাঁর উৎকণ্ঠ আর উত্তেজনা। হতাশায় ভেঙে পড়তেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন এই সময়ের সব সমস্যা, অশান্তি আর বিশৃঙ্খলার একমাত্র প্রতিষেধক এই দ্বীনি দাওয়াত। হৃদয়ের এ তীব্র ভীষণ চেতনা মাঝে মাঝে তাঁর মুখের ভাষায় উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের মতো ঠোঁটের কূল উপচে পড়তো।

একবার এক মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাঝে তার আবেগ ছড়িয়ে দিলেন।

তিনি বললেন, '--- কী করে আমি আপনাদের বোঝাবো? সে শক্তি আমার নেই। সে ভাষাও আমার নেই। আমার যাদু জানা নেই। মন্ত্রও জানিনা। যদি জানতাম আমি আপনাদের মাথা থেকে বের করে দিতাম যা আপনারা সত্য ও সুন্দর জেনেছেন তা ভুল। আর আমি যা সত্য ও সনাতন জেনেছি তা স্বতঃসিদ্ধ।

আপনাদের দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানাচ্ছি এসব বিবাদ, বিসম্বাদ, বিভ্রান্তি, বিশৃঙ্খল ও অশান্তির যে প্লাবন প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে তার 'সিকান্দারী বাঁধ' এই দ্বীনি দাওয়াত।'

বাদশাহ জুল্‌কারনাইন পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে তৈরি করেছিলেন প্রাচীর। সুবিশাল। দুর্লঙ্ঘ্য। যা পেরিয়ে কেয়ামতের আগে পর্যন্ত বের হতে পারবে না অসুর জাতি ইয়াজুজ মাজুজের দল। তার মানে অপ্রতিরোধ্য বন্যার মতো ওসব দানবকে যেমন আটকে দিয়েছেন বাদশাহ শাহ্ সিকান্দার তেমনি দ্বীনি দাওয়াত। এও সর্বগ্রাসী ফিতনার প্লাবনের বিরুদ্ধে সিকান্দরী বাঁধ।

তিনি বলেন, 'আমি স্পষ্ট করে বলছি, দ্বীনি দাওয়াতের কাজে নামতে হবে। পুরো উদ্যম, মনোবল, আবেগ, সাহস আর খাটুনির ক্ষমতা নিয়ে মাঠে নামতে হবে। মনপ্রাণ ঢেলে করতে হবে কাজ। এ কাজ করা ছাড়া অন্য কোনো পথও নেই।

www.eelm.weebly.com

এ কাজ প্রকাশিত করা হয়েছে। অদৃশ্য ইশারায়। এই পথ আর এর নিয়ম কানুন সবই অদৃশ্য নির্দেশে চলছে। তাই এতে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই ফিতনার বন্যাকে বাধা দেয়ার।

বর্তমানে উম্মতের যে রোগ তার একমাত্র ওষুধ হচ্ছে এই দাওয়াতী মেহনত।

আল্লাহতায়ালা জাল্লাশানাহু'র একটা চিরায়ত নিয়ম এই যে রোগের সঠিক চিকিৎসা তিনি মানুষের হাতে তুলে দেন। আর আপনারা জানেন আল্লাহর দেয়া নেয়ামত ও চিকিৎসাকে ঠিক মর্যাদার সাথে গ্রহণ না করলে ফল তেমন ভালো হয় না।'

এ চিৎকার, এ হাহাকার, এ ব্যথা আর বেদনা তিনি আর একটি চিঠিতে লিখছেন,

দু'দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ মানুষ আমি মুহাম্মদ ইলিয়াস (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন) বলছি।

এ দুনিয়ার যাবতীয় সৎকাজ পুরো হয় মহান আল্লাহর রাব্বুল আলামিনের দয়া, মায়া আর ক্ষমতাবলে। হে মহিমাময়, করুণাময় বিশ্বপ্রভু আল্লাহ! আমি আপনারই প্রশংসা, গুণকীর্তন করছি। আর প্রকাশ করছি কৃতজ্ঞতা।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ভাই,

মনে অনেক জ্বালা। তীব্র দহন সহ্য করতে না পেরে চিঠি লিখছি আপনাকে। কিন্তু আমার এ দহন, এ জ্বালা কেমন করে লিখবো? কী ভাষায় প্রকাশ করবো?

হে প্রিয় সাথী,

দাওয়াতের যে মহান কাজ আমি পেয়েছি তা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার সময় পরম করুণাময় আল্লাহর যে সন্তুষ্টি, দান ও দয়া বন্যার মতো অফুরান ধারায় আসছে তা দেখে মনে বড় ভয়। ভয় এজন্যে যে, এই শেষ যুগে ফের স্বর্ণযুগের সওগাত আবার আমাদের ঘরে এলো। এখন এই অতিথির ঠিক সম্মান ও মর্যাদা যদি আমরা রক্ষা না করি তাহলে হয়তো আমরা সাংঘাতিক কোনো লোকসান, অপমান আর ভাগ্য বিড়ম্বনার মাঝে পড়ে যাবো। এ অবস্থায় আমি অভাগা যে কী করবো তার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। আমার এ ব্যথা নিয়ে আমি একাই গুমরে মরছি।'

অবিরাম, প্রতি মুহূর্তে হযরতজী (রঃ) এই যন্ত্রণায় ভুগতেন। আর এ মর্মপীড় ছিলো তাঁর একান্ত নিজস্ব। একা একাই তিনি জ্বলে পুড়ে মরতেন। ভেতরে ভেতরে। মুখে তিনি কাউকে কিছু বলতেন না। তবে যারা কাছের তারা বুঝতো তাঁর অনুযোগ বা অভিযোগ ছিল না। এটা ছিলো তাঁর আদর্শের খেলাপ।

এই ব্যাপারে আলিম নন এমন কেউ অনুযোগ তুললে তিনি থামিয়ে দিতেন। বলতেন, দেখো, তোমরা যেসব জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকো সেসব ছেড়ে বের হতে পারো না আল্লাহর পথে। তখন তোমরা বলো হালাল রুজির জন্যে ব্যস্ত। এখন গুলাতে

www.eelm.weebly.com

ফেরামগণ কী করে বের হবে? ওরা তো যেসব জিনিসে ব্যস্ত তা সবই দ্বীনি। যেমন মদ্রাস, মক্তব ইত্যাদি। তারা ওগুলো দ্বীনি কাজ মনে করে। আর ওগুলোই ঠিক তা বিশ্বাস করে। এখন এমন সব বাস্তুতা ছেড়ে কী করে ওরা বের হবে বলো? তোমরা যদি ব্যবসার গদি ছেড়ে না আসতে পারো তাহলে ওরা মদ্রাসার মসনদ ছেড়ে কী করে আসবে আশা করছো?

আসলে এ সময় গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে চলছিলো এক ক্রান্তিকাল। চারদিকে চলছে আন্দোলন। ছোট বড় নানা ধরনের। সেগুলো ছিলো উচ্চকিত আর রাজনীতি ঘেঁষা। তার জাঁকজমক আর চোখ ঝলসানো রূপের মোহে ধরা পড়লো বেশির ভাগ আলেম। তাদের টগবগে রক্ত সাড়া দিল এদের ডাকে। কাজেই তাবলিগের মতো নিরব, জৌলুষহীন অনাড়ম্বর ডাকে সাড়া দেয়া ছিলো সুকঠিন। আর এ বিপ্লবের সম্পর্কে ধারণা ও পরিস্কার ছিল না। তাতে মন্দ চিন্তায় অবকাশ ছিল।

কাজটি হচ্ছে প্রচার বিমুখ। সেজন্যে খুব কাছের যারা নয় তারা ছাড়া এ কাজের সুফল ও পরিচিতি জানতে পারেনি আলিম সমাজ। কাজ যখন শুরু হয় তখন এ কর্মকান্ড ও কাজের সাথে জড়িতদের একটা নাম সর্বসাধারণের তরফ থেকে দেয়া হয়। তা হচ্ছে 'তাবলীগ'। একটা সংশোধন ও গঠনমূলক আন্দোলনের ভেতরের গভীরতা জানতে ওই নামটি বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালো। এর আত্মোন্নয়নমূলক কর্মকান্ড জানতে পারলো না সর্বসাধারণ। তাবলিগ ফরজে কেফায়া ভেবে লোকজন এদিকে মনযোগ দিল না। কিছু লোক করছে এই ভেবে নিজেকে দূরে রাখলো।

আলিমদের এ কাজে সাড়া না দেয়ার আরেকটা কারণ ছিল তখন তাঁদেরকে বোঝানোর মতো আর কেউ ছিল না। ছিলেন শুধু মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রঃ)। তাঁর কথা বলতে একটু অসুবিধে ছিল। সেটা ছিল জিভের জড়তা। এতে হলো কি তাঁর যে অতি উঁচু পর্যায়ের ভাবাবেগ আর পন্ডিত্ব পূর্ণ কথা ছিল তা বলার সময় উচ্ছাসের প্রচণ্ডতার জড়িয়ে যেত। কিছু কথা ভেতরে থেকে যেত। তাতে বক্তব্য অস্পষ্ট হয়ে যেত। একেই নতুন কাজ। নতুন ভাব। নতুন ধারণা। তার ওপর বোঝানোর দুর্বলতা। ওদিকে একটু বেশি সময় আলিমদের কাছে নেই। কাজেই জটিল হয়ে উঠলো ব্যাপারটা। প্রথম আলোচনায় পরিস্কার হতো না সবকিছু।

হযরত মাওলানা (রঃ) এঁর প্রথম ময়দান ছিল মেওয়াত। ওখানের লোক সহজ সরল। এদের পীর বা নোত কে? মাওলানা ইলিয়াস। তিনিও সহজ সরল। এই জাতির জন্যেই এ কাজ। এতে অন্য আলিমদের হযরতজী (রঃ) সম্পর্কে খুব একটা উঁচু ধারণা হতো না।

যাই হোক, আলিমদের প্রথম দিকের এই ঠাণ্ডা ধারণা আর দূরে থাকা একদিকে ভালই হয়েছিল। কারণ এই আন্দোলনটি ছিল শিশু পর্যায়ে। এর ঠিক পরিচর্যার জন্যে

www.eelm.weebly.com

দরকার ছিল নিরাপদ ও প্রশান্ত পরিবেশ। অতিরিক্ত ভিড় হয়ে গেলে নিরাপত্তা নষ্ট হবার সম্ভাবনা ছিল।

তাই বুঝি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর গোপন গভীর সৌন্দর্য ও যুগান্ত ফলাফল সবাইকে দেখান নি।

মহাসাগরের অতল জলের ঠিকানা পাওয়া যায় না। তেমনি এ কাজের গভীরতা। এমন গভীর আর সূক্ষ্ম কাজটির ব্যবস্থাপনা সাধারণ মানুষের জন্যে নয়। দরকার প্রাজ্ঞ আলিমদের। অথচ তাঁরা কাজে লাগছেন না। কী করা যায়? এতবড় কাজের দায়িত্ব কে নেবে? ভেবে দিশেহারা হন হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)। মাঝে মাঝে হতাশায় ভেঙে পড়েন। মুষড়ে পড়েন। কোথায় যাবেন? কার খোশমদ করবেন? কার হাত পা ধরবেন?

ওদিকে দ্বীন দুনিয়াতে কিভাবে ব্যাপক প্রচার আর প্রসার পায় তা নিয়ে তার মনে প্রচণ্ড আবেগের ঢেউ। সেটা যেন দুকূল ছাপিয়ে তাঁর জীবনতটের কিনারায় প্রবল প্লাবনের মতো ছুটে আছড়ে পড়ছে। বার বার। তাঁর মনের ভেতর এ গোপন আবেগ তিনি কাকে দেখাবেন!

দ্বীনি আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে যাক যাবতীয় মিথ্যার জঞ্জাল। একথাই যেন অনেকদিন ধরে কোন্ অজানা ভুবন থেকে নিরব বাণী শোনাচ্ছিল তাকে কবির ভাষায়-

আলোর এ শারাবখানায় বসতো কতো জলসা
রাতের আঁধার কেটে গিয়ে নামতো দিনের ফর্সা;
ও সাকী! এখনো কি হয়নি সময় জোয়ারের বেলার,
সুরার ফোয়ারা বয়ে যাবার খেলার?

প্রতি পল এসব শব্দ ঝঙ্কার তাঁর হৃদয়ের তন্ত্রীতে তুলতো বেদনার সুর। দাওয়াতের কাজ আরো দুর্বার গতিতে চালানোর জন্যে তিনি ছটফট করে উঠতেন। কিন্তু এক একটা জামাত তৈরি হতো, তিনি দেখতেন তাতে আলিম নেই। ভেঙে যেতো মন।

ওদিকে যতই তিনি মেহনত ও ফিকির করছেন ততই তার চেতনায় বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝলসে উঠছে নতুন তত্ত্বজ্ঞান, কাজের ধারা ও পদ্ধতি। দাওয়াতের কাজের নতুন নতুন দিক নির্দেশনা। আর আশ্চর্য! সবকটাই তার কোরআন, হাদিস, সুন্নাহ অনুযায়ী। আর মিল পাওয়া গেল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আজমাঈনদের জীবনীতে।

এদিকে এসব উচ্চমার্গের ভাব আর তত্ত্বজ্ঞান তিনি কাকে বোঝাবেন? হাতের কাছে ক'জন নতুন যুবক আলেম পেলেন। তাদেরকেই বোঝালেন। আর রয়েছে মেওয়াতের সহজ সরল অশিক্ষিত মানুষেরা। যাঁরা এসব সূক্ষ্ম আর অসম্ভব উঁচু ভাবের আলোচনা পুরোটা বুঝতে পারতো না।

www.eelm.weebly.com

তারপরেও মাঝে মাঝে পরিবেশ খুব প্রাণবন্ত আর সজীব হয়ে উঠতো। সে মজলিশে হয়তো তাঁর সেই ভাবাবেগ তাড়িত কাব্যিক ভাষায় বলে উঠতেন–

উষর সে সাহারায়
নিঃসঙ্গ একটি ফুল
এলো না ভাগ্যহীনের
কাছে ক'রে কেউ ভুল
হায়!
এ সাজা, প্রায়শ্চিত্ত এ জ্বালায়
মরে শুধু মরু প্রজাপতি
যেমন ভরা মাহফিলে জ্বলে মোম
কোথা তার মর্মব্যথী?
আর কতদিন
পাবো সে বন্ধু অচিন
কতকাল পরে
বাজবে মধুর বীণ
এ পথে ও পথে
পৃথিবীর পথে পথে
ঘুরেছে অনেক কাল
পায়নি সুজন
হায়নি কুজন
জাগেনিকো মহাকাল

হে পরম প্রভু

জানাও এবার তবু
আঁধার রাতে কোথায় নাদিম
কোথায় সে জলসার সাথী?
ধূ ধূ মরুতে কোথায় কালিম
হৃদয় তুরে জ্বালাবে বাতি!
এমন সব কবিতা।

এমন সব সূক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ ভাষা কী করে বুঝবে মেওয়াতিরা! যদিও ওরা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে এসব বুঝতো না কিন্তু মনের টানে তারা হতো আবেগ মথিত। কাঁদতো। জাঁপিয়ে পড়তো দ্বীনি দাওয়াতের কাজে প্রবল উদ্যমে।

www.eelm.weebly.com

আসলে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) আলোর সন্ধান পেয়েই এদের কাছে পৌঁছে ছিলেন। করেছিলেন প্রচণ্ড মেহনত। এখানে তার রক্ত পড়েছিলো।। ঝরেছিল ঘাম। সারাজীবনের সাধনার ফসল ছিল ওরা। ওদের আত্মা ঠিক নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। সেজন্যে ওসব সূক্ষ্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের কথা তার ভেতরের ব্যথা ওরা অনুভবে বুঝে নিত। ওদের চোখ ফেটে বেরিয়ে আসতো পানি। হতো উৎসাহিত। অনুপ্রাণিত। বিপুল কর্মশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো কাজে। কাজেই কাজ চলছিল হৃদয় থেকে।

হযরতজীর কথা তাদের হৃদয় বীণার তারে জাগাতো কাঁপন। পেতো নতুন জীবনের সাড়া। তার অন্তহীন অন্তর্জ্বালা ছড়িয়ে পড়তো হৃদয় থেকে হৃদয়ে।

এক হৃদয় থেকে হাজার হৃদয়ে।

বিশ্বজুড়ে।

একলা চলোরে

আলিমরা পাশে নেই।

সেজন্যে বসে থাকলেন না হযরতজী (রঃ)।

তিনি এই কাজের ক্রমশঃ উন্নতির জন্যে মাঠে নেমে পড়লেন। একের পর এক যোগাযোগ করলেন। একটার পর একটা জামাত বের করলেন। সর্বত্র তিনি তাঁর মুখ চালিয়ে গেলেন। উদ্বুদ্ধ করলেন।

সাহারানপুর হচ্ছে দ্বীনি এক উজ্জ্বল কেন্দ্র।

এখানকার শিক্ষক ও শায়খ তাঁর পরিচিত ও ঘনিষ্ঠজন। তিনি তাঁদের সাথে দেখা করে, আলোচনায় বসে। এই কাজের গুরুত্ব ও মহাত্ম বোঝালেন। তাঁরাও সাড়া দিলেন। মেওয়াতে ছোট ছোট সমাবেশ হতো। সেখানে সাহারানপুর মাদ্রাসার শিক্ষকগণ অংশ নিতেন। মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক হাফিজ আবদুল লতিফ সাহেব আসতেন। এছাড়া শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা জাকারিয়া (রঃ) নিয়মিত থাকতেন।

মেওয়াতের জামাতগুলোকে পাঠানো হতো সাহারানপুরে। একটার পর একটা। বছরখানেক মাদ্রাসার একটা কামরায় জামাতের থাকার ব্যবস্থা হতো। ষাট হিজরির মুহাররাম মাসে আলাদা একটা ঘর ভাড়া নেয়া হলো। সেটাও কয়েক মাস পর আর ধরে রাখা গেল না। ছেড়ে দিতে হলো ঘর। আরো দু'টি বছর এভাবেই কাজ চললো।

সাহারানপুর দ্বীনি পরিবেশের কেন্দ্র। সবাই জ্ঞান ও ধর্ম চর্চায় বেশ এগিয়ে রয়েছে। অশিক্ষিত, গেঁয়ো মেওয়াতীরা এখানে এসেছে ধর্মপ্রচারের জন্যে। এটা যেমন হাস্যকর তেমনি বিরক্তিকর ঠেকলো ওখানকার মানুষের কাছে। আসলে এ জামাতটি যে ইসলাহী বা সংশোধনী মূলক একথা পরিষ্কার ছিল না সবার কাছে। ভাবতো শেখাতে এসেছে। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই মনে উঁকি দিত, এরা কী শেখাবে

www.eelm.weebly.com

আমাদের? এরা নিজেরাই তো মূর্খ। কিন্তু মেওয়াতীদের এখানে পাঠানো হয়েছে শেখার ও দ্বীনি পরিবেশ দেখানোর জন্যে।

এমন সব ভুল বোঝাবুঝি দেখে হযরতজী (রঃ) গভীর দুঃখ প্রকাশ করে একটা চিঠি লিখলেন–

'-----ওদের তোমরা মনে ক'রোনা সংশোধনকারী বা শিক্ষক। বরং ওরা ছাত্র। শিখতে বেরিয়েছে। তবে একটা বিষয় ওদের কাছ থেকে আমাদের শেখার রয়েছে। তা হচ্ছে ওরা দ্বীনি শেখার জন্যে ঘর-বাড়ি আর ব্যস্ততা ছেড়ে বেরিয়েছে। আমাদেরও বের হওয়া উচিত। শেখা বা শেখানো দুটোর জন্যে। তা না করে ভুল বুঝে মেওয়াতিদের দোষারোপ করা হচ্ছে। -----'

সারা বিশ্বের বিস্ময়

দুর্ধর্ষ বেপরোয়া মেওজাতি।

কোনো বাঁধনেই যাদের কখনো বাঁধা যায়নি। বর্বর, দস্যু, তস্কর, লুঠেরা। ধর্মের নামগন্ধ যাদের মধ্যে নেই। তারা হিন্দু না মুসলিম চেনা যায় না।

হঠাৎ তাদের কী হয়েছে? কে তাদের মাঝে এমন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিল! বিস্ময়কর আর অভাবনীয় পরিবেশ তৈরি হয়েছে মেওয়াতে। পঁয়ত্রিশটি গাঁয়ে একজনও বেনামাজী নেই। একজনও বে-রোজাদার নেই। সবাই সত্য কথা বলে। সবাই সৎ পথ চলে। সব মেয়েছেলে পর্দা করছে। একজন বালিগ মেয়ে পথে ঘাটে বেপর্দা অবস্থায় নেই!

এ যে অলৌকিক! অসম্ভব!

এ অসম্ভবকে সম্ভব করলেন কে?

উনিশ শো আটান্ন হিজরী।

মেওয়াতে এলেন দেশ বিদেশের লোক। দেখতে। মানুষের পরিবর্তন। আঁধার থেকে আলোতে ফেরার দৃশ্য। অনেকে এলেন এর নেপথ্য নায়ক হযরতজী (রঃ) কে দেখার জন্যে। দুর দূরান্ত থেকে আসছে লোক। এলেন দারুল উলুম নাদওয়াতুল ওলামার কিছু শিক্ষক। তারা দেখে অভিভূত হলেন। ফিরে গিয়ে এ আশ্চর্য পরিবর্তনের কথা বললেন। আরো মানুষ এলো। দলে দলে। তারা এটাকে এক 'আশ্চর্য আবিস্কার' বললেন। তারা ভাবলেন কী করে সম্ভব হলো এটা?

যাঁরা এলেন তাদের খুব যত্ন নিলেন। প্রশংসা গায়ে মাখলেন। কারণ তিনি কখনই প্রশংসা পছন্দ করতেন না। স্বভাবজাত বিনয়ী ছিলেন তিনি। বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র-শিক্ষক এলো। তিনি তাদের খুবই সম্মান ও সমাদর করলেন।

www.eelm.weebly.com

তারা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে পড়লো।

দিন গেল।

রাত এলো।

বছর গেল।

সময় মেওয়াতকে পৃথিবীর সবচেয়ে দর্শনীয় জায়গায় পরিণত।

মেওয়াত হলো সারা বিশ্বের বিস্ময়।

কাজ চলছে দুর্বার গতিতে।

সেজন্যে মাঝে মাঝে সবাইকে ডেকে দেখা দরকার কর্মীরা কি পরিমাণ দ্বীনি কাজে এগুচ্ছে। তাদের উৎসাহজনক কথা বলে আরো উদ্দীপ্ত করা, যেসব জায়গায় কর্মপদ্ধতি ভুলচুক হচ্ছে সেগুলো শুধরে দেয়া ইত্যাদির জন্যে বছরে একবার ইজতিমা বা সমাবেশের আয়োজন করা হলো নূহে। এছাড়া সারা বছর মেওয়াতের কোথাও না কোথাও ছোট খাটো সমাবেশ হতো। এই ইজতিমা বা সমাবেশে দিল্লীর বিভিন্ন এলাকার তাবলিগ। জামাতের লোকেরা আসতো। সাথে থাকতেন নিজামুদ্দিন বাংলাওয়ালি মসজিদের মুরুব্বী ও ওলামাগণ। আসতেন মাজাহিরুল উলুম দারুল উলুম দেওবন্দ, দারুল উলুম নাদওয়াতুল ওলামা আর দিল্লী ফতেহপুর মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকরা।

হযরতজী (রঃ) ও তাবলিগ জামাতের বড় বড় দায়িত্ববান সাথীরা ওই ইজতিমার উদ্দেশে রওনা হতেন। যাবার আয়োজন হতো সাধারণতঃ ট্রেনের। গোটা পথে হযরতজী (রঃ) দ্বীনি আলোচনা করতেন। দাওয়াতের কাজের নিয়ম নীতি ও আদব সম্পর্কে। সে আলোচনা গভীর আবেগ আর তত্ত্বপূর্ণ। হযরতজী (রঃ) এঁর কথায় যাত্রীরা খুবই উপকৃত হতেন। এটা ছিলো যেন একটা পথচলা সমাবেশ। নূহের একটা মাদ্রাসার সামনের বিশাল চত্বর। সেখানে শামিয়ানা টাঙানো। সুবিশাল।

হযরতজী (রঃ) এসেছেন।

শুনে পাগলের মতো ছুটে এলো জনতা। দলে দলে পতঙ্গের মতো। তাঁবু ছেড়ে। মুসাফাহার জন্যে। ঘিরে ধরতো তাঁকে। মৌমাছির মতো। হযরতজী (রঃ) সবার সাথে হাত মিলাতেন। সবার আগ্রহকে গ্রহণ করতেন। গভীর আন্তরিকতার সাথে। কাউকে জড়িয়ে ধরতেন। কখনো হাত তুলে দিতেন কোনো গরীব মেওয়াতির মাথায়।

তখন তাঁর সময় কাটতো গরীব মেওয়াতিদের মাঝেই। আর আশ্চর্য! মেওয়াতে এলে হজরতজী (রঃ এঁর ভেতরে আবেগের ঢেউ যেন দু'কূল বেয়ে উপচে পড়তো। বেড়ে যেত উৎসাহ, উদ্দীপনা। কথায় ফুটতো আলোর ফুলঝুরি। যেন জ্ঞান ও খোদাতত্ত্বের বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। দ্বীন ইসলামের নিয়ম আর তার রহস্য ও কারণ খুলে খুলে বলতেন তিনি। যেন আপনা আপনি পর্দা খুলে জ্ঞানের নিগূঢ় রহস্য উপচে পড়তো তাঁর ঠোঁটের দু'কূল বেয়ে।

www.eelm.weebly.com

এসব বোঝায়, উপলব্ধি করার কথা অশিক্ষিত মেওয়াতিদের নয়। কিন্তু তারা শুনতো নির্বাক হয়ে। আর তাঁদের আত্মার জগতে কি এক বিপ্লব ঘটে যেতো যে তারা যেন পাগলপারা হয়ে শুরু করে দিত দ্বীনি কাজ। এক অপার জগত থেকে নেমে আসতো প্রাণবন্ত সজীবতা অচেনা মনে হতো তাদের।

কী এক রহস্যময় কারণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে আজ তারা।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) প্রথম মেহনত করেছেন মেওয়াতে। এখানে এলেই তিনি কেমন যেন আবেগ তাড়িত হয়ে পড়তেন। তাঁর আহার নিদ্রা যেন উড়ে যেতো। রাতে সাধারণতঃ মসজিদের কামরায় কিংবা চত্বরে আরাম করতেন। সারাদিন আর রাতের বেশিরভাগ কেটে যেত মেওয়াতিদের সাথে আলাপ আলোচনায়। নিজামুদ্দিনে খানিকটা সময় নিরবতায় কাটাতেন। সেটাও এখানে হতো না। তাঁর সারা দিনমানের ব্যস্ততা দাওয়াত আর এর গুরুত্ব-মাহাত্ত্বের আলোচনা নিয়ে।

যখন মেওয়াত থেকে ফিরে যেতেন তখন শারিরীক ক্লান্তিতে তিনি কাতর। গলা বসে যেতো। গায়ে জ্বর। অবর্ণনীয় অবস্থা।

নূহে বছর শেষে হতো সামাবেশ বা ইজতিমা।

এর উদ্দেশ্য ছিল সমবেতভাবে সবার ভেতর সত্য, সহজ, সরল, পথে চলার মন তৈরি হয়ে যায়। সত্যিই, এ সমাবেশগুলো দেখার মতো। গুরু, গম্ভীর, প্রশান্ত পরিবেশ। অসংখ্য, অগণিত মানুষ। অথচ নেই কোনো বিশৃঙ্খলা। কে যেন অলক্ষ্যে থেকে সব গুছিয়ে রাখছেন। সবার চেহারা কি এক ব্যাখ্যাতীত আলোর ঝকমক করছে। কারো ভেতর কোনো ক্ষোভ, আক্ষেপ, অভিযোগ, অনুযোগ নেই। এখানে ধর্মের নিরব জাগরণ জেগেছে। মানুষ তার ইহ ও পারলৌকিক সফলতার চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছে। পেয়েছে সত্যের, ন্যায়ের, সুন্দরের পথ নির্দেশ। গাঢ় আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়ায় মৃত হৃদয় জীবন পাচ্ছে। এমন আলো ফুটেছে এ সুবিশাল শামিয়ানার নিচে, চারপাশে যে তার স্নিগ্ধ ছোঁয়া লাগে অক্ষমনে। ঝলসে ওঠে ইসলামের সেই শৌর্য, বীর্য আর দিগ্বিজয়ী রূপ। অসীম ক্ষমতাময় এ প্রাণের বন্যা। প্রলয়ঙ্করী। ঋদ্ধ। অবিশ্বাস্য বিধ্বংসী তান্ডব লুকিয়ে রয়েছে এর প্রাণের ভেতর। স্থির রয়েছে। রয়েছে অচঞ্চল। কিন্তু যদি ফুঁসে ওঠে তাহলে পলকে, বিদ্যুৎগতিতে গেঁথে ফেলে যাবতীয় অবিশ্বাস, অশুভ আর অমাবস্যার আঁধার।

পাষাণ আত্মায় ঢুকেছে আলো। ভিজে গেছে এ সমাবেশের রুহানী পরশে। চারদিকে চলছে জিকির। গুনগুণ করে। মানুষের ঢল নেমেছে। কাতার চলে গেছে মসজিদ, শামিয়ানা ছেড়ে রাজপথে। মহাসড়কে।

দিন গেল।

রাত এলো।

www.eelm.weebly.com

বয়ান তাশকীল (আল্লাহর রাস্তায় যাঁরা যাবেন তাদের নির্বাচন) শেষ হলো। অল্প করে সবাই পড়ছে নামাজ। নফল। পড়েই চলেছে। রাত ভোর করে দিচ্ছে কেউ। দাঁড়িয়ে বসে, সিজদায় পড়ে চাইছে দোয়া। চোখের পানি ফেলে। সকাতরে।

কেঁদে কেঁদে।

ওরা কাঁদছে।

মানুষের মঙ্গলের জন্যে। কল্যাণ কামনায়।

মানুষের মুক্তির জন্যে। হিদায়াতের আশায়।

শেষ রাত।

এ দৃশ্য দেখে স্তব্ধ হয়ে যায় হৃদপিণ্ডের গতি। খোলা আকাশের নিচে পড়ে আছে মানুষ। ঘুম। চেহারায় দারুণ প্রশান্তির ছাপ। আরেক দল শুয়ে আছে শামিয়ানার নিচে। কিছু ঘুমুচ্ছে বৃক্ষের ছায়ায়। শামিয়ানা চুষে পড়ছে কুয়াশার পানি। ফোঁটায় ফোঁটায়। প্রকৃতির এ জ্যোতির্ময় ছোঁয়ায় সিক্ত হচ্ছে মানুষ। ওদের কোনো কষ্ট নেই। কী এক চরম পাওয়া তাদের এমনি পূর্ণতা দিয়েছে যে জাগতিক কষ্ট, অনিয়ম তাদের কাছে আনন্দের। সে পাওয়া হচ্ছে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির মিলন।

ওরা ঘন্টার পর ঘন্টা স্থির বসে শুনে যাচ্ছে দ্বীনি কথা। একটু অস্বস্তি নেই। নেই একটু নড়াচড়া। কথা শেষ হলে সবাই কম বেশি সময় নিয়ে বের হয়ে যেত। আর সেটাই ছিলো এ ইজতিমা বা সমাবেশের উদ্দেশ্যে। যতো বেশি লোক আল্লাহর রাস্তায় তিনদিনের শেষ বের হতো সমাবেশ ততো বেশি সফল হিসেবে ধরা হতো।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) সব সময় তাগিদ দিতেন শুধু ধর্মীয় কথা শোনা নয় বরং ধর্মীয় কাজ শেখার জন্যে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়াই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য। সেজন্যে তিনি নিজে গিয়ে কিংবা লোক পাঠিয়ে, খোঁজ নিতেন। দেখতেন লোকজনদের আল্লাহর পথে বের করার জন্যে কি উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। পরে তাদের উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত করার কৌশল বলে দিতেন। এজন্যে আগেই যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রচারকদের ডাকতেন। কাজ বুঝিয়ে দিতেন। তাঁরা সাধারণ জনতার মাঝে কাজ করতেন। পরে বিভিন্ন এলাকার প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের এক করতেন। তাদেরকে দিয়ে নিজ নিজ এলাকার লোকদের আল্লাহর পথে বেশি করে সময় নিয়ে বের হবার জন্যে উৎসাহিত করতেন। তৈরি হতো নতুন জামাত।

হযরতজী (রঃ) ছিলেন চিররোগা। অথচ প্রচণ্ড পরিশ্রমী। একেক দিনে তার মেহনতের পরিমাণ বিস্ময় সৃষ্টি করতো। সমাবেশ শেষ করেই তিনি মেওয়াত ছাড়তেন না। ক'টা জামাত বেরুলো, সে জামাতে একজন আলিম, একজন হাফিজ, কিছু পুরনো আর বাকী নতুন সাথী আছে কিনা দেখতেন। কোথায় পাঠানো হচ্ছে খেয়াল রাখতেন। সাথীদের ঠিক মতো শিক্ষা আর দীক্ষা হবে কিনা এসবও তাঁর নজর এড়াতো না।

www.eelm.weebly.com

পুরো কাজটির শেষ পর্যন্ত না দেখে তিনি নাওয়া খাওয়া, আরাম ভুলে যেতেন। এছাড়া যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হতে পারলেন না তারা এলাকায় কিভাবে কাজ করবে তার রূপরেখা ও কর্মসূচি ঠিক করে দিতেন। যারা বেরুলো তাদের সময় যেন সঠিকভাবে ব্যবহার হয় তার যাবতীয় ব্যবস্থা ও কর্মসূচি তৈরি করে ফিরে আসতেন নিজামুদ্দিন।

ফেরার পথে হয়তো তাঁর কোনো অনুরাগী দাওয়াত দিল বা বাড়িতে নেবার জন্যে অনুরোধ করতেন। কিন্তু তেমন সময় তাঁর হতো না। কারণ ওদিকে নিজামুদ্দিনের পরিবেশ ও কাজ সামলাতে হবে।

হযরতজী (রঃ) এঁর সাথে দিল্লী ও নিজামুদ্দিনের পুরনো কর্মীরা আসতেন। তারা এসব কাজে খুবই দক্ষ। এঁরা দু'চারদিন আগে এসে যারা সমাবেশে আসবে যাতে মনযোগ দিয়ে ধর্মীয় কথা শুনতে পারে সেজন্যে পরিবেশ তৈরি করতেন। সমাবেশ শেষ। অনেক জামাত তৈরি হয়েছে আল্লাহর রাস্তায় বের হবার জন্যে। ওদের ঠিক মতো সাজিয়ে,. সামানা পত্র কেনার ব্যবস্থা করে, কিভাবে সময় কাটাবে তার দিক নির্দেশনা দিয়ে পাঠানোর জন্যে ইজতিমা শেষেও কিছুদিন থাকতে হতো।

সমাবেশের সময় চারদিক থেকে অসংখ্য মেওয়াতি তাঁর কাছে আসতো। বাইআত হতে। শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে। তিনি তাদের ফেরাতেন না। সে সময়ও তাদের কাছে এই কাজে নিবেদিত হবার দাওয়াত দিতেন। তখন এসব নতুন শিষ্যরা দ্বীনের কাজের নতুন কর্মী হতো। তারা মনপ্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো দাওয়াতের কাজে।

মেওয়াতিরা বেশির ভাগই ছিল দীনহীন। গরীব। কিন্তু তাদের মন দরিদ্র ছিল না। নূহের ইজতিমাগুলোতে লোকজনের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে যেত। তিনদিন ধরে চলতো সমাবেশ। তিনদিনে ন'বেলা খাওয়া দাওয়া করাতে হবে এই। সেজন্যে মোটেও দ্বিধা, সংকোচ বা হতাশা নেই মেওয়াতিদের মাঝে। বিপুল আগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারা। মেহমানদারী করে তারা যেন ধন্য হয়েছে। তাদেরকে দেখে মনে পড়ছে সেই প্রাচীন আবরদের কথা। মহান সেবক আকাশ হৃদয় মানুষের কথা। আর আশ্চর্য! কোথেকে খরচপাতি জোগাড় হয়ে যাচ্ছে তা মহান ক্ষমতাধর প্রভু প্রতিপালক আল্লাহতায়ালাই জানেন। যখন যা দরকার এসে যাচ্ছে।

অদৃশ্য ভান্ডার আজ উজাড় হচ্ছে।

ওদের নিয়তের ওপর।

খাওয়া দাওয়া, থাকা শোয়া সবদিক লক্ষ্য রাখছে মেওয়াতিরা। এতটুকু ক্লান্তি নেই, নেই বিশ্রাম। সবশেষে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে অতিথিদের কাছে। আগত জনতার খাতিরের সাথে সাথে সম্মান ও খেদমত করছে যাঁরা আলিম, মাশায়েখ ও বুজুর্গ। গভীর আন্তরিকতা ও প্রগাঢ় ভক্তি ভরে। নতুন প্রতিটি অতিথিকে এমন করে সমাদর করছে যেন পীরকে তার মুরিদ অভর্থ্যনা জানাচ্ছে। আতিথেয়তা করছে। বাইরে থেকে আসা

www.eelm.weebly.com

প্রতিটি মুসলমান যেন এদের কতদিনের চেনা উপকারী বন্ধু। সবাই যেন এদের দয়া করেছে। তার কৃতজ্ঞতায় এরা দিশেহারা। যেন এরাই মেওয়াতিদের ঈমান শিখিয়েছে। দ্বীনের মতো মহামূল্যবান সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছে। যা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল।

এসব সমাবেশে গেঁয়ো, চাষা, মূর্খ মিওয়াতির মহানুভবতা, বিনয়, অতিথি পরায়ণতা, উদ্দীপনা, বিপুল দ্বীনি উৎসাহ ও আগ্রহ, এবাদতে নিমগ্নতা, আল্লাহর ভয়ে তাদের করুণ কান্না, দ্বীন পুনর্জীবিত করার সীমাহীন স্পৃহা, অবর্ণনীয় অনুপ্রেরণা, বিরামহীন পরিশ্রম দেখলে চৌদ্দশো বছর আগের সে সব আত্ম উৎসর্গ কারী মহান মানুষদের কথা মনে পড়ে যায়।

মনে হয় ঘুরে ফিরে ফের যেন সেই সব মানুষেরা ফিরে এসেছে! নতুন রূপে!

মেওয়াতিদের এ নবজীবন, এ পবিত্র জীবন যাপনের জোয়ারের নেপথ্য মানুষটি ছিলেন প্রচারবিমুখ মহান মুজাদ্দিদ ও যুগান্তকারী সংস্কারক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ)। এ প্রশিক্ষণ তিনিই দিয়েছিলেন। তাঁর রক্ত, ঘাম ও পরিশ্রমে বদলে গিয়েছিল এক বর্বর, দুরন্ত, মূর্খ মানুষেরা এমন উজ্জ্বল নক্ষত্রে। যাদের দ্বীনি ও আধ্যাত্মিক অবস্থা দেখে অনেকেই দুঃখ ও ধিক্কার দিতেন নিজেদের জীবনের ওপর। অনেক সময় নিজেকে কপট মুনাফিক বলে মনে হতো। এমনকি ওঁদের দেখে অনেক নিজেকে মুসলমান ভাবতে লজ্জা পেতো।

হিজরি তেরোশো ষাট

জিলক্বদ মাস। আট, নয় ও দশ তারিখ।

উনিশ শো একচল্লিশ সাল।

নভেম্বর। আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ।

গৌড়গাঁও জিলা।

নূহ।

সুবিশাল শামিয়ানা। অগুণিত মানুষ। শুধু টুপি আর টুপি। হাজারে হাজার। সমুদ্র। মানুষের। পঁচিশ হাজার মানুষ একত্রিত হয়েছে। খোলা আকাশের নিচে। মাটির বুকে। তিনদিন ধরে। এ পর্যন্ত যত ইজতিমা হয়েছে তার মাঝে সবচেয়ে বড়।

আক ক'দিন ধরে এই জনতা নিজের বিছানা, হাঁড়ি, পাতিল, বাসন-কোসন, চুলা আর খাবার কাঁধে নিয়ে চলে এসেছে বাড়ি ছেড়ে। পায়ে চলার পথে। কেউ আশি, কেউ ষাট, কেউ হয়তো চল্লিশ মাইল পথ হেঁটেছে। ঘেমে নেয়ে গেছে। ক্লান্ত। কিন্তু চেহারায় খুশির বন্যা।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এসেছেন হাজারেরও বেশি। একই শামিয়ানার নিচে রয়েছেন তাঁরা জুম্মার নামাজ পড়িয়েছেন হযরত মাওলানা হুসাঈন আহমাদ মাদানী (রঃ)। ইজতিমা চত্বরের আশপাশের সবকটা জামে মসজিদ মুসুল্লিতে টইটুম্বুর। তবু প্রধান জামাতের

www.eelm.weebly.com

লোকজন এতো বেশি যে জামাআতের সময় রাস্তায় যানবাহন সব আটকা পড়েছে। চারপাশের বাড়ি ঘরের ছাদে মানুষ। শুধু মানুষ আর মানুষ। মানুষের ঢেউ।

এতোবড় সমাবেশ।

অথচ নেই কোনো সভাপতি। না আছে অভ্যর্থনা কমিটি। নেই কোনো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। কিন্তু পুরো সমাবেশে দেখার মতো শৃঙ্খলা। হইচই হল্লা নেই। চুরি নেই। গালি গালাজ নেই। নেই কোনো অশান্তি। প্রশান্ত, গম্ভীর পরিবেশ। লোকের চোখ বয়ান শোনার পর অশ্রুবতে ভেজা। ঝকমক করছে চেহারা স্বর্গীয় আলোতে।

চলছে মেহমানদারী। সেখানেও নেই কোনো বিশৃঙ্খলা।

সুশৃঙ্খল প্রশাসন।

পরিশ্রমী কর্মীদের বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা।

পয়সা বা মজুরি দিয়ে এমন একটা বাহিনী পাওয়া যাবে না।

এ সমাবেশে এসেছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব খান বাহাদুর হাজি রশিদ আহমাদ, হাজি ওয়াজিহুদ্দিন ও শফি কুরাঈশী। এদের প্রত্যেকের গাড়ি রয়েছে। বড় বড় আলিম, মাশায়িখ ও বুজুর্গদের আনা নেয়াতে তাঁদের গাড়ি ব্যবহার করা হলো। এতে বেশ সুবিধে হলো।

এখানে এসেছিলেন উপমহাদেশের সুবিখ্যাত আলিম মুফতি কিফায়তুল্লাহ (রঃ)। তিনি এক সময় আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বললেন, 'অনেক ধর্মীয় সভায় থেকেছি। দেখেছি অনেক রাজনৈতিক সম্মেলন, অংশ নিয়েছি বহু ওয়াজ মাহফিল আর মজলিশে। তবে এখানে যা পেলাম আগে কখনো পাইনি। এখানে যা দেখলাম তা অভূতপূর্ব। পরমপ্রভু আল্লাহ তায়ালা জাল্লাশানুহু'র করুণা বারিধারায় সিক্ত এমন সমাবেশ আমি আর দিখিনি।'

এই সমাবেশে ভোরে, সকালে, বিকেলে, সন্ধ্যায় বিরামহীন কথা বললেন (রঃ)। আবেগে উত্তাল হলো জনতা।

নামাজ শেষে সমাহিত স্তর থেকে যেসব আবেগমথিত শব্দ তিনি দোয়ায় চয়ন করলেন তা যেমনি মর্মছোঁয়া তেমনি হৃদয়বিদারক।

ধীরে ধীরে মেওয়াত দ্বীনি আদর্শের এক কেন্দ্রস্থলে পরিণত হলো। চৌদ্দশো বছর আগের মদিনা মানোয়ারার ছায়া দেখা যেত এখানে। সারা দুনিয়া থেকে আসতে শুরু করলো জামাত। দ্বীনে শেখার জন্যে। গোটা মেওয়াত জুড়ে একজনও বেনামাজী নেই, একজনও বেদ্বীন নেই। সবাই তিনচিল্লা দিয়েছে। সবাই পর্দা করছে। সত্য আদর্শের মূর্ত প্রতীক ওরা। এক স্বর্গীয় পরিবেশ। দারুল হিজর, দারুস সুন্নাহে পরিণত হলো এক কালের আঁধার জগত। জগদ্দল পাথরের মতো জমাট আঁধার কেটে এলো হিরন্ময় ঝকঝকে আলোর পৃথিবী।

মেওয়াত।

আজ সারা বিশ্বের বিস্ময়।

www.eelm.weebly.com

এবার মেওয়াতিরা ছুটতে শুরু করলো। দূর থেকে দূরে। আরো দূরে। দেশ হতে দেশ দেশান্তরে।

কখনো উত্তর প্রদেশ।

কখনো পাঞ্জাবের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

কখনো খোরজা, আলিগড়, আগ্রা, বুলান্দশহর, মিরাট, পানিপথ, সোনিপথ, কর্ণাল, রোহিলাখন্ড। এছাড়া আরো সব শহরে। বার বার গেল এরা। ওখানে শুরু হলো বুনিয়াদী মেহনত। একসময় সেখানকার লোকেরাও সময় নিয়ে বের হতে শুরু করলো জামাতে। তারা হাতে কলমে কাজ শেখার জন্যে চলে এলো নিজামুদ্দিন।

নিজামুদ্দিন বাংলাওয়ালী মসজিদ আলোয় আলোকিত! কতো রঙের, কতো দেশের মানুষ এসে ভিড় করেছে এখানে।

এবার মেওয়াত থেকে জামাত যাবে করাচির উদ্দেশে।

ফেব্রুয়ারি মাস। উনিশ শো তেতাল্লিশ সন।

করাচিতে যাবার জন্যে এই প্রথম একটা জামাত তৈরি হয়েছে। বন্দর নগরী করাচি হচ্ছে আরব সাগরের তীব্র। হযরতজী (রঃ) চেয়েছিলেন সাগর তট জুড়ে এলাকাগুলোতে জামাত পাঠাতে। কারণ সেখানে বিভিন্ন দেশের মানুষের আনাগোনা। মানুষের প্রাচীন সভ্যতা ও বস্তি গড়ে ওঠে নদী ও সমুদ্র তীর ধরে। অনেক আগে সমুদ্র উপকূলে গড়ে উঠেছিলো সুমেরীয়, মিশরীয়, ভারতীয়, চীন ও আরবীয় সভ্যতা। হযরতজী (রঃ) তাই মনে করতেন এখানে আসা বিদেশিরা কাজ শিখে নিজ নিজ দেশে দাওয়াতের আমল করবেন। উপকূলীয় বন্দরগুলোর মাধ্যমে বিশেষ করে দাওয়াত আরব উপকূলে পৌছুবে। সেখান থেকে গোটা আরবভূমিতে ছড়িয়ে পড়বে দাওয়াত।

করাচির জামাতে ছিলেন হযরতজী (রঃ) এঁর বিশেষ ভক্ত ও অনুরাগী হাজী আবদুল জাব্বার ও হাজী আবদুস সাত্তার সাহেব।

দ্বিতীয় জামাত যায় ওই সালেরই এপ্রিল মাসে। জামাতের আমির ছিলেন সৈয়দ রেজা হাসান।

হিজরি বাষট্টি। রজব মাস।

আঠারো জুলাই। উনিশ শো তেতাল্লিশ।

হযরতজী (রঃ) রওনা হলেন লাখনৌ এর উদ্দেশে। লাখনৌ হচ্ছে দ্বীনি কেন্দ্র। এখানে রয়েছে দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা। আজ থেকে তিন বছর আগে একদল ছাত্র এখানে থেকে গিয়েছিল নিজামুদ্দিন। সেখানে হাতে কলমে কাজ শিখে লাখনৌ ফিরে আসে। এখানে শহরের আশপাশে আর বস্তিগুলোতে দাওয়াতের মেহনত করে। এরা বাৎসরিক ছুটি হাটার সময় চলে আসতো নিজামুদ্দিন। থাকতো হযরতজী (রঃ)

www.eelm.weebly.com

এর খেদমতে। কাজেই বেশ ভালো একটা আন্তরিকতা গড়ে উঠলো ওদের সাথে। ওরা একদিন অনুরোধ করলো হযরতজীকে লাখনৌ যেতে হবে।

হযরতজী লাখনৌ আসার আগে একটা আগাম জামাত পাঠিয়ে দিলেন। সাথী চল্লিশ পঞ্চাশ জনের ওপরে। তারা এখানে আগেই পরিবেশ তৈরির কাজে লেগে গেলেন।

জামাত থাকতো নাদওয়াতুল উলামা দারুল উলুম ভবনে। রোজ ওখান থেকে বেরিয়ে যেতো। মেহনত করতো আশপাশের কোনো এলাকায়। গাশ্ত হতো। ঘোরাফেরা করে পথভোলা লোকদের দাওয়াত দেয়া হতো মসজিদে। পরবর্তী ওয়াক্ত নামাজের জন্যে। নামাজ শেষে খোশামোদ করা হতো বয়ানে বসার। বেশ লোকজন হতো।

সকালে তালিম হতো। সুরাগুলো সঠিক মাখারজসহ পড়া। সাহাবাদের জীবন চরিত আলোচনা করা। তারপর নামাজ, রোজা, জিকির ও কোরান পড়ার লাভ আলোচনা করা হতো ফাযাইলের কিতাব থেকে। মাসলা মাসায়িলের আলোচনা হতো খানিক্ষণ। এবার দাওয়াত আমাল করার জন্যে যা গুণের দরকার তার চর্চা। সবেশেষে বিশ্রাম ও নামাজ। বিকেলে ফের দাওয়াত, বয়ান ও তাশকীল।

এর মাঝে এলেন হজরতজী (রঃ)।

তাঁর সাথে ছিলেন হাফিজ ফখরুদ্দিন, হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হাসান, শফি কুরাঈশী ও হাজি নাসিম সাহেব।

পথে পড়লো মোতিমহল পুল। তার খানিক আগে তৃণভূমি। ফিকে সবুজ রঙের মনোহর দৃশ্য। ওখানে মনজিল করলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে পড়লেন নফল নামাজ। তারপর বসলেন দোয়ায়। গভীর আন্তরিকতা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দোয়া করলেন। মনে হলো যেন আপনজনের সাথে কথা বলছেন। বড় কাতর, ব্যথাভরা কাকুতি মিনতি ঝরে পড়লো সে দোয়ায়।

খানিক পরে এসে পৌঁছুলেন দারুল উলুম। তিনি ভবনে না ঢুকে সবচেয়ে আগে মসজিদে এলেন। এখানে চলছে তালিম। সবার হৃদপিণ্ডের গতি উত্তাল হয়ে উঠলো। একটু থমকে গেল যেন মধুর গুঞ্জন। তারপরেই সবাই কোরান হাদিসের মাহাত্মকে সামনে রেখে পুরো মনোযোগ দিলেন তালিমে। কেউ উঠে এসে দাঁড়ালো না, মুসাফাহা করলো না। এমন প্রচণ্ড টানকে অমানবিক মানসিক শক্তিতে রোধ করে লেগে গেল শেখা শেখানোর কাজে। আল্লাহকে রাজী খুশি করার কাজে।

হজরতজী (রঃ) ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তার চোখ থেকে ঝরে পড়ছে রাজ্যের স্নেহ, মায়া ও মমতা। শেষে জামাতের আমির হাফিজ মকবুল হাসান সাহেবের সাথে মুসাফাহা করলেন।

www.eelm.weebly.com

দরকারী কথা ও কুশল জেনে চলে এলেন কামরায়। দরকার বিশ্রাম। ঘুম।

নাদওয়াতুল ওলামার সৌন্দর্য বেড়ে উঠেছিল আরেকজনের উপস্থিতিতে। তিনি হচ্ছেন জগদ্বরেণ্য আলিম হযরত মাওলানা আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নাদভী (রঃ)।

হযরতজী (রঃ) এঁর একটা সফর হয়েছিলো। রেল যাত্রা। সেটা ছিল পাঁচ ছ'ঘন্টার। থানাভবনে ষ্টেশন থেকে কান্দালা পর্যন্ত। এ সময় তাবলিগ ও দাওয়াতের কাজের নীতি ও পরিচিত নিয়ে আলাপ করেন হজরতজী (রঃ)। এবার সৈয়দ সাহেব হজরতজীর সঙ্গ পাচ্ছেন। তিনি সতেরোই জুলাই এখানে এসেছেন। হজরতজী (রঃ) পৌছানোর একদিন আগে।

উনিশ জুলাই।

আজ জলসা রয়েছে হাবাশ খান ঘটকে।

একদিন এক ফাঁকে নিজের মতামত নিবেদন করলেন সৈয়দ সাহেব। বেশ ফলপ্রসূ আলোচনা হলো।

আরো আটদিন থাকলেন সৈয়দ সাহেব।

হজরতজী (রঃ) এঁর পাশে পাশে। সারাক্ষণ।

নাদওয়াতুল উলামা আরো আলোকিত হলো যখন শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা জাকারিয়া, মাওলানা মানজুর নোমানী ও মাওলানা আবদুল হক মাদানী সাহেব চলে এলেন।

তিনদিন ধরে হজরতজী (রঃ) দাওয়াতের কাজের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও নীতিমালা তুলে ধরলেন। এ আলোচনা হলো চৌধুরী নাঈমুল্লাহ সাহেবের বিশাল অট্টালিকায়। পরে আরো দু'দিন আলোচনা করলেন। সেটা হলো 'ভূপাল হাউসে'। এটা হচ্ছে শায়খ ইকবাল আলী সাহেবের বাড়ি। আলোচনা হয়েছিল আসরের পর।

তিনি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আলোচনা করলেন। অতিথিদের সামনে। মেহমানখানায়। সে সব আলোচনা অত্যন্ত উচ্চমার্গীয়। গভীর তত্ত্বজ্ঞানমূলক। ধর্মের মৌলিক গুণাবলীর ওপর।

জুমা মসজিদে চলতো সর্বসাধারণের জন্যে আলোচনা। জোহর থেকে আসর পর্যন্ত।

আজ শুক্রবার। শেষদিন।

আমিরুদ্দৌলা ইসলামিয়া কলেজ।

সেখানে আজ লোকে লোকারণ্য। বিশাল সমাবেশ। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। এ মহান মজলিশে প্রথম বক্তব্য রাখলেন আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নাদভী (রঃ)। হৃদয়বিদারী সে আলোচনায় গোটা সমাবেশ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। সবার চোখে পানি। তিনি দাওয়াত ও তাবলিগের লাইনে আমাদের পূর্ব পুরুষরা কি সীমাহীন কুরবানী দিয়েছেন তার আলোচনা করলেন।

www.eelm.weebly.com

এবার কথা রাখবেন হজরতজী (রঃ)।

তীব্র, আবেগ, অবর্ণনীয় ব্যথাভরা তাঁর বক্তব্য পুরো মজলিশকে কোন এক অচিনপুরে নিয়ে গেল যেন। অনেকেই বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যেন নতুন সত্যকে উপলব্ধি করলেন।

তিনি তাশকীল করলেন।

সবাই এ কাজ শুরু করার অঙ্গীকার করলো।

সেদিন জুমা পড়লেন মামা-ভাগ্না কবরওয়ালী মসজিদে। নামাজ শেষে ছোট্ট বক্তব্য রাখলেন হজরতজী (রঃ)। তিনি মুসুল্লিদের বললেন, 'সবাই কানপুরে চলো।' সবাই চুপ করে বসে রয়েছে। তিনি আবার বললেন, 'দিল্লীর জামাতের সাথে কানপুরে চলো। সবাই চুপ রয়েছে। দিল্লীর জামাতের সাথে কানপুরে যাবার জন্যে কেউ তৈরি নয়।

নিদারুণ মর্মব্যথায় কাতর হয়ে পড়লেন হজরতজী (রঃ)। অধঃপতিত এ মুসলিম জাতির উদ্ধারের একমাত্র পথ দাওয়াত ও তাবলিগ। তাহলে কেন মুসলমান আল্লাহর পথে যেতে তৈরি নয়?

কেউ যাতে মসজিদ ছেড়ে যেতে না পারে সেজন্যে প্রতিটি দরজামুখে পাহারাদার রাখলেন। তিনি যেন অসহনীয় বিষজ্বালায় কাঁপছেন। তাঁর চেহারা ঘামে ভেজা। টকটকে লাল। চোখে ব্যথার অশ্রু। তিনি এসে দাঁড়ালেন মজলিশের মাঝখানের দরোজায়। ভাব ও আবেগে তিনি মথিত।

ফের বয়ান রাখলেন। গোটা মণ প্রাণ ঢেলে বোঝালেন দাওয়াত ছাড়া মুসলমানের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। বোঝালেন এ বের হওয়া কতটুকু দরকার। তারপর মজলিশের দিকে হেঁটে চলে এলেন। একেকজনকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলেন 'বলো, কী কারণে তুমি যেতে পারবে না। কী অসুবিধে?

ধীরে ধীরে মজমা যেন নতুন চেতনা পেল। একজন একজন করে উঠে দাঁড়ালো। তৈরি হলো কানপুরে যাবার জামাত।

হাজী মুহাম্মাদ ওয়ালী সাহেব অসুস্থ। অর্শ রোগে ভুগছেন। তাঁকে ধরলেন হজরতজী (রঃ)। তিনি বললেন, 'আমার তো মরণ দশা। ব্যথায় উঠতে বসতে পারি না। মরতে চলেছি।

'মরবে যখন আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে মরো।' জবাব দিলেন হজরতজী (রঃ)।

হাজী সাহেব রাজী।

তিনি সুন্দর ভাবেই সময় লাগালেন। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন।

সুবহানাল্লাহ!

আশ্চর্য!

হজরতজী (রঃ) রায়বেরেলি এলেন।

www.eelm.weebly.com

রাতের গাড়িতে। পৌঁছুতে বেজে গেল রাত তিনটে।

রায়বেরেলী।

শহরে থেকে খানিকটা দূরে অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে 'সয়' নদী। এর কিনার ঘেঁষে গড়ে উঠেছে একটা জনপদ। হযরত সৈয়দ আদম বিননূরী (রঃ) এঁর খলিফা হযরত সৈয়দ ইলমুল্লাহ শাহ নকশবন্দী (রঃ) এর জনপদের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) হচ্ছেন তাঁরই পরবর্তী চতুর্থ পুরুষ।

ভোর তিনটের সময় নিশিপাখির ঘুম এলো না। ক্লান্ত শ্রান্ত তিনি। তবু অবসর নেই। ওখানে, অপেক্ষায় ছিল সৈয়দ খান্দানের মানুষেরা। তিনি কথা রাখলেন। অত্যন্ত উচ্চমার্গীয়, প্রাজ্ঞ বক্তব্য। মর্ম ছুঁয়ে গেল উপস্থিত মানুষের।

তিনি বললেন, 'সৈয়দরা দাওয়াতের কাজে না লাগলে যতটুকু দ্বীনের উন্নতি দরকার তা হবে না। আর সৈয়দরা জন্মসূত্রে যে দায়িত্ব দ্বীনের উন্নতির জন্যে পেয়েছে তা পালন না করলে তারা পার্থিব জীবনে শান্তি পাবে না।'

সেদিনই দুপুর।

তিনি (রঃ) রওনা হলেন কানপুরে।

দু'দিন পর দিল্লী।

তিনি ঘুরছেন। বিরামহীন। তিনি দেখছেন। জগতটাকে। তার মানুষকে। তাদের সাজাবেন দ্বীন দিয়ে। তাই তাঁর নেই খাওয়া, নেই দাওয়া, নেই আরাম।

ছুটে চলেছেন, পৃথিবীর পথে পথে।

এ চলার শেষ নেই।

আমৃত্যু।

মৃত্যুর দুয়ারে

নভেম্বর উনিশ শো তেতাল্লিশ।

হযরতজী (রঃ) অসুখে পড়লেন। আমাশয় হয়েছিল। আর ভালো হলো না। চিররোগা মানুষটি আর বিছানা থেকে উঠতে পারলেন না। কিন্তু তাতে কি, কথা বলা বন্ধ নেই। আবেগের শেষ নেই। একটার পর একটা কর্মসূচি তৈরিতে বিরাম নেই। নেই শারিরীক বিশ্রাম। শেষ শক্তিবিন্দু অপচয় হতে দিচ্ছেন না। এই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট।

তেরো জানুয়ারি।

উনিশ শো চুয়াল্লিশ সাল।

দিল্লী থেকে চিঠি পাঠালেন আবদুল হাইয়ার সাহেব।

www.eelm.weebly.com

তিনি লিখেছেন–

পরম করুণাময়ের দয়া, তিনি বেশ সুস্থ। কিন্তু তাঁর শারিরীক দুর্বলতা খুবই ভয়ের। ডাক্তার মানা করেছেন কথা বলতে। তিনি শুনছেন না। তিনি বলেছেন, 'চুপ করে বেঁচে থাকার চেয়ে কথা বলতে বলতে মরে যাওয়া অনেক ভালো। আসলে আমি অসুস্থ নই। আমার মন খারাপ। কারণ এতো বড় মহান দায়িত্বপূর্ণ কাজ যাদের তারা সাড়া দিচ্ছেন না। জ্ঞানী গুণী আলিমদের এ কাজে এগিয়ে আসা দরকার। এ কাজ চালিয়ে নেয়ার যোগ্যতা তাদের মাঝে রয়েছে। কাজ এগিয়ে নেয়ার জন্যে যদি ঋণও নিতে হয় নিক। ভয়ের কিছু নেই। আল্লাহ পরিশোধ করতে সাহায্য করবেন। আমি অসুখে পড়েছি। ভালোই হয়েছে। এ আল্লাহতায়ালার দেয়া উপহার। কারণ সেজন্যেই অনেকে দেখতে আসছে। কিন্তু কই যোগ্য আলিমরা তো আসছে না। ভয় পেও না, আমি যে অসুস্থ এতে কল্যাণ লুকিয়ে আছে। আমি তো বেশ বুঝতে পারছি।'

আবদুল হাইয়ার সাহেব লিখছেন–

---------- কথা বলার সময় তাঁর চেহারায় যেসব ভাব প্রকাশ পেত তা অবর্ণনীয়। কখনো তার ঠোঁট প্রচণ্ড আবেগে কাঁপতো। কখনো চোখ ভিজে যেত অশ্রুতে।

জানুয়ারির সতেরো।

উনিশ শো চুয়াল্লিশ।

লাখনৌ থেকে জামাত এলো নিজামুদ্দিন। এ জামাতে সাথী রয়েছেন দারুল উলুম নাদওয়াতুল ওলামার অধ্যক্ষ মাওলানা হাফিজ ইমরান খান সাহেব ও হাকিম কাশিম হুসাইন সাহেব।

খবর এলো দিনে দিনে তাঁর শরীর খারাপ হচ্ছে। অবস্থা খুবই ভয়ের। এ সময় তিনি পাগলপারা হয়ে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ সম্পর্কে বোঝাচ্ছিলেন। ওলামা-ই কেরমাদের। নিজামুদ্দিনে তখন ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কাশ্মিরী।

তিনি সর্বত্র চিঠি পাঠালেন। আলিমদের উদ্দেশে। তাতে মূলকথা ছিল, 'আপনারা এ কাজের জন্যে সবচেয়ে যোগ্য। যদি এ কাজ আপনারা হাতে নেন তাহলেই দাওয়াতের কাজ সত্যিকার উন্নত হবে। এগিয়ে যাবে। আমার ভূমিকা ঘোষণাকারীর মতো। "আগুণ লেগেছে, আসুন আগুন নেভান" এই। আর আগুণ নেভাবেন তো আপনারা।"

তিনি সব কর্মীদের বলতেন তারা যেন আলিম সমাজের কাছ থেকে দ্বীন শেখে। তাঁদের খিদমত করে। দিল্লী শহরে বিভিন্ন ছোট বড় সমাবেশ করলেন। সেখানে আলিমদের ডাকলেন সাধারণ ও ব্যবসায়ী সাথীদের দ্বীন শেখানোর জন্য। যেন সাহায্য করেন। তাদের উৎসাহ ও সমর্থন দিয়ে যেন তাবলিগের কাজকে শক্তিশালী করেন।

www.eelm.weebly.com

বেশ কিছু সমাবেশে বক্তব্য রাখলেন পরম শ্রদ্ধেয় মুফতি কিফায়েতুল্লাহ, মাওলানা আবদুল হান্নান, মাওলানা ইমরান খান ও আরো সব আলিমবৃন্দ।

তাঁদের এ ভূমিকায় খুব খুশি হলেন হজরতজী (রঃ)।

চারদিকে যে কাজ হচ্ছিলো তার বিবরণ শোনার জন্যে হজরতজী (রঃ) অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। তিনি অসুখ নিয়েই তা শুনতেন। গভীর আগ্রহ আর মনযোগ দিয়ে। রাত জাগায় তিনি আরো অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

এসময় একটা খুব সফল ইজতিমা হলো। তার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ। হজরতজী (রঃ) তাতে অংশ নিতে পারেননি। তবু সফল সমাবেশের সবকিছু তাতে পাওয়া গেল।

পারাপার

'ঘাটমেকা' ইজতিমায় আমি (সৈয়দ হাসান আলী নাদভী) কিছু কথা বলেছিলাম। তা হচ্ছে, 'যদি আলিমরা সর্বসাধারণের সাথে আর সাধারণ জনতা আলিমদের পাশে এসে না দাঁড়ায় তাহলে মুসলমানের এ দু'দলের মাঝে এক বিশাল বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবে। এমনও হতে পারে যে, একজন আরেকজনের কথা পর্যন্ত বুঝতে পারছে না। দরকার পড়ছে দোভাষীর!'

এ কথা মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফের মুখে শুনে খুশি হলেন হজরতজী (রঃ)।

তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন। আর এ শূন্যতা কী করে পূর্ণ হবে ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়তেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই বিভেদ, নদীর এপার ও ওপার রচনা করেছে। এর একমাত্র পারাপার এই দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ।

হজরতজী (রঃ) সাধারণ মানুষদের বলতেন, 'তোমরা আলিমদের কাছে যাও। শেখো, তাঁদের কাছে বসো। আদবের সাথে। তাঁদের সম্মান করো।'

আর আলিমদেরকে বলতেন, 'আপনারা অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় জর্জরিত সাধারণ জনতার কাছে যান। ওদের দ্বীন বোঝান। শেখান। ওদের স্নেহ, মমতার বাঁধনে জড়ান। ওরা কখন আপনার কাছে আসবে তার অপেক্ষা করবেন না। ওরা ধ্বংস হয়ে যাবার আগেই ওদের কাছে পৌঁছে যান। নইলে আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে।'

এভাবে জনতার দুটো অংশের দূরত্বের মাঝে তিনি হলেন সাঁকো।

খেলাফত আন্দোলনের পর এতো আলেম আর জনতার কাছাকাছি যায়নি। জনতাও আলিমদের কাছে চলে এলো। এর আগে রাজনৈতিক মতদ্বৈততার কারণে আলিমদের একটু বাঁকা চোখে দেখতে শুরু করেছিলেন সর্বসাধারণ ও ব্যবসায়ী মহল। এ দেয়ালটুকুও ভেঙে গেল। অভূতপূর্ব মিলন এলো।

www.eelm.weebly.com

সফল হলো হজরতজী (রঃ) এঁর উদ্দেশ্য।

এক ধাপ এগিয়ে গেল দাওয়াতের কাজ।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর ওফাতের আর সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুদের পরপারে যাবার পর থেকে ইসলাম ধর্ম নানান দল আর উপদলে ভাগ হয়ে যায়।

এই দল ও উপদলগুলো একজন অপরকে সন্দেহের চোখে দেখতো, অবিশ্বাস করতো। একেবারে ছোট খাটো বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক, ঝগড়া বিবাদ, সংঘাত, রক্তপাতের ঘটনা যুগ যুগ ধরেই চলে আসছিলো। সেই অবিশ্বাস, অবজ্ঞা এই চৌদ্দ'শো হিজরিতে এমন পর্যায়ে এসেছিলো যে এদের মাঝে পারস্পরিক ঐক্য ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব ছিলো। এমনই বৈরীভাব, এতই ঘৃণা আর হিংসার মাত্রা এমনভাবে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো যে একজন আরেকজনের ছায়াও মাড়াতে ইচ্ছে করতো না। বরং মনে করতো বিরোধী কারো সাথে হলে ঈমান নষ্ট হবে।

আমার বিরোধী যে, তারও কোনো গুণাবলী বা যোগ্যতা থাকতে পারে। তা থেকে আমি লাভবান হতে পারি এ বিশ্বাস একদম হারিয়ে গিয়েছিল। ভালো ধারণা করার যোগ্যতা হয়েছিল নিঃশেষ।

দলগুলো এ কথা ভাবতো মুনাজারা বা তর্ক বিতর্ক করে একে অন্যকে ছোট করবো। অন্যকে হেয় বা অপমান করতে পারলেই বুঝি বিজয় হলো। ঝগড়ার বুঝি মীমাংসা হলো। আসলে ব্যাপারটি তা ছিলো না। এ ধরনের তর্ক বিতর্ক, অপরকে ছোট বা হেয় করার ফলে হিংসার আগুন আরো প্রজ্জ্বলিত হয়। বাড়ে সংঘাত, জিঘাংসা। শুরু হয় রক্তপাত।

হজরতজী (রঃ) এ ব্যাপারে খুবই চিন্তান্বিত ছিলেন। ব্যথায় ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়তেন। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এ জটিল অবস্থা কাটানোর কী উপায় তার একটা পথও তিনি বের করেছিলেন। তা হচ্ছে ব্যবহারিক শুদ্ধতা, চারিত্রিক শুভ্রতা। এছাড়া দরকার অপরের মর্যাদা ও সম্মানকে সমুন্নত রেখে উপকার করা। আর নিখাদ মায়া, মমতা বা ভালবাসা। এর মাধ্যমে বিরোধী পক্ষের কাছে পৌছুতে হবে। মনের নিকটবর্তী হতে হবে। সে যেন আমাকে বন্ধু বা সুহৃদ ভাবে। এবার তার মাথায় পরিবেশ ও প্রতিবেশ থেকে তৈরি ও মস্তিষ্কের জটিল জটগুলোর গেরো খুলে দেয়া। আর আলোচনায় বসে মনের জড়তা, ক্ষুদ্রতাকে কাটিয়ে দেয়া।

দ্বিতীয় আরেকটি পথ তিনি বের করেছিলেন। তা হচ্ছে এই পরস্পর বিরোধী দলগুলোকে কাছে ডেকে আনা। কোনো একটা উপলক্ষকে সামনে রেখে। তখন দু'দলের মানুষ একজন অন্যকে দেখতে পেল কাছ থেকে। পাশ থেকে। নিজেদের ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হলো। তৈরি হলো আন্তরিকতা। চেনা জানার মাধ্যমে, পরস্পর সৌহার্দমূলক আলোচনা করে, একজন অন্যকে মর্যাদা ও সম্মানের চোখে দেখে সময়

www.eelm.weebly.com

কাটালে দ্বিধা, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কালো মেঘ কেটে যাবে। দূর হবে অনেকদিনের জমে থাকা সংশয়, ঘৃণা ও ভুল বোঝাবুঝি।

এছাড়া আরেকটা নিশ্চিত উপায় হচ্ছে দ্বীনি কোনো মৌলিক বিপ্লবের নামে একটি চত্বরে এক করা। এ ধরনের আত্মোৎসর্গমূলক কাজে মন দিলে সবার কাছে সবার ভেতরের পরিচয়, অবস্থা পরিষ্কার হয়ে যায়। মেলামেশা হবার কারণে দুর হয়ে যায় মতপার্থক্য ও মানসিক অমিল। অতিরিক্ত কু ধারণা, রাগ, ঘৃণার জায়গা আর থাকে না।

তিনি এখন খুবই অসুস্থ। এর এটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ অসুখ। তিনি প্রচণ্ড দুর্বল। কিন্তু তাঁর মানসিকতা দিনে দিনে সবল হতে সবলতর হচ্ছিল। আর সেই মনের শক্তি তাঁকে মানব জীবনের সবচেয়ে লজ্জাজনক দিকই দেখিয়ে দিয়েছিল। এ সূক্ষ্ম জটিলতা কাটানোর জন্যে তিনি বিশেষ ভূমিকা নিলেন। আর সাফল্য লাভ করলেন। তিনি তাঁর সাথীদের এ ব্যাপারে আলাদা ডেকে নির্দিষ্ট কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। মুসলমানের সবচেয়ে দৈন্য আপোষের ঝগড়া, লড়াই, হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি, ঘৃণা, মতভেদ, বিদ্বেষ, রক্তপাত কি করে এড়ানো যায় তার সমাধানের একটা সহজ, সরল পথ বের করলেন। নিজেও ভূমিকা নিলেন, সাথে তাঁর সাথীরা।

সমাধানটি ছিল প্রায় অসম্ভব। কিন্তু প্রচণ্ড রুহানী শক্তি ও আবেগ তাঁকে লক্ষে পৌছে দিয়েছিল। তিনি তা সম্ভব করলেন। কারণ পরম করুণাময়ের দয়ার দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়েছিল।

এই অসম্ভব সম্ভব হলো তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মানব মনের সূক্ষ্ম গতি প্রকৃতির ওপর সতর্ক মনযোগ, সমস্যাটি সমাধানের প্রচণ্ড ব্যাকুলতা, গভীর আন্তরিকতার সাথে মানুষকে ভালবাসা, তাদের কল্যাণ কামনা, মানুষের ইহ ও পারলৌকিক মুক্তির সুতীব্র পিপাসা, চিন্তার ক্ষেত্রে মানব মনের মর্মে পৌছানোর অবিশ্বাস্য ক্ষমতা, দয়ালু আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে সমাধানের উপায়টি জানার জন্যে অবর্ণনীয় সাধনা ও প্রার্থনা। আর এ ব্যাপারে ব্যাপক উদ্যোগ ও কর্মসূচি প্রণয়ন।

তিনি যা করেছিলেন তা এতো সূক্ষ্ম ও প্রয়োজনীয় ছিল যা কোনো প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও সুদক্ষ সঙ্গীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

তাঁর জীবন শেষের সে ভূমিকার প্রভাব আজ সচল ও ক্রমবর্ধমান। গোটা বিশ্বের মুসলমানকে তিনি এক তাঁবুর নিচে নিয়ে আসতে পেরেছেন। আজ সারা দুনিয়ার দিকে তাকালে দেখা যায় তাঁর সেই যাদুমন্ত্রের প্রভাব। গোটা আরব ও আজম, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যকে তিনি এক করেছেন। পাঁচ মহাদেশ আজ এক তাঁবুর নিচে।

নিজামুদ্দিন বাংলাওয়ালী মসজিদে অনেকে আসতেন। তাঁদের মাঝে এমন অনেক অতিথি ছিলেন যিনি হয়তো এ কাজকে পছন্দ করেন না, অথবা এ কাজের সভ্যতা ও সফলতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। অথচ এরা একবার এখানে এলে তাদের সব

www.eelm.weebly.com

সংশয় দূর হয়ে যেত। কেটে যেত অচেনার দেয়াল। দলীয় সংকীর্ণতার গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁরা পৌঁছে যেতেন মানবতার মুক্তির সীমানায়। স্বর্গোদ্যানে।

কারণ হযরতজী (রঃ) আর তাঁর কাছে শেখা সাথীদের আন্তরিকতা, প্রীতি, সেবা, ব্যবহারিক শুদ্ধতা ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব পড়তো অতিথিদের মনের ওপর।

হজরতজী খণ্ড বিখণ্ড, ছিন্ন ভিন্ন দলীয় সংঘাতে মুখ থুবড়ে পড়া মুসলিম ঐক্যের নাড়ির রোগ ধরতে পেরেছিলেন। আর সে রোগের ধন্বন্তরি ওষুধ কি তা তিনি জানতেন।

তারই প্রতিক্রিয়া ফের এক হচ্ছেন মুসলিম উম্মাহ।

শোনা যাচ্ছে। মহাকালের পদধ্বনি।

বিজয়।

সূর্য যাচ্ছে পাটে

মার্চ। উনিশ শো চুয়াল্লিশ।

হযরতজী (রঃ) আরো দুর্বল হয়ে পড়লেন।

নামাজ পড়াতে পারছেন না। দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে হাজির হচ্ছেন জামাতে।

তখন তিনি একবার বললেন, 'ছোট আমালের পেছনে ছুটছে সবাই। ভুলে গেছে আসল কাজ।'

একবার দুটো কবিতা পড়লেন। খুবই ভাবপূর্ণ আর সূক্ষ্ম। কবিতার মূল মানে হচ্ছে-

চলে গেছে অনেক
সোনালী সময়;
শেষ হয়ে এলো বুঝি বেলা
ফুরালো ফাগুন রাতের মেলা।
এবার হোক এই বিদায় প্রভু কল্যাণ
আর মঙ্গলময়।

তুমি এলে অবেলায়

সিন্ধুতে জামাত গিয়েছিল। ওখানে এই কাজকে খুব আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছিলেন হজরত হাফিজ মাওলানা হাশিম জান মুজাদ্দিদী (রঃ)। তিনি হযরতজী (রঃ) কে দেখেননি। কিন্তু খুব টান অনুভব করতেন। হযরতজী (রঃ) অসুস্থ শুনে তিনি

www.eelm.weebly.com

নিজামুদ্দিনে ছুটে এলেন। ইনি মুজাদ্দিদে জামান আলফিসানী (রঃ) এঁর বংশধর। হজরতজী (রঃ) তাঁকে রাজপুত্রের মতো সম্মান ও সেবা করলেন।

ক'টা দিন যেতে না যেতেই নিজামুদ্দিন বাংলাওয়ালি মসজিদ আলো করে এলেন মাওলানা ডাক্তার সৈয়দ আবদুল আলী। হযরতজী (রঃ) তাকে দেখে যেন সুস্থ হয়ে গেলেন। উচ্ছ্বসিতভাবে তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন শোয়া অবস্থায় আসলে হযরতজী (রঃ) ওসব মানুষ দাওয়াতের লাগলে খুব খুশি হতেন, যাঁদের বাপ দাদারা দ্বীন ইসলামের জন্যে দিয়েছেন বিশেষ ত্যাগ। কিংবা এমন কোনো ভূমিকা নিয়েছেন যাতে ইসলামের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে।

এছাড়া তিনি তাঁদেরকে খুব সমাদর করেছেন যাঁদেরকে আল্লাহতায়ালা ব্যতিক্রমধর্মী মেধা, প্রজ্ঞা বা প্রতিভা দিয়েছেন। তিনি চাইতেন এঁদের এসব যোগ্যতা ধর্মের প্রচার ও প্রসার করার কাজে লাগুক।

সৈয়দ আবদুল আলীকে পেয়ে তিনি বললেন, 'আপনাকে পেয়ে আমি অনেক খুশি। সেটা প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই।'

দু'জন আলিম এসেছেন। হযরতজী (রঃ) হঠাৎ যেন সুস্থ হয়ে উঠলেন। সজীব, প্রাণবন্ত। রোগের চিহ্ন কোথায় চাপা পড়ে গেল!

দু'জনকে তিনি খুব ব্যবহার করলেন। দাওয়াতের কাজে। ওঁদের দুজনের যারা পরিচিত ছিল আর অপরিচিতদের জন্যেও। এরা যাতে সঠিকভাবে কাজে লাগেন সেজন্যে সবাইকে অস্থির করে তুললেন। পরে একেবারে ঠাসা কর্মবহুল একটা কর্মসূচি তৈরি হলো।

সৈয়দ আবদুল আলীকে মসজিদে পুরনো মেওয়াতি সাথীদের সাথে থাকতে বললেন। কাজ শেখার জন্যে।

তারপর হঠাৎ যেন আরব্য রজনীর গল্পের মতো 'সিসেম ফাঁক' বলার সাথে সাথে খুলে গেল সৌভাগ্যের দুয়ার।

দলে দলে ওলামায়ে কেরাম এলেন। মুহতামিম, মুহাদ্দিস, মুদাররিস, মুফাসসির- সব। তারা কী করে আলিমদের মধ্যে কাজ করবে তার আলোচনা ও পরামর্শ করে বেশ কিছু উপায় বের করা হলো।

বিখ্যাত কিছু আলিমও চলে এলেন।

দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ক্বারী তৈয়ব (রঃ), মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ (রঃ), দিল্লীর আবদুর রব মাদ্রাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফি (রঃ), সাহারানপুর মাযাহিরুল উলুম মাদ্রাসার নাযিম মাওলানা হাফিজ আবদুল লতিফ (রঃ) দারুল উলুম দেওবন্দের ওস্তাদ মাওলানা ইজাজ আলী সাহেব ও শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা জাকারিয়া (রঃ)।

www.eelm.weebly.com

নিজামুদ্দিনের যেন আলোর ফোয়ারা বয়ে গেল।

আর একেবারে ঝলসে উঠলো যখন হযরত মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (রঃ) চলে এলেন।

তারপর ধীরে ধীরে ভেঙে গেল জলসাঘর।

নিভে গেল ঝাড়বাতি।

শেষ মেহমানও চলে গেলেন।

তখন হযরতজী (রঃ) গভীর আবেগে ডুকরে উঠে কবিতা পড়লেন–

জলসা ভাঙা ঘরে
মোর শূন্য আঁখি কাঁদেরে;
কাঁদে নিরব বেদনায়।
কোথায় হারিয়ে গেল
সোনালী সকাল গুলো
এক পলকের ইশারায়
দীপ জ্বলা সন্ধ্যায়
হৃদয়ের জানালায়
একাপুড়ি ধূপ
হায়!
বন্ধুরা সব কোথায়!

দূর হতে দূর দূরান্তরে

এপ্রিল।

উনিশ শো চুয়াল্লিশ।

সিন্ধুতে জামাত গেল। সাথী সত্তর জন। আমির হাফিজ মকবুল হাসান। জামাত প্রথম ক'দিন মেহনত করলো লাহোরে। পীর হাশিম জান ও কাবুলের বিখ্যাত বুজুর্গ নুরুল মাশায়েখ জামাত এসেছে শুনে ছুটে এলেন।

ক'দিন পর।

পেশোয়ার থেকে জামাত এলো।

এ জামাতকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখেছিলেন হযরতজী (রঃ)।

তা ছিল এমন–

পথের পাচের পরশ পাথর ১০ www.eelm.weebly.com

তোমরা আসতে চেয়েছ শুনে আমি খুব খুশি। তার আগে কর্মীরা ওখানে কিছুটা কাজ শিখুক। তারপর নিজামুদ্দিনে এলে ভালো হবে। সবকিছু বুঝতে ও শিখতে সহজ হবে।

অসুখে পড়েছি।

ভালো হবার জন্যে দোয়া করছি। এজন্যে যে যেন এক পলও অযথা খরচ না হয়। তা যদি হয় তাহলে সুস্থতার চেয়ে অসুস্থতাই ভালো।'

পেশোয়ারের জামাতে ছিলেন হযরত মাওলানা এহসানুল্লাহ নাদভী, আরশাদ সাহেব, আবদুল কুদ্দুস সাহেব আর দুটো ছোট ছেলে।

এঁরা চারদিন থাকলো।

ফিরে যাবার সময় হযরতজী (রঃ) বললেন 'এ কাজ এমন নয় যে এলাম আর ঘুরে ফিরে চলে গেলাম।

আসলে দাওয়াতের কাজের ভিত্তি আল্লাহর পথে রক্ত ঝরানোর।

কমপক্ষে কিছু কষ্ট করা আর ঘাম ঝরানো তো একান্ত দরকার।

তখন তো বুঝবে এ কাজটা কি?

কী তার রহস্য!

ভেদ!

শেষ হয়ে এলো বেলা

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) জীবন প্রদীপের উজ্জ্বলতা ক্রমেই কমে আসছে। তিনি একেবারে দুর্বল হয়ে পড়লেন। দিন গড়াচ্ছে আর তাঁর শারিরীক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠছে।

একসময় তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। এ অবস্থায় একটা চৌকি আনা হলো। সেটা কাতারের এক কোণে রাখা হলো। ওতে বসে তিনি জামাতে অংশ নিতেন।

এ সময় নিজামুদ্দিন একজন বুজুর্গ এসেছিলেন। হযরতজী (রঃ) তাঁর ওপর খুব খুশি ছিলেন। তিনি থাকাতে হযরতজী (রঃ) বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করতেন। প্রায় সময় নানান ধরনের সমাবেশ হতো। ওখানে তিনিই কথা বলতেন। তাঁর নাম মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব। তিনি হযরতজী (রঃ) এঁর চিকিৎসার দায়িত্বেও ছিলেন।

একুশে জুন।

উনিশ শো চুয়াল্লিশ।

এবার এলেন শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা জাকারিয়া (রঃ)।

তেইশে জুন।

www.eelm.weebly.com

উনিশ শো চুয়াল্লিশ।

নূহ এলাকার মাইনুল ইসলাম মাদ্রাসার একটা সমাবেশ ছিল। ফি বছর এই হতো প্রতি বছরের হযরতজী (রঃ) থাকতেন। এবার থাকতে পারলেন না।

সমাবেশ। সবাই এসেছে।

তিন নেই।

একই সে বাগান। এ বাগানের মালী তিনিই। কী সুন্দর সজীব, ফুলে ফলে ভরা বাগান। সবই আছে আজ। শুধু নেই বাগানের মালী।

এ সমাবেশে সামান্য দুর্ঘটনা ঘটেছিলো। কাছেই ছিলো একটা ইংরেজি বিদ্যালয়। সমাবেশ চলার সময় আচমকা আগুন ধরে যায় স্কুল ভবনটিতে। পুরো মজলিশ ছুটে গিয়ে নেভালো আগুন।

হযরতজী (রঃ) শুনলেন।

তিনি বললেন 'তোমরা ঠিকমতো আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ করোনি। সেজন্যে এমন হয়েছে।'

কেউ হয়তো খুশি ছিল। তার ভাবনা ছিল এই খাতে যে, ওটা ইংরেজি স্কুল, পুড়েছে ভালো হয়েছে।

শুনে হযরতজী (রঃ) খুব নারাজ হলেন।

'মুসলমানের সম্পদ নষ্ট হয়েছে এটা খুশির বিষয় নয়।' হযরতজী (রঃ) বললেন।

দিন যাচ্ছে।

হযরতজী (রঃ) আরো দুর্বল হয়ে পড়ছেন।

এমন সময় একদিন এলেন এক মহান অতিথি। তিনি হলেন হযরত মাওলানা সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বোখারী (রঃ)। হযরতজী (রঃ) এঁর তখন কথা বলার শক্তি ছিলো না। এতো বড় একজন জগদ্বিখ্যাত আলিম এলেন। তাই হযরতজী (রঃ) স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর বিবর্ণ চেহারায় খুশির ছোঁয়া। তিনি হযরত মাওলানা মানজুর আহমাদ নোমানী (রঃ) কে ডাকলেন। তাঁকে বললেন, 'তুমি আমাকে ওঁর সাথে কথা বলতে সাহায্য করবে। আমি যা বলবো তা তুমি শুনবে মুখের কাছে কান এনে। তারপর হুবহু সেটা ওঁকে শুনিয়ে দেবে।'

মাওলানা মানজুর আহমাদ নোমানী (রঃ) তাই করলেন।

সেভাবেই শুরু হলো কাজ।

কথা বলা।

কিন্তু আল্লাহতায়ালার অপার করুণা। খানিক পরেই হযরতজী (রঃ) এঁর কণ্ঠস্বর জোরালো হলো। হযরত মাওলানা সৈয়দ শাহ আতাউল্লাহ বোখারী (রঃ) তা শুনতে পেলেন।

www.eelm.weebly.com

আর আশ্চর্য!

ঝাড়া ত্রিশ মিনিট তিনি কথা বললেন। একটানা! এ কাজের মাহাত্ম ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলেন মৃত্যুর শয্যায় শুয়ে।

সে বছরেই।

এপ্রিলের শেষ দিকটায় অসুখ ভয়াবহ অবস্থা নিল। এই যায় সেই যায় অবস্থা। এমনকি একদিন জ্ঞানহারা অবস্থায় রইলেন। দু'ঘন্টা ধরে। বুঁজে রইলো চোখের পাতা। যখন চোখের পাতা খুললো তখন তিনি বিড়বিড় করছেন। এমন কণ্ঠস্বর অবশ্য এর আগে শোনা যায়নি। পুরোপুরি অন্যরকম সুরে। যেন অন্য কোনো ভুবন থেকে কথা বলছেন। অপার্থিব সুরে। কান্না ভেজা স্বরে তিনি বলছিলেন, 'সত্যের জয় আসবেই, বিজয় সমাগত, সত্য কখনো পরাজিত হয়নি--'

তারপর আবার তলিয়ে গেলেন। যেন ফের ভেসে উঠলেন। ঘোর লাগা স্বরে বললেন, 'মুমিনদেরকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব।'

মাওলানা মানজুর আহমাদ নোমানী (রঃ) ঠিক সে মুহূর্তটিতে মসজিদের বাইরের বারান্দায়। তিনি কোরান তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছিলেন। তাড়াহুড়া করে কামরার দরোজার সামনে দাঁড়ালেন। শুনলেন বিশিষ্ট খাদিমকে তাঁর কথা জিজ্ঞেস করছেন। তিনি দ্রুত ঢুকলেন। তাঁকে দেখে হযরতজী (রঃ) এঁর মুখে এক টুকরো হাসি ফুটলো। বড় করুণ আর বিষাদ মাখা চেহারা। কিন্তু কী এক অপার্থিব আলো জ্বলছে চোখের তারায়। মাওলানা মানজুর বসলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহর সাহায্য আসবে। অবিরাম। একের পর এক। তিনিই এ কাজকে পূর্ণতায় পৌছাবেন। আমাদের দরকার তাঁর সাহায্যের ওয়াদার ওপর ভরসা রাখা। বিরামহীন দোয়া চাওয়া। আর প্রাণান্ত চেষ্টা করা। খাটুনি দেয়া।'

বলতে বলতে ফের চোখ বুঁজে এলো তাঁর। স্তিমিত হয়ে এলো তাঁর কণ্ঠস্বর। যেন মহাসমুদ্রের কোথাও তলিয়ে যাচ্ছেন। খানিকপর। একটা গভীর শ্বাস ফেলে ঠোঁট খুললেন।

বললেন, 'আহা! জ্ঞানী লোকেরা যদি এই মহান দায়িত্ব কাঁধে নিতেন! তখন আমরা পরপারের ডাকে সাড়া দিতাম।'

ঝাড়া চারমাস এমন একটা অবস্থায় সময় বয়ে গেল।

যখন তখন অবস্থার মাঝে তিনি ভাবছেন কী করে দ্বীন জিন্দা হবে। নয়তো ব্যাকুল পাগলপারা অবস্থায় মর্ম ছেঁড়া দোয়া করছেন। শুনে আশপাশের সবার চোখে পানি এসে যাচ্ছে।

এ সময় নানান দিক থেকে ডাক্তার, কবিরাজ ও বৈদ্য এসেছিল তাঁকে দেখতে। তিনি তাঁদের কথা না শুনে আগে নিজের কথা শোনাতেন। তাঁরা দ্বীনি কাজে কতটুকু

www.eelm.weebly.com

সময় দেবেন, কবে থেকে তা জেনে বলতেন, 'মানুষ মরবে। আজ নয় কাল। সেটা মাথা ব্যথা নয়। দরকার হচ্ছে যেখানে যাবে তার তৈরি নেয়া।'

এবার ডাক্তার সুযোগ পেতো তাঁর দেখাশোনা করার।

একবার।

স্বনামধন্য আলিম হযরত মুফতি কেফায়তুল্লাহ (রঃ) এলেন একজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়ে। তাঁর পরিচয় পেতেই তিনি রোগীর দিক থেকে ডাক্তারের মনযোগ সরিয়ে দিলেন। আর আশ্চর্য কৌশলে তাকে দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন। বললেন, 'আচ্ছা ডাক্তার সাহেব, আপনি তো জানেন এই চিকিৎসা বিদ্যা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যুগে কতো উন্নত হয়েছিল। উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌছেছিল। এমনকি মৃত মানুষকে জীবিত করার পথও বের হয়েছিল। ঈসা আলাইহিস সালাম কুষ্ঠ ও অন্ধরোগ সারিয়ে তুলতেন। ডাক্তার, আপনি জানেন নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসালাম ঈসা আলাইহিস সালামের চেয়েও বড় নবী ছিলেন। শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এবার ভাবুন, ঈসা আলাইহিস সালাম যদি এতো বড় অলৌকিক ক্ষমতা পান তাহলে শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কতো বেশি আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। এখন আমরা যদি আমাদের নবীজি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও সম্যক উপলব্ধি না পাই তাহলে বড়ই ক্ষতির কথা।

তাঁর তরিকা বা আদর্শ, তাঁর নীতিমালা আর তাঁর কাজকে কাজ মনে না করলে আমরা বড়ই দুর্ভাগা হবো। সেটা হবে ঘরের সামনে স্রোতস্বিনী অথচ পিপাসায় মারার ডাক্তার, আমাদের উচিত যে অযাচিত দান আমরা পেয়েছি তার মর্যাদা রক্ষা করা।'

এভাবে দিনভর রাতভর তাঁর কথা চলতো। কখনো নিচু কখনো উঁচু স্বরে। কখনো আবেগে বিভোর, কখনো ব্যথায় বিধুর।

সত্যিই তা ছিল দেখার, শেখার, শোনার ও বোঝার।

মানুষ যখন জাগ্রত হয়।

মানুষ যখন বুঝে নেয়।

মানুষ যখন দিশা পায় মুক্তির।

আর মানুষ যখন মানবের মুক্তির উপায় পায় তখনি বুঝি এমন সুমহান দৃশ্য রচনা হয়।

তিনি এগুচ্ছেন। মৃত্যুর দিকে।

তিলে তিলে।

তিনি এগুচ্ছেন মুক্তির সবকটা জানালা আর দরোজা খুলে দেবার পথে।

তিনি এগুচ্ছেন। সফলতার পথে। দুর্বার গতিতে।

প্রতি পলকে।

হযরতজী (রঃ) অসুস্থ।

www.eelm.weebly.com

লোকজন আসছে। জিজ্ঞেস করছে, 'কেমন আছেন?' শুনে তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন।

আসলে তিনি শুনতে চাইতেন দ্বীন ইসলাম দুনিয়াতে জিন্দা করার জন্যে কি কি কাজ করছে সাথীরা। কেমন উদ্যোগ নিয়েছেন। কি ধরনের কষ্ট, মেহনত ও কুরবানী দেয়া হচ্ছে। আর লোকজন কেমন সাড়া দিচ্ছে।

এ ধরনের কথা ছাড়া ব্যক্তিগত কোনো কথা তাঁর কাছে অসহ্য।

মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলতেন,'তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেমন আছি। কারণ আমি অসুস্থ। অসুখ বিসুখ তো আছেই। যতদিন মানুষ বাঁচবে এসব থাকবে। আসলে মানুষ ভালো থাকবে কখন? যখন সে দ্বীন দুনিয়াতে জীবিত করার কাজে লেগে থাকবে। কারণ তখন তার জন্যে দোয়া করছে স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'

একবার তাঁর কজন আত্মীয় স্বজন এলো।

তিনি বললেন, 'মাটির সাথে মিশে যাবার জন্যেই মানুষের সৃষ্টি। তেমনি একজন মানুষের খবর নিতে ছুটে এসেছো কতো দূর থেকে। কিন্তু যে দ্বীনের জন্য রক্ত দিতে হয়েছে তাতো দুনিয়া থেকে মিটে যাচ্ছে। তার কোনো খোঁজ নিয়েছো?'

হযরতজী (রঃ) অসুস্থ।

নামাজের ইমামতি করছেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (রঃ)।

একদিন। শুক্রবার।

মাওলানা ইউসুফ (রঃ) ফজরের নামাজের ইমামতি করলেন। তিনি 'কুনুতি নাজিলা' পড়লেন। শেষ হলো নামাজ। একজন সেবক এসে ইউসুফকে জানালেন, 'আপনার পিতা ডাকছেন।'

তিনি ছুটে এলেন। পাশে বসলেন

অসুস্থ হযরতজী (রঃ) বললেন, 'যখন কুনুতি নাজিলা পড়বে তখন বিভিন্ন মসুলমানদের বিরুদ্ধে ছোঁড়া শয়তানী শক্তিসহ বিধর্মী সাধু ও সন্তদের সাধনালব্ধ অপার্থিব ক্ষমতার দিকেও ধ্যান দেবে।

সাহারানপুরে একবার একটা ঘটনা হলো।

বিতর্কসভা বসেছিলো। মুসলমানের পক্ষে কথা বলছিলেন জনৈক আলিম। বড় তর্কবিদ। আচমকা সবাই দেখলো তিনি কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছেন। কথা গুছিয়ে বলতে পারছেন না। কেমন যেন আড়ষ্ট ভাব। ব্যাপার কি? এতো বড় তার্কিক। তিনি হঠাৎ এমন হলেন কেন?

কথাটা কানে তুললো একজন হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরি (রঃ) এঁর কাছে। তিনি চোখ বন্ধ করলেন। দেখতে পেলেন একজন যোগী তার অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করছে ওই তর্কবিদের বিরুদ্ধে।

www.eelm.weebly.com

এবার পুরোপুরি তৈরি নিয়ে মাঠে নামলেন সাহারানপুরি (রঃ)। তিনি মনযোগ দিলেন। সন্ন্যাসী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। তারপর সুযোগ বুঝে সটকে পড়লো।

ফের সচল, সজীব আর প্রাণবন্ত হলেন তার্কিক।

অদ্ভুত সব যুক্তি ও প্রমাণ বেরিয়ে আসতে লাগলো তার মুখ থেকে।

বিরুদ্ধ শক্তি স্তব্ধ।

পরাজিত।

এই দিকেই হযরতজী (রঃ) ইশারা করেছিলেন ইউসুফজিকে। কারণ মুসলমানকে বিপথে চালানো, পথভ্রষ্ট করার কাজে বস্তুবাদী পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তিকেই শুধু ওরা ব্যবহার করেনি, সাথে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার ব্যাপক ব্যবহার করছে।

হযরতজী (রঃ) অসুস্থ।

তাই নিজামুদ্দিন মারকাজ মসজিদের মিম্বরে আজ অন্য কেউ।

এক ধূ ধূ হাহাকারে ভরে থাকে সাথীদের মন। বড় শূন্য শূন্য মনে হয়। অন্তবিহীন বিরহে কাটে মিওয়াতিদের মন। তাঁরা যাকে পাবার জন্যে পাগল। তাঁকে দেখতে না পেয়ে তাঁরা কথা শুনতে না পেয়ে তাদের পোড়া মন পাগল হয়েছে।

চারদিকে আজ হাহাকার।

নিজামুদ্দিনে জামাত আসার পরিমাণ বেড়ে গেছে। লোকজনে ঠাসা। কিন্তু কী যেন নেই। এক নিরব শূন্যতা খাঁ খাঁ করছে। কীসের যেন বিপদের ঘন্টা ধ্বনি শোনা যায়।

বৃহস্পতিবার।

আজ শহরবাসীর সমাবেশ। নিজামুদ্দিন। শবে জুমা। লোকে লোকারণ্য। আজকাল বেশি লোক হচ্ছে। দিল্লী ছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে লোকজন আসছে।

হযরতজী (রঃ) অস্থির হয়ে পড়তেন।

এতো যে লোক, তাদের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে তো? তিনি অধীর। এজন্যে যে, এরা আল্লাহর নামে সাড়া দিয়েছে। শুধু আল্লাহকে খুশি করতেই ছুটে এসেছে ওরা। এখন যদি তাদের এই ভালবাসা, উদ্যম আর সময়কে দ্বীন শেখা আর শেখানোর কাজে না লাগানো হয় তাহলে সেটা হবে ভয়ংকর ক্ষতির কারণ। মস্ত বড় খেয়ানত বা অপচয়।

আসা অতিথিদের কারো যেন এক পলকও নষ্ট না হয় সেজন্যে অমন নাজুক অবস্থায়ও তিনি সতর্ক থাকতেন।

আজ মাগরিবের নামাজ পড়ে কথা হবে। নিজামুদ্দিন বাংলাওয়ালী মসজিদের ছাদে। মিম্বর খালি। সেখানে হযরতজী (রঃ) নেই। সবার চোখে অশ্রুর।

মন খারাপ। সবার।

সেজন্যে বয়ান শুরু হতে দেরি হচ্ছে। মাত্র কয়েক মিনিট। হযরতজী (রঃ) হয়রান, পেরেশান হলেন। বারবার খবর পাঠাতে লাগলেন, দেরি কীসের? দেরি কেন?

www.eelm.weebly.com

এবার বয়ানের খুতবা শুরু হলো।

স্থির হলেন হযরতজী (রঃ)।

দ্বীনি কাজে সামান্য অবহেলা তাঁর কাছে অসহ্য।

এমন চরম মুহূর্তেও।

মৃত্যু শয্যায়!

গোধূলি বেলার পান্থ পাখি

হযরত (রঃ) এঁর এক অন্ধ ভক্ত ও অনুরক্ত হচ্ছেন চৌধুরী নাওয়াজ খান। তিনি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। সুখে দুঃখে হযরতজী (রঃ) এঁর পাশে আছেন। ছায়াসঙ্গী।

এছাড়া রয়েছে সুখ ও দুঃখ দিনের বন্ধুরা। মেওয়াতি।

মসজিদের এক কোণে একটা দড়ির ছোট খাট পাতা। তাতেই থাকেন হযরতজী (রঃ)। জীবন উৎসর্গকারী একদল পতঙ্গ সব সময় তাঁকে ঘিরে থাকতো। যেন হিদায়াতের এক ঝলমলে প্রদীপের চারপাশে পিয়াসী পতঙ্গ।

তাঁরা শুনতো হযরতজী (রঃ) এঁর ব্যথাভরা কণ্ঠের দোয়া, অস্থির, অধীরে, আকুল আর ব্যাকুল এক মহামানবের আর্তি। মানুষের মুক্তির তীব্র ভীষণ আকাঙ্খায় যা ছিল ঋদ্ধ। নিরব এক চিৎকার। রুদ্ধ কান্না। দেখতো এক অবিস্মরণীয় অশ্রুসজল মানুষকে।

পতঙ্গদলের মধ্যমণি চৌধুরী নাওয়াজ খান কী এক কাজে দিন কয়েকের জন্যে যেতে চান।

হযরতজী (রঃ) বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, 'আর গিয়ে কী হবে, ভাই। থেকে যাও। দিন কুড়ির ব্যাপার। এর মাঝেই কিছু একটা হয়ে যাবে।'

মৃত্যু অবধারিত।

ও আসবেই। প্রতিটি প্রাণের কাছে। তার দিনক্ষণ আগে থেকেই হযরতজী (রঃ) জানেন। কাজের উন্নতি, উদ্যম ও উৎসাহকে বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে তা মাঝে সাঝে প্রকাশও করে দিয়েছেন।

অসুস্থতার এ অবস্থায় একবার নিজামুদ্দিনে এলেন মাওলানা জাফর আহমাদ। কিছুদিন থেকে কোনো প্রয়োজনীয় কাজে চলে যেতে চাইলেন।

হযরতজী (রঃ) তাঁকে বললেন, 'যেতে চাইছো যাবে। যাবার আগে কিছু সময় দিয়ে যাও।'

তিনি খুবই বিনয়ের সাথে বললেন, 'হযরত, খুব শীঘ্রিই ফিরে আসছি। ইনশাআল্লাহ আসছে মাহে রামজানে সময় দেব।'

www.eelm.weebly.com

করুণ হাসি ফুটলো হযরতজী (রঃ) এঁর চেহারায়। বললেন, 'তুমি বলছো রামজান। আমি তো শাবান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো কিনা সেই ভয় করছি।'

তারপর মাওলানা ইউসুফ (রঃ) কে ডাকলেন।

নূহের সমাবেশের খবর জেনে বললেন, 'আচ্ছা, যখন জামায়াতগুলো বের হলো তখন মাওলানা সাহেবকে কি দেখিয়েছো?'

মাওলানা ইউসুফ (রঃ) বললেন, 'না, সেদিকে তো খেয়াল করিনি।'

'ভুল করেছো।' হযরতজী (রঃ) বললেন, 'ওটাই দেখার জিনিস ছিল। তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই স্বর্ণযুগে কেমন করে আল্লাহর রাস্তায় পবিত্র মানুষেরা বের হতো।'

আমাকে (হযরত সাইয়্যিদ হাসান আলী নাদভী) বললেন, 'মনে হচ্ছে এ অসুখ আর সারবে না।

মাওলানা জাফর আহমাদ (রঃ) সেদিনের কথার পর নিজামুদ্দিনে রয়ে গেলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন বায়োকেমিক চিকিৎসার জন্যে। আগে ছিলেন হাকিম করিম বখশ। দিল্লীর সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার আবদুল লতিফ। তিনি এলেন। তাঁর সাথে দেখাশোনা করছিলেন ডাক্তার শওকাতুল্লাহ আনসারী সাহেব। ইনি ভাবছিলেন হযরতজী (রঃ) এঁর আন্ত্রিক জ্বর হয়েছে। তিনি সুস্থতার ব্যাপারে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।

ডাক্তার আবদুল লতিফ ভাবলেন পুরনো আমাশয়। তিনি ইঞ্জেকশান দেয়ার চিন্তা করলেন। অনেক দোয়া হলো। ইঞ্জেকশানও দেয়া হলো।

কিন্তু কিছুই উন্নতি হলো না।

হতাশার ছায়া নামলো সবার চোখে মুখে।

তাহলে কি শেষ যাত্রা?

সময় শেষ?

জীবন সায়াহ্নে ক'জন মানুষ হযরতজী (রঃ) এঁর পাশে ছায়ার মতো ছিলেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়াসিফ আলী ছিলেন ওজু ও নামাজ পড়ানোর কাজে।

ওষুধ খাওয়ানোর দায়িত্বে ছিলেন মাওলানা ইকরামুল হাসান কান্ধলভী। ইনি হযরতজী (রঃ) এঁর বোনের ছেলে। যাবতীয় পথ্য ঠিক সময়ে খাওয়ানোর কর্তব্য কাজটি করতেন নম্বরদার মিয়াজি মিহরাব, চৌধুরি নাওয়াজ খান, উমিদ খান, রাহিম খান, রাহিম বখশ ও জনাব সোলায়মান। এঁরা সব নিবেদিত প্রাণ অনুরাগী ছিলেন হযরতজী (রঃ) এর। কিষেনগঞ্জের ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ ইউসুফভাই মন প্রাণ দিয়ে খিদমত করতেন। দীর্ঘ রাতের পুরোটা প্রায় জেগে মাথায় তেল মালিশ করে দিতেন।

এইসব বুজুর্গদের সাথে আরো কিছু মানুষ ছিলেন। তারা হচ্ছেন দিল্লীর ব্যবসায়ী। এ চরম মুহূর্তে তাঁদের মন খুব খারাপ ছিল। তাঁর শেষ ছোঁয়াটুকু পাবার জন্যে এরা

www.eelm.weebly.com

ছিল অধীর। তাই বেলা শেষের ক'টা দিন প্রাণপণে নিজামুদ্দিন আঁকড়ে রইলো এরা। পালাক্রমে এক একটা ব্যবসায়ীদল হযরতজী (রঃ) এঁর পাশে সেবা শুশ্রূষায় লেগে থাকতেন।

একদিন।

একজন লোক হযরতজী (রঃ) এঁর মাথার কাছে বসে তেল মালিশ করছিলেন। হযরতজী (রঃ) ধীরে ধীরে চোখের পাতা খুললেন। লোকটিকে দেখলেন। পলকহীন চোখে। খানিকক্ষণ। চিনতে না পেরে ভ্রূ কুঁচকে গেল। তারপর ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ভাই, তোমাকে তো এর আগে দেখিনি। তুমি কি কিছু সময় আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছো?'

তিনি না বাচক মাথা নাড়ালেন।

তখন হযরতজী (রঃ) বললেন, 'তাহলে তো তোমার খেদমত আমি নিতে পারিনা। আগে কিছু সময় দাও। তারপর এসো।

আসলে হযরতজী (রঃ) তাঁর নিজের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে কেউ আসুক এটা চাইতেন না। এসবের উপরে আল্লাহকে রাজি ও খুশি করার জন্যে সব কাজ হোক। শুধু তাঁকে দেখার জন্যে, তাঁর সেবার জন্যে একদল মানুষ নিজামুদ্দিন আসছে। দূর দূরান্ত থেকে। এটা ছিল তাঁর যথেষ্ট মর্মবেদনার কারণ। এসব ব্যক্তিগত সম্পর্কের বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করতেন না।

একবার।

তিনি ডাকলেন হযরত মাওলানা মানজুর নোমানী (রঃ) কে। পরিচয় করে দিলেন একজন বয়স্ক লোকের সাথে। বললেন, 'এই মানুষটা আমার খুব প্রিয়জন। উনিও আমাকে খুব ভালবাসেন। সেই ভালবাসার খাতিরে ছুটে এসেছেন নিজামুদ্দিন। খুব সেবা যত্ন করছেন। কিন্তু হায়! এখনো দাওয়াতের কাছে শরীক হননি। আল্লাহর রাস্তায় বের হননি। মাওলানা, একে বোঝাও কোন্‌টা বড়? আল্লাহর ও রাসুল না ব্যক্তিগত সম্পর্ক।'

মাওলানা মানজুর নোমানী (রঃ) বোঝালেন। বৃদ্ধ বুজুর্গ বললেন, 'এবার আমি তৈরি হয়েই এসেছি। সময় দেব।'

শুনে হযরতজী (রঃ) এঁর চেহারায় পরম প্রশান্তির ছায়া নেমে এলো। ঝলমলে হলেন তিনি।

তাঁর হাত ধরে চুমু খেলেন।

কাছে ডেকে।

শেষ যাত্রার তোড় জোড় চলছে।

ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ছে জীবন। কিন্তু বেড়ে চলেছে অস্থিরতা, জ্বালা বাড়ছে, হৃদয়ের পোড়া ঘা এর ক্ষত হচ্ছে বড়।

www.eelm.weebly.com

এখন আর দ্বীনি দাওয়াত, তার বিস্তার, ব্যাপকভাবে সমাজের সব জায়গায় তার সওগাত পৌঁছে দেয়া-এ ছাড়া অন্য কোনো বিষয় বা সমস্যার কথা শুনতেও তিনি নারাজ ছিলেন। শুয়ে ছিলেন মৃত্যুশয্যায়। জীবন প্রদীপ নিভু নিভু। কিন্তু চেতনা ছিল প্রখর সজাগ। সতর্ক। কর্মচঞ্চল। বুদ্ধিদীপ্ত। দ্বীনি দাওয়াতের যাবতীয় কর্মসূচি ওই মুমূর্ষ অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। দিনভর রাতভর একে ওকে ডাকছেন। বারবার। খবর নিচ্ছেন।

জানতে চাইছেন ওদিকের ইজতিমার খবর কি? ওই মজলিশে কতো জন যাবার জন্যে নাম দিলেন? অমুখ অমুখ আলিম কি দাওয়াতের মেহনতের জন্যে তৈরি হয়েছে? ওখানে কি জামাত পাঠানো হয়েছে?

উত্তর শুনে দিক নির্দেশনা দিতেন। খুঁটিনাটি ভুলচুক শুধরে দিতেন। কোথায় কম হলো, কোথায় হলো না, কোথায় কিভাবে মেহনত করা দরকার সবকিছু বলে দিতেন।

এমন চরম মুহূর্তেও তিনি অক্লান্ত।

ওই অবস্থায়ও তিনি লক্ষ রাখছেন সর্বত্র দাওয়াতের চিন্তা আর দ্বীনি উন্নতির কথা ছাড়া অহেতুক কোনো আলোচনা হচ্ছে নাতো? হাদিস শিক্ষার মজলিশে, তালিমের হালকায়, খাবার দস্তরখানে একটু এদিক ওদিক বাহুল্য কথা বা আচরণ হলে তাঁর চেহারায় কষ্টের ছাপ পড়তো। আর তিনি কী করে যেন তা আঁচ করে নিতেন। তারপরেই কাজে নেমে পড়তেন। একে ডাকতেন, ওকে বোঝাতেন। কখনো নরমে, কখনো গরমে। কখনো একটু শক্ত কথা বলে, কখনো কোমল ও সুন্দর শব্দে সংশোধন করতেন। উৎসাহ দিতেন। কখনো ইশারায় হুঁশিয়ার করতেন।

হাল ছেড়ে দেয়ার মানুষ তিনি ছিলেন না।

মৃত্যু শয্যায়ও তিনি সজাগ।

একদিন।

ওলামায়ে কেরামের একটা আলোচনা অনুষ্ঠান ছিল। হাদিসের দরস। সেখানে আমার (হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ হাসান আলী নাদভী) যাবার কথা। কিন্তু যেতে দেরি হয়ে গেল। অলসতা।

তিনি সংবাদ দিলেন।

একজন এসে আমাকে তাঁর বলা খুব তীক্ষ্ণ সতর্ককথা শোনালো।

একদিন।

আমাকে ডাকলেন।

বললেন, 'অমুক আলিম নানান কাজের কথা বলে নিজামুদ্দিনে থাকেন না। আপনি তাকে বলুন "এ অনুপস্থিতি বড়ই আশ্চর্যের। এতো বড় কাজ পেয়ে হেলায় হীরা পায়ে ঠেলে দেয়ার শামিল"।'

www.eelm.weebly.com

তিনি লোকজনকে আকৃষ্ট করার জন্যে কৌশল হিসেবে আমালের ফজিলত বর্ণনা করতেন। তাতে যাকে বলা হচ্ছে তিনি নিজে থেকেই দ্বীনি দাওয়াতের কাজে উৎসাহিত ও আগ্রহী হয়ে উঠতেন।

হযরতজী (রঃ) মৃত্যু শয্যায়।

কিন্তু রোজ যেখানে যা কাজ হচ্ছে তা শোনার জন্যে ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতেন। মীর দরদ রোডে সমাবেশ হলো। তাশকীল, জামাত পাঠানো এসব কাজে বেশ রাত হয়ে গেল। গাড়ি পাওয়া গেল না নিজামুদ্দিনে ফেরার।

সকালে এসে শুনি গভীর রাত পর্যন্ত জেগেছিলেন তিনি। বেশ ক'বার আমাদের খোঁজ নিয়েছেন। সাংঘাতিক অস্থির ছিলেন।

আমরা তাড়াতাড়ি হাজির হলাম।

আগাগোড়া সব শুনলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

এবার তাঁর চেহারায় নেমে এলো গভীর প্রশান্তি।

একবার।

ক'জন আলিম হাদিসের দরসে বসেছিলেন। কথা চলতে চলতে মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো ইতিহাস। ব্যস, আর যায় কোথায়? গোটা দরসে বিষয়বস্তু চলে এলো ইসলামের ইতিহাস। খানিক পরে আরো একটু নিচে নেমে এলো মজলিশ। শুরু হলো মুসলমান রাজা বাদশাদের সমালোচনা। সাবই হামলে পড়ে একে একে নিজের মত দিতে লাগলো। নষ্ট হয়ে গেল দরসের হালকার নিজস্ব গাম্ভীর্য আর সৌন্দর্য। বিশৃঙ্খলা মজলিশ।

বিদ্যুৎবেগে মজলিশের খবর পৌঁছে গেল হযরতজী (রঃ) এঁর কাছে। ভয়ানক রাগ হয়েছেন তিনি। প্রায় দৌড়ে এলেন মাওলানা মাইনুল্লাহ মাখাফী। খবর দিলেন হুকুম হয়েছে প্রসঙ্গ বদলাতে।

আলোচনা, বক্তব্যে যেন বাড়াবাড়ি না হয়। কম কথা। তাতে লুকিয়ে থাকবে অনেক গভীর তত্ত্ব বা বাণী। ভাষা হবে সহজ সরল। যাতে সবাই বক্তব্যের গভীরে ঢুকতে পারে। কোনো দল, জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠীর সমালোচনা করা যাবে না। ইশারা বা ঠারে ঠুরেও নয়।

এ ব্যাপারে তিনি সদা সজাগ।

ভয়ানক অসুস্থ থেকেও।

তিনি বুঝতে পারছেন যে কোনো পলকে হামলা আসবে। মরণ কামড় দেবেই দুশমন। কাজেই যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

আলোচকদের ভুলচুক তিনি শুনতে পেয়ে যেন মানসিক কষ্ট না পান সেদিকে সেবকরা খেয়াল রাখতেন।

শুক্রবার।

www.eelm.weebly.com

জামাত এলো মুরাদাবাদের। রয়েছে বেশ ক'জন বিশিষ্ট আলিম। বিশাল সমাবেশ। কথা বলার জন্যে এ নাচিজের নাম এলো। আমি সাধারণ বক্তব্যের মতো কিছু ডালপালা ছড়িয়ে দিলাম। খানিক পরেই খবর এলো। হযরতজী (রঃ) এঁর ধমক!

তিনি বলছেন, 'কথা কম। আসল উদ্দেশ্যে ফিরে এসো।'

আমি দ্রুত মূল প্রসঙ্গে চলে এলাম।

সেদিনই।

বিকেল হলো।

আসরের নামাজের পর অনেক লোকের মজলিশ বসলো। হযরতজী (রঃ) এঁর কাছে শুনে তবে কথা হবে। কিন্তু তিনি আজ খুব বেশি জ্বরে পড়েছেন। সংজ্ঞাহীন। মসলিশ ওদিকে অপেক্ষায়।

আজ সকালে বকা খেয়ে আমি ভয়ে অস্থির।

এক পর্যায়ে শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা জাকারিয়া (রঃ) আমাকে কিছু কথা রাখার জন্যে বললেন।

আমি বললাম, 'কি বিষয়ে বলবো? তেমন কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।'

এক সময় জ্ঞান ফিরে এলো।

তিনি (রঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'আসরের পর উপস্থিত মজলিশে কথা হয়েছে কিনা।'

'আপনি তো কোনো বাণী দেননি।' আমরা বললাম।

'জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'হযরত, আপনি তো জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ।'

'সেটা দেখলে!? দ্বীন দেখলে না?

তিনি হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বার বার দুঃখ করলেন।

সময়ের এমন অপচয় হলো?

হযরতজী (রঃ) চলে যাচ্ছেন।

নিজামুদ্দিনের পরিবেশও দিনে দিনে উন্নত হতে শুরু করলো। কখনো দু'তিনশো লোক হয়ে যেত। রাতের খাবারের ব্যবস্থা হতো। এখানেই থেকে যেতেন সবাই।

বাংলাওয়ালি মসজিদের ভেতরে আর থাকার কামরাগুলো লোকে লোকারণ্য। চারদিকে প্রাণের সাড়া। আধ্যাত্মিকতার বাণ ডেকেছে যেন। মানুষের এতো ভিড় যে জামাতের কাতারে জায়গা পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। শোয়ারও খুব কষ্ট হতো। প্রচুর কর্মচঞ্চল সাথী নাওয়া খাওয়া ভুলে একটার পর একটা দ্বীনি কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

এমন ধর্মীয় বিপ্লব আর বৈভব দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত।

www.eelm.weebly.com

ধর্মের এমন সুবাতাস দেখতে দেখতে ভাবতাম, এই যে অবিস্মরণীয় পরিবেশ সে তো ওই একটা মানুষের জীবনের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোরবাণীর কারণেই পেয়েছি। এই যে দ্বীনি বাসন্তী হাওয়া বইছে চারদিকে সে তো ওই হাড়জিরজিরে মানুষটিরই অবদান। মানুষের কল্যাণ কামনায় নিবেদিত করেছিলেন যিনি নিজেকে। কতো না খাওয়ার দিন, কতো না ঘুমোনোর দিন। সেসব দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী পেরিয়ে আজ তিনি আলো ঝলমল সাফল্যের দুয়ারে। আজ তার দস্তরখানে কতো মানুষ পাচ্ছে খাওয়া।

আর কতদিন?
আর কতদূর যেতে হবে তাঁকে?
কতদিন উনি থাকবেন আমাদের মাঝে?
ভাবি। আর কবির ভাষায় গেয়ে উঠি-

ও আলোর ঝর ঝর ঝর্ণা
আরো ঝরুক প্রাণের বর্ণা :
তোমার সবুজ ছোঁয়ায় জেগেছে আজ
বিবর্ণ মৃত চেতনা।

ধুয়ে যাক মুছে যাক
যত পঙ্কিল পাঁক
এই অবিচার আর অন্যায়
পাপের বন্যা।

জ্বালাও মঙ্গল প্রদীপ,
বাজুক সত্যের নুপুন।
আদিগন্ত আঁধার কেটে,
উঠুক জেগে জ্যোতির ঝুমুর।

কেটে যাক ভেঙে যাক,
নিরবতা এবার বাজুক সুমধুর
সুরের সুর্ছনা

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া (রঃ) এঁর বিশেষ পড়ানোর কাজ ছিল সাহারানপুরে। তিনি চট জলদিই ফিরে এলেন। সাথে নিয়ে হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী (রঃ) কে।

www.eelm.weebly.com

নিজামুদ্দিন আলোয় আলোয় ভরে গেল।
কারণ হযরত মাওলানা (রঃ) এঁর সাথে এসেছেন তাঁর অসংখ্য ভক্ত ও মুরিদান।

যেতে আমি দিব না তোমায়

যমে মানুষে টানাটানি চলছে।

মৃত্যুশয্যায়। হযরতজী (রঃ)। রোজ শহর থেকে, গাঁ থেকে, কাছে থেকে, দূরে থেকে আসছে লোকজন। গাড়ি ঘোড়ার স্রোত লেগে যাচ্ছে নিজামুদ্দিন বাংলাওয়ালী মসজিদের সামনে। চত্বর ছেড়ে রাস্তায় চলে যাচ্ছে ভিড়। এরা আসে। খবর নিয়ে যায়। জেনে যায় তিনি আছেন। এখনো আছেন। এদের কাছ থেকে খবর পেয়ে যায় বাকী লোকেরা। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

একদিন।

আচমকা গুজব রটে গেল হযরতজী (রঃ) আর নেই। ব্যাস, আর যায় কোথায়? দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো খবর শহরে, গাঁয়ে, বাজারে ও বন্দরে। লোকে লোকারণ্য হলো বস্তি নিজামুদ্দিন। বাসের পর বাস। থামছে। নামছে মানুষ। ট্রেন থামছে দিল্লীতে স্টেশন উপচে যাচ্ছে ভক্ত ও অনুরাগীতে। ঘোড়া গাড়ি আসছে ছুটে। নামছে মানুষ। টেলিফোনের পর টেলিফোন আসছে। জবাব দিতে দিতে হয়রান।

ধীরে ধীরে প্রচার হলো ঘটনা মিথ্যে। রটনা। ভুল।

তিনি এখনো আছেন।

প্রচণ্ড ভিড়। কমছে না। সুবিশাল সমাবেশ। মসজিদের নিচের জায়াগায় ঘন সবুজ রঙ গাছের নিচে এসে দাঁড়ালেন হযরত মাওলানা মানজুর আহমাদ নোমানী (রঃ)। তিনি পড়লেন–

"মুহাম্মদ একজন প্রেরিত পুরুষ। আর কিছু তো নন। তাঁর আগের পাঠানো পথ প্রদর্শকরাও চলে গেছেন।"

এ পবিত্র আয়াতে কারিমা হাজির জনতার মর্ম ছুঁয়ে গেল। সবার চোখে পানি।

সত্যিই তো!

কে বেঁচে থাকে এ নশ্বর পৃথিবীতে চিরকাল?

তবু মানুষ তাঁর প্রিয়জনকে ছাড়তে চায় না।

হারাতে চায় না।

ফিরে যাচ্ছে সবাই।

সবার মনে একই কথা। একই ব্যাথা। বেজে চলেছে। কবিতায়। করুণ সুরে-

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা দ্বিপ্রহর;

www.eelm.weebly.com

হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর।
জনশূন্য পল্লিপথে ধুলি উড়ে যায়।
মাধ্যাহ্ন-বাতাসে; স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পাতি
ঘুমায়ে পড়েছে; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম-
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।

গিয়েছে আশ্বিন-পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূর দেশে,
সেই কর্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিসপত্র দড়াদড়ি লয়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এ-ঘরে ও ঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার
একদণ্ড-তরে; বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে, যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, 'এ কী কাণ্ড।'
এত ঘট, এত পট, হাঁড়ি সরা ভাণ্ড,
বোতল বিছানা বাক্স, রাজ্যের বোঝাই
কী করিব লয়ে। কিছু এর রেখে যাই,
কিছু লই সাথে।

সে কথায় কর্ণপাত
নাহি করে কোনো জন। 'কী জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভূঁই বিদেশে?
সোনামুগ সরুচাল সুপারি ও পান,
ও-হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনা নারিকেল;
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল,
আমসত্ত্ব আমচুর; সের-দুই দুধ–

www.eelm.weebly.com

এই সব শিশি কৌটা ওষুধ-বিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,
মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে করে।'
বুঝিনু যক্তির কথা বৃথা বাক্যব্যয়।
বোঝাই হইল উঁচু পর্বতের ন্যায়।
তাকানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে, কহিলাম ধীরে
'তবে আসি'। অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষু 'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল-অশ্রুজল করিল গোপন।
বাহির দ্বারের কাছে বসি অন্যমন
কন্যা মোর চারি বছরের। এতক্ষণ
অন্য দিনে হয়ে যেত স্নান সমাপন,
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে; আজি তার মাতা
দেখে নাই তারে; এত বেলা হয়ে যায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়।
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁষে,
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্তদেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কী জানি কী ভেবে
চুপিচাপি বসে ছিল। কহিনু যখন
'মাগো, আসি' সে কহিল বিষণ্ন নয়ন
ম্লানমুখে, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'
যেখানে আছিল বসে রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল- 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'
'তবুও সময় হল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল।

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হতে কী শকতি পেয়ে

www.eelm.weebly.com

কহিলি এমন কথা এ স্পর্ধাভরে-
'যেতে আমি দিব না তোমায়'! চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোটো হাতে
গরবিনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্ত-ক্ষুদ্র-দেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুকভরা স্নেহ!
ব্যথিত হৃদয় হতে বহু ভয়ে লাজে
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে, শুধু বলে রাখা 'যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি'। হেন কথা কে পারে বলিতে
'যেতে নাহি দিব'! শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভ'রে
দুয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন,
আমি দেখে চলে এনু মুছিয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধপরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরনীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস।

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
'যেতে আমি দিব না তোমায়'। ধরনীর

www.eelm.weebly.com

প্রান্ত হতে নীলাম্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে
'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব'। সব
কহে 'যেতে নাহি দিব'। তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে, 'যেতে নাহি দিব'।
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব,
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে-
কহিতেছে শতবার 'যেতে দিব না রে'।
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য চেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন– 'যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু সে চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হতে।
প্রলয়সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত-ব্যগ্র বাহু জ্বলন্ত-আঁখিতে
'দিব না দিব না যেতে' ডাকিতে ডাকিতে
হুহু করে তীব্রবেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
সম্মুখ-উর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
'দিব না দিব না যেতে'– নাহি শুনে কেউ,
নাহি কোনো সাড়া।
চারিদিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছি বাজি
সেই বিশ্ব-মর্মভেদী। করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে; শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে
যাহা পায় তাই সে হারায়; তবু তো রে
শিথিল হল না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মতো
অক্ষুন্ন প্রেমের গর্বে কহিছে সে ডাকি
'যেতে নাহি দিব'। স্নানমুখ অশ্রুব-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,

www.eelm.weebly.com

তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধকণ্ঠে কয়
'যেতে নাহি দিব'। যতবার পরাজয়
ততবার কহে, 'আমি ভালবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।
আমার আকাঙ্খা সম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া,এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বের কিছু আছে আর!'
এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার
'যেতে নাহি দিব'। তখনি দেখিতে পায়,
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে চলে যায়
একটি নিশ্বাসে তার আদরের ধন;
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব নতশির। তবু প্রেম বলে,
'সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার-লিপি।'- তাই স্ফীতবুকে
সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে, 'মৃত্যু তুমি নাই।'- হেন গর্বকথা!
মৃত্যু হাসে বসি। মরণপীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছান্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণনয়ন-পরে
অশ্রুববাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চিরকম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ কুয়াশা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে-
দুখানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলের ঘিরে,
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীড়ে
পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া-
অশ্রুববৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া-

www.eelm.weebly.com

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এত ব্যাকুলতা; অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে; বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশথের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি-
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন স্তব্ধ মর্মাহত,
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো।"

শেষ খেয়া দিতে হবে পাড়ি

রাত বারোটা।

আট জুলাই!

উনিশ শো চুয়াল্লিশ।

আমার (সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদভী) মন খারাপ। বিষণ্নতায় ছেয়ে আছে হৃদয়। কী এক অবুঝ ব্যথা কুরে কুরে খাচ্ছে হৃদপিণ্ডটাকে। আমি এ যন্ত্রণা থেকে একটু মুক্তি পেতে চাই। তাই কখন জানি হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম মসজিদ ছেড়ে বাইরে। চৌরঙ্গীতে হাঁটছি। ভাবছি। অনুভব করছি আমার গোটা চেতনা জুড়ে বাজছে বিরহের ঘন্টধ্বনি।

অবিরাম।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নেমেছে।

ক'দিন ধরেই এই কুকুর-বেড়াল বৃষ্টি ঝরছে। বাতাসে হিমেল ছোঁয়া।

এ সময় হযরতজী (রঃ) খুব গরম বোধ করতেন। তিনি ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগানোর জন্যে খাটটি বাইরে রাখতে বলতেন। তাতে নিউমোনিয়ার হামলা হলো। অজান্তে। জানার পর অবশ্য সব ধরনের সতর্কতা নেয়া হলো।

www.eelm.weebly.com

আঁধার নামার সময় হয়েছে। বুঝতে পারছি। নিভে যাবে চোখ ঝলসানো জলসা ঘরের লাল নীল দীপাবলী। এসব ভাবতে ভাবতে ফের কখন ঢুকে পড়েছি মসজিদে। একজন সাথী দ্রুত পায়ে ছুটে এসে বললো, 'হযরতজী আপনাকে মনে করেছেন। দু'জন লোক ছুটোছুটি করছে আপনার খোঁজে।'

দমকা বাতাসের মতো আমি ঘরে ঢুকে বসে পড়লাম ওনার পাশে। ধীরে সুস্থে কান ঠেকালাম ওনার ঠোঁটের কাছে। কেঁপে উঠলো ঠোঁট। চেষ্টা করলেন কিছু বলার জন্যে। অস্পষ্ট শব্দ। বোঝা গেল না। আবার তলিয়ে গেলেন যেন কোন অজানায়। জোড়াতালি দিয়ে বুঝলাম তিনি বলছেন, 'সবাই যেন আল্লাহকে স্মরণ করে। জিকির ইবাদাতে লিপ্ত হয়। আবদুল কাদির রায়পুরীর মজলিশে বসে।'

সকাল আটটা।

নয় জুলাই।

উনিশ শো চুয়াল্লিশ।

ডেকেছিলেন তিনি আমাকে। কিন্তু দুঃখ, যে কথাটি বলেছিলেন তা আজ আর মনে করতে পারছি না।

সেদিনই।

রাত তখন একটা।

হযরতজী (রঃ) এঁর কামরার সামনে দিয়ে যাচ্ছি। দেখি উনি জেগে। সেবকরা রয়েছে সাথে। ব্যস্ত। ভেতরে ঢুকলাম পা টিপে। বসে পড়লাম। নিঃশব্দে। আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন। চোখ বুঁজে। এক সময় চোখের পাতা নড়লো। দেখলেন। ঠোঁট নড়ে উঠলো। শোনা যায় না এমনভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'উনি কি তার এলাকায় গিয়ে কাজ করবেন?

'আল্লাহ চান তো তিনি নিশ্চয়ই করবেন।' খানিক থেমে বললাম, ' তাছাড়া উনি তার এলাকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁর কথা সবাই শুনবে। ইনশাআল্লাহ।' একটা অস্পষ্ট হাসি ফুটলো হজরতজী (রঃ) এঁর চেহারায়। তারপর কোথায় যেন তলিয়ে গেলেন। চোখ বুঁজে এলো। খানিক পরে পাতা খুললো চোখের। এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়লো চোখের কোণ বেয়ে। ঠোঁট কাঁপছে। কথা বলবেন। এবং তিনি সমর্থ হলেন।

বললেন, 'ঠিক বলেছো। যাঁরা আল্লাহওয়ালা তাঁদের কথা সবাই শোনে। মানে। তাঁদের কথায় মানুষের মনে প্রভাব পড়ে। গাঢ়।' কথা কটা বলে ফের যেন কোথায় হারিয়ে গেলেন তিনি। একটু পর চোখ খুলে বললেন, 'মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়ব রায়পুরী, মাওলানা জহিরুল হাসান কান্দলবী ও হাফিজ ওসমান সাহেব এই তিনজনকে 'বাগপত' এলাকায় পাঠিয়ে দিন। ওখানে একটা সমাবেশ হলে ভালো হয়।'

সাঁঝের বেলা।

www.eelm.weebly.com

দশ জুলাই।
উনিশ শো চুয়াল্লিশ।
কিছু আলিম এসেছিলেন।
তাদেরকে এই কাজে অংশ নেয়ার জন্যে উৎসাহিত করলেন।

সকাল।
এগারো জুলাই।
তিনি জমজমের পানি পান করলেন।
দোয়া করলেন-
'ওগো আল্লাহ! তোমার পথে শহীদ হবার তাওফিক দাও আমাকে। আর তোমার রাসূলের শহরে মৃত্যু দাও।'

এদিন বিকেলে একজন অভিভূত চিকিৎসক অবাক গলায় বললেন, 'এ এক আশ্চর্য অবস্থা! আপনারা যে তাঁকে দেখছেন তা কোনো জাগতিক ব্যাপার না। ওঁর হাত পা আর গোটা শরীর এখন মৃত। কোনো কাজ করছে না। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার যে তিনি বেঁচে আছেন। আসলে শারীরিক কর্মকাণ্ড শেষ হয়েছে। রয়েছে শুধু আত্মিক, অশরীরী শক্তি। এ এক অসামান্য ক্রান্তিকাল। ব্যাপারটা ব্যাখ্যাতীত।'

বারোই জুলাই।
উনিশ শো চুয়াল্লিশ।
তেরোশো তেষট্টি হিজরি।
এদিন। সকাল।
হযরতজী (রঃ) খবর পাঠালেন এই ক'জন মানুষকে ডেকে নিয়ে এসো। ওরা আমার আপনজন। ওদের ওপর আমার আস্থা রয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা জাকারিয়া (রঃ) হযরত মাওলানা আবদুল কাদির (রঃ) আর হযরত মাওলানা মুজাফফার আহমাদ (রঃ)।
ওঁদের মাঝে কারো হাতে বাইয়াত হয়ে নাও। যারা আমার কাছে বাইআত হতে চাও।
তাদেরকে পরামর্শ করতে বললেন। যাতে নিচের ক'জনের যে কোনো একজন আমির হতে পারে। এঁরা হচ্ছেন হাফিজ মকবুল হাসান (রঃ), ক্বারী দাউদ (রঃ), হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হাসান (রঃ) হযরত মাওলানা রিয়া হাসান (রঃ), হযরত মাওলানা ইনামুল হাসান (রঃ) ও হযরত মাওলানা ইউসুফ (রঃ)।
সেদিনই।

www.eelm.weebly.com

বেলা বাড়তে ফের পরামর্শে বসলেন ওঁরা তিন জন। শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া (রঃ), হযরত মাওলান আবদুল কাদির রায়পুরী (রঃ) ও হযরত মাওলানা মুজাফফর আহমাদ (রঃ)।

তাঁরা পরামর্শ শেষে হযরতজী (রঃ) এঁর খিদমতে এসে বললেন, 'মৌলবী ইউসুফকে বেশ যোগ্য মনে হচ্ছে। খিলাফত পাবার জন্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রঃ) তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'কাওলুল জামিল' বইয়ে যেসব যোগ্যতার কথা লিখেছেন তাঁর সবকিছুই আমরা ওঁর ভেতর দেখতে পাচ্ছি। তিনি বেশ বড় আলিম। তাছাড়া শিক্ষকতাও করছেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হযরতজী (রঃ) কথা শুনে।

চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবলেন। খানিকক্ষণ।

চোখ খুলে কথা বললেন নিচু স্বরে, 'ঠিক আছে। তোমরা সবাই মিলে যখন বলছো। আমার মনে বড় সংশয় ছিল। খুব অস্থির ছিলাম। কিন্তু তোমরা বলাতে মন আশ্বস্ত হলো। আল্লাহ নিশ্চয়ই এর মধ্যে মঙ্গল ও কল্যাণ রেখেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওপর ভরসা রাখছি। তিনি এই কাজকে অব্যাহত গতিতে চালাবেন।'

সাঁঝের বেলা।

তিনি (রঃ) হঠাৎ সচকিত হয়ে বললেন, 'কই, যারা আমার কাছে বাইআত হতে চায় তারা কোথায়? তারা এখনি এসে বাইআত হয়ে যাক।'

এ ব্যাপারে পরামর্শ হলো। সাথীরা রায় দিলেন এমন নাজুক অবস্থায় তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল হবে।

আগামীকাল আর এলো না।

রাত।

গাঢ় আঁধারে ছেয়ে গেল পৃথিবীর আকাশ। চারদিকে কী এক হাহাকার। করুণ কান্না। নিরবে, নিঃশব্দে রনিয়ে রনিয়ে ফিরছে।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে রিমঝিম।

বিশ্বপ্রকৃতি আজ যেন নীরব।

পৃথিবীর অন্তর জুড়ে কি এক সুতীব্র শোক, চাপা দীর্ঘশ্বাস, কী এক অতৃপ্তি আর না পাওয়ার বেদনা গুমরে গুমরে উঠছে। কী যেন হারাতে চলেছে সে আজ। পেয়েছিল। কিন্তু ধরে রাখতে পারছে না। যুগ যুগের জমাট ব্যথা, নিরাশার আঁধার কেটে যেতে যেতে ফের থমকে গেল কি? সেই অতৃপ্তি, সেই অপূর্ণতা আজ লক্ষ মানুষের ফোঁটা ফোঁটা জমাট অশ্রুসাগর হয়ে ফের উত্তাল বেগে ধেয়ে যেতে চায় দূরে কোথায়!

www.eelm.weebly.com

হযরতজ (রঃ) শুয়ে রয়েছেন। চোখ বুঁজে। উনি এমন কাঁপছেন কেন? একী! মনে হচ্ছে যেন মসজিদ কাঁপছে। নিজামুদ্দিন বাংলাওয়ালী মসজিদ কী কাঁপছে!

নাকি গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপছে। থর থর করে।

বাইরে ঘুটঘুটে আঁধার কি আরো জমাট বেঁধে উঠলো?

নাকি এটা কোনো কবি মনের কল্পনা?

সত্যিই অদ্ভুত একটা শব্দ। অস্পষ্ট। মানুষের। কিন্তু অচেনা তাদের ভাষা। করুণ বিলাপ। কোনো ধর্মীয় সমাবেশ থেকে ভেসে আসছে যেন। সমস্বরে। তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে সূতীক্ষ্ণ সেই হাহাকার ধ্বনি।

শহরে, বন্দরে, গুহায়, খোলা মাঠে, মরুভূমিতে, সাগর মহাসাগরে, মাটির নিচে। হাজার হাজার শহিদান, সালেহীন, অলি, গাওস, কুতুব, সাহাবা রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু, আম্বিয়া আলাইহিস সালাম যেন ভীষণ দুঃখে কেঁদে চলেছেন।

আকাশে, বাতাসে, বেহেশতে, দোজখে, অন্তরীক্ষে, পাতালে উঠেছে কান্না।

সূর্য যাচ্ছে পাটে

চোদ্দশো হিজরি। পেরিয়ে গেছে।

শাহ নে'মাতুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণীতে ঠিক এ সময়ের কথাই লেখা রয়েছে।

এই মুহূর্তেই পাল্টে যাবে দুনিয়ার গতানুগতিক ইতিহাস। বস্তুবাদী, জড়বাদী জগতের যাবতীয় নিয়ম পদ্ধতি অসার প্রমাণিত হবে। বিফল হবে সব প্রশাসন। চরম ব্যর্থতার মুখ দেখবে রাজনৈতিক মতাদর্শ। প্রতিপদে মার খাবে শয়তানের কারসাজি।

বিগত কয়েক শতকের যুদ্ধ, দুঃখ-দুর্দশা, অরাজকতা আর অসন্তোষের ঘূর্ণিস্রোত, রাজনৈতিক হত্যাকান্ড, সন্ত্রাস, খুন খারাবি, পৈশাচিক যৌন নিপীড়ন, অনাচার, নেশাপানিতে নিয়মিত আসক্তি-এসব কিছুই আসল নাটক মঞ্চস্থ হবার আগের প্রস্তুতি। শেষবারের মতো পরিবর্তনের জন্যে মানুষ অন্তর থেকে পার্থিব সাজ-সজ্জা, নিয়ম কানুনের ওপর হতাশ হয়েছে কিনা তা যাচাই করার কষ্টি পাথর।

নূহ আলাইহিস সালামের সময় যারা ন'শো বছর ধরে করেছিল টিটকারী আর অবিরাম অত্যাচার। মুসা আলাইহিস সালামের জামানার যারা জীবিত দাফন করেছিল মানুষকে! পিরামিডের পাথরের নিচে তিলে তিলে কতো জীবন ফুরিয়ে গেছে নিরবে। তাদের অমানবিক অত্যাচারে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সময় যারা জ্বালিয়েছিল তিন মাইল উঁচু, সাতাশ বর্গমাইল জোড়া অগ্নিকুণ্ড। তারা চেয়েছিল পূতঃপবিত্র নবী ইব্রাহিমকে পুড়িয়ে হত্যা করতে। ঈসা নবী আনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সময় যারা ধর্মপ্রাণ মানুষদের সিংহের পেটে যাওয়ার দৃশ্য দেখে পৈশাচিক উল্লাসে

www.eelm.weebly.com

ফেটে পড়েছিল। সিজারের সময় লাখ মানুষকে পিপীলিকার মতো মরতে দেখে করেছে হর্ষধ্বনি। হিটলারের সময় উপভোগ করেছে ইহুদিদের ওপর নির্মম রোমহর্ষক অত্যাচার। নিরব পুলকে বিভোর ছিল ভারতবর্ষের মানুষের ওপর ইংরেজ ক্রিশ্চানদের অমানবিক নির্যাতন, নিষ্পেষণ, জুলুম আর হত্যাকাণ্ড দেখে।

গণতন্ত্রের মুখ আর মানুষ দেখতে পায়নি।

নেশাপানিতে আসক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ স্বাভাবিক জীবন যাত্রার রোজকার ধারা। পূর্ব থেকে পশ্চিম আজ মানুষ তার ভায়ের বুকে ছুরি হানতে দ্বিধা করছে না।

মহাপ্রলয়ের পূর্বক্ষণের বেশকিছু লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।

আধ্যাত্মিক সিদ্ধ পুরুষরা শুনতে পাচ্ছেন মহাপ্রলয়ের পায়ের আওয়াজ। চারদিকে এক অজানা অচেনা হাহাকার। যে প্রেমিক যুগল ভালবাসার বন্যায় ভেসে গিয়ে একদিন সমাজ সংসার ছেড়ে হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিল, তারাই ফের একজন আরেকজনকে হত্যা করছে নির্মমভাবে। যে দু'বন্ধু মিলে প্রাণের মায়ায় শুরু করেছিল ব্যবসা, ক'বছর যেতে না যেতে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ আর হিংসায় ভরে গেছে মন। নেমে পড়েছে মরণঘাতী লড়াইয়ে। চলছে ছুটোছুটি, থানা, কোর্ট, সমাজবিরোধী, সন্ত্রাসী আর রাজনৈতিক টাউটদের কাছে। একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে গড়ে তুলছে প্রতিরোধ। চলছে প্রতিশোধের মহড়া। অবক্ষয়ের ধ্বস নামছে গোটা দুনিয়া জুড়ে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। বাড়ছে ঘৃণা, ধ্বংসযজ্ঞ, স্নায়ুযুদ্ধ আর প্রতিযোগিতার আসার লড়াই। জনতা থেকে সরকার বিচ্ছিন্ন। দুঃখী মানুষের দুঃখ ব্যথা শোনার লোক আর কেউ নেই।

কল্পান্তিনী পৃথিবীর জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আজ হাহুতাশ। ডাকিনীর বিষ নিঃশ্বাসে প্রতিটি মন প্রতিটি কোণ ভরে গেছে দুনিয়ার। পৃথিবী জোড়া দুর্ভিক্ষ, অরাজকতা, অনাচার, অবিচার, হত্যাযজ্ঞ, যুদ্ধ, রক্তপাতের সাথে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামো।

বেলা শেষে ফিরে
যায় পাখি নীড়ে

নিজামুদ্দিন বাংলাওয়ালী মসজিদ।

পৌঢ় প্রাচীন প্রাণ তিনি। হযরতজী (রঃ) জীবন ও মরণের মাঝের এক সূক্ষ্ম রেখায় আচ্ছন্নভাবে মন্থিত হতে হতে গোটা দুনিয়ার দুর্দশায় একবার যেন ডুকরে উঠলেন। ভয়ানক কষ্টে তাঁর চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে নামলো এক হাজার বছরের জমাট দুঃখ। ফোঁটায় ফোঁটায়।

www.eelm.weebly.com

দু'একবার চমকে উঠলেন।

চোখের পানিতে বালিশ ভিজছে। তিনি করোট ফিরলেন। চোখের পাতা খুলে গেল। একী চেহারা হয়েছে হযরতজী! মহা দুঃখের সাগর যেন উথলে উঠছে তাঁর সমস্ত শরীর জুড়ে। ম্লান চেহারা। বিষাদভরা মুখ। চারদিকে একবার দেখলেন। শূন্য দৃষ্টি। তারপর প্রায় অস্ফুটে বললেন, 'কাল কি বৃহস্পতিবার?

'জ্বি', আমরা জবাব দিলাম গভীর আগ্রহে।

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। খানিক পর বললেন, 'দেখো তো আমার পোশাকগুলো। কোনো নাপাকি লেগে আছে কিনা?

আমরা দেখলাম।

বললাম, 'নেই।

তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। 'আমাকে ওজুর পানি দাও, 'আরো পরে বললেন, 'আমি কিছু নামাজ পড়ি।

খেদমতে যারা ছিলেন তারা বাধা দিলেন। এশার নামাজের জন্যে জামাতের ব্যবস্থা হলো। তিনি জামাতে শরীক হলেন। কিন্তু নামাজেই পেশাবের বেগ হলো। নামাজ ছেড়ে দিতে হলো। পরে একটা জামাত করে নামাজ আদায় করলেন।

রাত বেড়ে চলেছে।

ঘোরের মাঝে ছুটে চলেছে সময়। সূর্য ডুবু ডুবু। কোন অজানা দেশে পাড়ি দিচ্ছেন তিনি আজ। একবার চোখ মেললেন। বললেন, 'আজ রাতে দু'য়া আর দম বেশি করে করো। আর ওইসব লোকেরা পাশে থাকো যাঁরা ইবলিস ও ফিরিশতাদের চিহ্নিত করতে পারো।'

কী নিদারুণ শব্দ! সাথীদের পায়ের নিচের মাটি যেন কেঁপে ওঠে। টালমাটাল হয় তাদের পৃথিবী। দুনিয়াজুড়ে কি ভূমিকম্প হচ্ছে? কি, পৃথিবী চুরমার হচ্ছে? পাহাড়াগুলো কি ধূণিত তুলোর মত উড়ছে? মহাসমুদ্রে কি উর্মিমালা উথাল পাতাল হলো? আকাশ কি হঠাৎ ছিড়েখুঁড়ে পড়লো?

কী বলছেন ইনি?

মন যে মানে না। মন না মানলেই কি তুমি পারো কাউকে ধরে রাখতে? কে কবে কাকে রাখতে পেরেছে ধরে? অবোধ মানুষ। অবুঝ! যাবার বেলা তুমি যে বিবশ দিশেহারা হয়ে পড়লে?

নবীজীকে কি ধরে রাখতে পেরেছিলেন সাহাবারা?

তবে?

নিয়তি।

তাকে যে মানতেই হবে।

সে যে অনড়।

www.eelm.weebly.com

অটল।

আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তিনি।

রাত বাড়ছে।

একবার মাথা এপাশ নাড়িয়ে চোখ খুললেন। বললেন, 'দু'আটা একটু শোনাও তো।'

হযরত মাওলানা ইনামুল হাসান পুরো দু'য়া পড়লেন।

হযরতজী বললেন, 'ফের শোনাও।'

ফের দোয়া পড়লেন– যার অর্থ–

'হায় আল্লাহ! পাপ যত হোক আমার, ক্ষমা তোমার, আরো বেশি। আমার আমল নয় তোমার দয়াই ভরসা।'

তিনি এ দোয়াটি পড়তে লাগলেন। জোরে, অস্ফুটে। বার বার।

ফের ঝিমিয়ে পড়লেন।

তাঁর কানে ভেসে আসে কোন অচেনা ভুবন থেকে মন উদাস করা নিঃশব্দ ডাক। সে ডাক শুনে অস্থির, মাতাল হয় প্রাণপাখি। প্রাণনদী ছুটে চলে সাগরের ঠিকানায়।

চোখ খুললেন। বললেন, 'মন চায় আমাকে গোসল দাও। তারপর আমি নিচে যাই। দাঁড়িয়ে দুটো রাকাত নামাজ পড়ি। তখন দেখতে নামাজ কতটুকু সুন্দর রূপ নেয়।'

বারোটা বাজলো। তিনি চমকে উঠলেন বেশ ক'বার।

আমরা ভয় পেলাম। দ্রুত ডাক্তার ডাকা হলো। তিনি ওষুধ খাওয়ালেন।

মাঝ রাত। বাড়ছে রাত।

গাঢ় আঁধারে ছেয়ে আছে পৃথিবী। কীসের করুণ বিলাপে বিধুর আকাশ মাটি। রাত যত বাড়ছে ততই বেড়ে চলেছে ঝিঁঝির কোলাহল। বিরামহীন চেঁচিয়ে চলেছে ওরা। রাতের পাখিরা ডাকাডাকি করছে। ওরা কি কিছু বুঝেছে? ওদের ব্যথা ভরা চিৎকারে কেঁপে উঠছে পৃথিবীর হৃদয়। কেঁপে উঠছে ভূগর্ভ বেসল্টের ভিত।

নিজামুদ্দিন বাংলাওয়ালী মসজিদের আধো আলো আধো অন্ধকার ছোট একটা কামরার চারপাশে বসে থাকা মানুষগুলো ভয়ানক ব্যথায় ডুকরে কেঁদে উঠলো।

তাদের চোখের নিরব অশ্রু জমা হচ্ছে মেঝেয়। সে পানি গড়িয়ে যাচ্ছে বিছানায় শোয়া মানুষটার পায়ের কাছে। কিন্তু তিনি টের পাচ্ছেন না। তিনি এখন এক বিস্ময়কর জগতে।

এক অপূর্ব নূরে আসমান জমিন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেই আলোতে চাঁদ-তারা হয়েছে আরো ঝলমল। সাত আসমান জুড়ে জ্বলছে আজ লাল নীল আলোর মালা। তারা আজ পাচ্ছে একটি পবিত্র আত্মা। যাঁর স্পর্শে পৃথিবী হয়েছিল ধন্য। তাঁকে

www.eelm.weebly.com

স্বাগতম জানানোর জন্যে আকাশের বাসিন্দারা ছুটোছুটি করছে। প্রকৃতি কাঁসের ব্যথায় ব্যথাতুরা।

হৃদয়চেরা করুণ বাঁশি বাজছে পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে। সবাই আজ ব্যথিত, শোকাত। বনের পশুর মনে উঠেছে। ব্যথার ঢেউ। তারা নিশ্চুপ। পাখিদের কলরব থেমে গেছে। তারা নির্বাক। মহাসমুদ্রের ঢেউগুলো কি থেমে গেল হঠাৎ? তারা কি বিবশ? নিথর হলো?

যাবার আগে তাঁর কথা বুঝি সত্যি হতে চলেছে?

ওই যে শোনা যায় মহকালের পদধ্বনি! লেনিনের দেশের বন্ধ মসজিদের দুয়ার খুলে গেল কি? জীবিত দাফন হয়ে যাওয়া হাজার হাজার ওলামায়ে কিরাম কি আকাশ মাটি কাঁপিয়ে উদাহরণ করছে পবিত্র আজানের মহান ধ্বনি? হিন্দুস্থানের মূর্তিগুলো কি চিৎকার করে উঠলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বলে? সোয়া লাখ আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম ফের বুঝি এসে পড়েছেন মানুষের মাঝে! দুর্বার গতিতে চলেছে দাওয়াতের আমাল। দলে দলে মানুষ দাখিল হচ্ছে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে।

কোন্ প্রাচীন যুগ থেকে আজানুলম্বিত জুব্বাধারী লাঠি হাতে ওই সারি সারি মহামানবেরা উঠে এলেন?

গভীর নিশুতি রাত। রাত্রির কালো পর্দা চিরে উঠে এলেন ওরা কারা?

উনি কি নূহ?

উনি কি সালেহ?

উনি কি মুসা?

উনি কি ইব্রাহিম?

উনি কি ঈসা

নিজামুদ্দিনের এই পুরোন মসজিদে আজ একি অপরূপ দৃশ্য! বেহেশতী খুশবুতে ভরে উঠেছে আবার নিজামুদ্দিন বাদাউনী (রঃ) এঁর মহল্লা।

চলে যাচ্ছেন তিনি। হযরতজী (রঃ)।

এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে।

সৃষ্টির অন্তর ভেদ করে চিৎকার উঠেছে, 'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাস্‌সির কুম ফা আনাজির; ওয়া রাব্বুকা ফাকাব্বির।'

রাত্রি শেষ হতে চলেছে।

কামরার ভেতর থেকে বিরামহীন তাকবীর শোনা যাচ্ছে। শেষ রাতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ আর মাওলানা মুহাম্মাদ ইকরামুল হাসানকে ডাকলেন।

www.eelm.weebly.com

মাওলানা ইউসুফ (রঃ) কাছে গেলেন। তিনি দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, 'এসো বেটা, ইউসুফ! বুকে এসো। আমাকে জড়িয়ে ধরো। আমি তো চলে যাচ্ছি–

আপনও নীড়ে ফিরে গেছে পাখি

সুবহি সাদিক। হচ্ছে।

তিনি চলে যাচ্ছেন।

এ পৃথিবী এমন মহান, মায়ার মানুষকে ছাড়তে চায় না! হায়, তবু যেতে দিতে হয়। গভীর হাহাকারে ভরে গেছে পৃথিবী। প্রকৃতি। আকাশ জুড়ে টিপ টিপ বৃষ্টি। ফিরিশ্‌তারা কি কাঁদছে। বেহেশতের ঝরোকা থেকে পুষ্প বৃষ্টি হচ্ছে বুজি এইমাত্র চলে যাওয়া মানুষটির ওপর? অনন্ত নক্ষত্র বীথি তাঁকে জানাচ্ছে সালাম। বিশ্ব বীণার তারে আজ বড় বেদনার রাগিনী বেজে চলেছে। এ কোন হৃদয়তন্ত্রী ছেঁড়া গান। ছায়াপথের তারায় আজ কীসের কাঁপন! এ কোন কান্না? সৃষ্টির রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ কোন্ বেদনার বন্যা?

ক্লান্ত মুসাফির।

ঘুমুচ্ছেন।

আগুনের পরশ ছড়িয়ে। নিশ্চিন্তে। ঘুমুচ্ছেন–

পরশ পাথর।

তাই আজ-

কাঁদে আকাশ।

কাঁদে বাতাস।

কাঁদে আকাশভরা সূর্য তারা। আলো জ্বেলে।

কাঁদে ঝরা পাতারা। সর সর। শব্দে।

কাঁদে শিশির। টুপ টাপ। ঝরে।

কাঁদে পাহাড়। সাগর। আগ্নেয়গিরির আগুণ ঝলকে ওঠে চাপ চাপ।

কাঁদে বন বনানী। মরু।

অবোধ পশু ওই ওঠে ডুকরে। দূরে।

কাঁদে বিশ্বভুবন। গুমরে গুমরে।

কাঁদে।

নিঃশব্দে।

www.eelm.weebly.com

এই কাঁদি

'হে প্রশান্ত মন! তুমি খুশি আর রাজি করে ফিরে যাও তোমার প্রভুর কাছে। তারপর দাখিল হও আমার বান্দাদের মাঝে। ঢুকে পড়ো আমার বাগানে।'

জানাজার নামাজও শেষ হলো। অনেক ব্যথাভরা অশ্রুর মাঝে নতুন হযরতজী হলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ (রঃ)। পাগড়ি পরিয়ে দেয়া হলো তাঁর মাথায়। এতোদিন ওটা শোভা পাচ্ছিল হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রঃ) এঁর মাথায়।

জানাজায় দাঁড়িয়ে আছে মানব সমুদ্র।

তারা কাঁদছে।

কী হবে কেঁদে? চোখের পানি কী ফিরিয়ে আনতে পারবে তাঁকে মরণের ওপার থেকে?

প্রেমের পথ পাড়ি দিয়ে যে মৃত্যুই মিলনমেলার সেতু। পরম প্রভুর সাথে!

তবু কাঁদছে ওরা।

মানুষ। মেওয়াতী। জনতা।

নেমে আসছে। শোকের জলভরা ঝর্নাধারা।

অঝোরে।

ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে জনতা। সব শৃঙ্খলা আর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেল।

সমবেত জনতার উদ্দেশে কথা বলা হলো। শোকে পাথর মানুষের সান্ত্বনার জন্যে কোরানে পাকের ওই পবিত্র আয়াতের ওপর কথা হলো যা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর পড়া হয়েছিল।

কবর হলো মসজিদের দক্ষিণে। ওখানে তাঁর আব্বা ও ভাই শুয়ে রয়েছেন। চিরনিদ্রায়। অসংখ্য মানুষের চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাস আর সব সরব কান্নার মাঝে দাফনের কাজ শেষ হলো। চৌধুরি নাওয়াজ খানকে তিনি বলেছিলেন কুড়িদিনের ভেতরেই কিছু একটা হয়ে যাবে। ঠিক কুড়ি দিনের মাথায় তিনি চলে গেলেন পরপারে।

যে আগুনের পরশমনির ছোঁয়ায় অসংখ্য নিভন্ত আত্মা ঝলসে উঠেছিল তা আজ ঠাঁই নিল গভীর কবরের আঁধারে।

www.eelm.weebly.com

পেছনে পড়ে রইলো শুধ হুজুর (সঃ) এঁর এতিম উম্মত।
আর তার নিজ হাতে গড়া একদল মানুষ তৈরির কারিগর।
মুব্বাল্লিগ।
দাঈ।
আর?
তাদের বুকভরা। বিরহ। ব্যথা। দীর্ঘশ্বাস।
হাহাকার।
কান্না।

॥ সমাপ্ত ॥

www.eelm.weebly.com